বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস
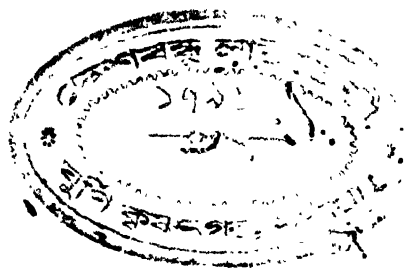
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা বারো আনা

আষাঢ়, ১৩৪৫

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, রবিবার, (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭এ জুন) রাত্রি ৯টায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পল্লীতে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্ব্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানা উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলা দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় রচনার একটি প্রামাণিক 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল ও Scholarly সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম—১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে—করা হইতেছে; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে আমি গৌরব বোধ করিতেছি।

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। তাঁহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্কিমের রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও উল্লেখযোগ্য।

শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে তাঁহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাঁহারা বহু

অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ও জীবনীর উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই সুযোগে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে ধ্রুব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে মল্লিখিত সাধারণ ভূমিকা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার লিখিত বঙ্কিমের সাহিত্যপ্রতিভা বিষয়ক ভূমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বঙ্কিমের রচনাপঞ্জী ও রাজকার্যের ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সঙ্কলিত বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বঙ্কিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা থাকিবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এই খণ্ডে বিভিন্ন ভাষায় বঙ্কিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে বিবৃতি দিবেন।

বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্বল থাকুক।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫
কলিকাতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, "দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড়ই বাধিত হইব।...এই রাজসিংহ প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

এই কথাগুলিতে তাঁহার অভিপ্রায় কি? ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে আমরা কি বুঝিব? তাহাতে কি কি উপাদান থাকা চাই? এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত হইতে পারেন নাই। অল্প দিন হইল, গত ২৫ ডিসেম্বরের বিলাতী 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় পড়িলাম :—

> "It is not easy to define a historical novel. Professor Nield's definition, 'A novel is rendered historical by the introduction of dates, personages or events to which identification can be given,' seems too severe....Scribner's [of New York] have, justifiably, interpreted the subject more liberally by the inclusion of novels the background of which is laid in a recognizable historical period, even though no single character in the book may have a genuine historical prototype."

এই দ্বিতীয় কথাটি যদি আমরা স্বীকার করি, তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাস সাতখানিকে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক উপন্যাস নাম দিতে হয়। তাহাদের কোনটায় কল্পিত চরিত্র বেশী, কোনটায় ইতিহাসে পরিচিত চরিত্র বেশী (যেমন 'রাজসিংহে'), কিন্তু সবগুলিতেই সেই অতীত যুগের সমাজের, ঘর-বাড়ীর, মানবচিন্তার, আচার-ব্যবহারের অনেকাংশে সত্য চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু এগুলিতে পদে পদে খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করা হয় নাই, কারণ এরূপ সত্যের চিত্রের উপর বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়া এক 'অলোক আলোকের' রং ফলাইয়া দিয়াছেন, তাহার কথা পরে বলিব।

বঙ্কিম নিজে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে একটি বড়ই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ ছিল যে, ইতিহাসের সত্য ঘটনা মাত্র উপন্যাসের ভাষায় বিবৃত করিলে তবেই তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নামের যোগ্য; অর্থাৎ তাহাতে অধিকাংশ পুরুষগুলি ইতিহাসে পরিচিত ব্যক্তি হইবে, এবং অতি কম সংখ্যায়

কাল্পনিক চরিত্র থাকিবে; কথাবার্ত্তাগুলি প্রায়শঃ তাঁহার নিজের রচিত, কিন্তু বর্ণিত ঘটনা এবং বিষয়-পরিকল্পনা (প্লট) একেবারে নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে তোলা।

তাঁহার এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় 'রাজসিংহ' ভিন্ন ঐ অপর ছয়টি গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে পারে না। তবে, তিনি এগুলি লিখিলেন কেন? তাঁহার গার্হস্থ্য উপন্যাসগুলিই তো তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা, প্লট গাঁথিবার, চরিত্র সৃষ্টির, কথোপকথন রচিবার শক্তি প্রমাণ করিয়াছিল। সেই শ্রেণীর আরও নভেল লিখিয়া গেলে তাঁহার যশের কিছুমাত্র হ্রাস হইত না। তাঁহার মস্তিষ্ক তো জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট তেজ দেখাইয়া গিয়াছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছি। বঙ্কিম মর্ম্মে মর্ম্মে, শরীরের সূক্ষ্মতম স্নায়ুতে পর্য্যন্ত, স্বদেশ-প্রেমী স্বজাতি-ভক্ত। 'বঙ্গদর্শনে'র সর্ব্বপ্রথম সংখ্যায় নবীন বঙ্কিম, 'প্রচারে'র সর্ব্বপ্রথম সংখ্যায় প্রবীণ বঙ্কিম, সেই একই কথা বলিতেছেন ঃ---"অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী।...জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি। ইতিহাস-বিহীন জাতির দুঃখ অসীম।... বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।" "যে বলে যে,...বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব,...তাহার কথা মিথ্যা।...বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কওয়ালার বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি।"

পরদেশের নানা উৎকৃষ্ট ইতিহাস পড়িয়া যেমন তাঁহার মনের বিকাশ ও উদারতা জন্মিল, তেমনি দুঃখ হইল যে, "হায়! ভারতের অতীত কাহিনী তো এমন সুন্দর এমন বিপুল করিয়া লেখা হয় নাই; বিশেষতঃ আমাদের নিজস্ব বঙ্গজননীর ইতিহাস নাই বলিলেই হয়, আর যাহা ইতিহাস বলিয়া চলিতেছে তাহা লজ্জা ও হীনতার কারণ মাত্র।" 'আনন্দমঠে'র ভাব অন্তঃসলিলা গঙ্গার মত 'আনন্দমঠে'র স্রষ্টাকে আদি যৌবন হইতেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যদিও এই ভাব তাঁহার লেখনীমুখে প্রকাশ পাইতে অনেক বৎসর বিলম্ব ঘটে। তাই, তিনি প্রথম হইতেই বাঙ্গলার ইতিহাস খুঁজিতে লাগিলেন, অনেক গ্রন্থ পড়িলেন, কিন্তু ইতিহাস গড়িতে পারিলেন না, কারণ সে সময়ে উহার উপাদানগুলি হাতে পাওয়া যাইত না, তাহার মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব, এমন কি নাম পর্য্যন্ত, তখন

জানা ছিল না। সুতরাং বঙ্কিমের পক্ষে মনের মত ভারত-ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব হইল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিরত হইলেন না। "ভারতকলঙ্ক," "বাঙ্গালার ইতিহাস," "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামক প্রবন্ধগুলিতে মনের ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর, অপর দিকে ফিরিয়া মনশ্চক্ষু দিয়া আমাদের অতীত যুগকে নিজের সম্মুখে সৃষ্টি করিয়া, তাহার জীবনপ্রবাহ আমাদের কাছে আনিয়া দেখাইলেন।

এই অন্তর্নিহিত ভাবধারাই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির—বিশেষতঃ শেষের তিনখানির—সৃষ্টিরহস্য এবং সাহিত্যিক আকারের কারণ দেখাইয়া দেয়। এগুলিতে ঘটনা, চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তার পরিকল্পনায় বঙ্কিম অনেকটা ঐতিহাসিক সত্য দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই গ্রন্থগুলিতে সেই সেই কালের জ্ঞাত জীবন ও ঘটনার নিছক সত্য ফোটোগ্রাফ আঁকেন নাই। প্রায় সকল ফোটোগ্রাফই মানুষের বাহ্য আকৃতির প্রাণহীন ছবি হয়; আর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র—যেমন লিউনার্দো দা ভিঞ্চি, রেমব্রাণ্ট অথবা স্যর্ জোশুয়া রেনল্ডসের হাতের বিখ্যাত প্রতিকৃতিগুলি যেন সেই সব স্ত্রীপুরুষের অন্তর তাঁহাদের মুখের ভঙ্গিতে চোখের চাহনিতে প্রকাশ করিয়া দেয়; একবার দেখিলে ভুলা যায় না, যতই বেশী দেখা যায় ততই যেন নূতন নূতন ভাব দর্শকের মনে জাগাইয়া দেয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে এই গুণটি আছে বলিয়াই এগুলি অমর হইবে।

আনন্দমঠের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু? যদিও ইহাতে বর্ণিত লোকগুলি ইতিহাস হইতে তুলিয়া লওয়া নহে, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার করা। পলাশীর যুদ্ধের দুই শত বৎসর আগে হইতে দিল্লীর বাদশাহদের প্রবল শক্তির সময়ে ভূভারত জুড়িয়া অতি সুন্দর শাসনপ্রণালী, শান্তি (ঠিক Pax Britannica-র পূর্ব্বাভাষ) এবং সভ্যতা বিকশিত হয়, এ কথা আমি কত কত ইংরেজী গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছি। আবার ইংরেজী আমল দৃঢ়বদ্ধ হইবার পর আমরা এই দানগুলি ততোধিক পরিমাণে পাইতেছি। কিন্তু যখন মুঘল শাসন ও সভ্যতার অর্দ্ধচন্দ্র ডুবিয়াছে, অথচ ব্রিটিশেরা নিজ হাতে সাম্রাজ্যশাসন লইতে কুণ্ঠিত, শুধু বাণিজ্য এবং টাকা-আদায় ছাড়া বাঙ্গলায় কোন কাজ করিবেন না, সেই আঠার বৎসর—পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেষ্টিংস কর্ত্তৃক শাসন-সংস্কার আরম্ভ পর্য্যন্ত—বাঙ্গলার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব-লেখকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেকলের চক্ষে বাঙ্গালীরা—কি হিন্দু কি মুসলমান—সমান ঘৃণার পাত্র, মনুষ্য নামের উপযুক্ত কিনা

সন্দেহ। অথচ তিনি তাঁহার "লর্ড ক্লাইভ" এবং "ওয়ারেন্ হেষ্টিংস" নামক দুইটি জগদ্বিখ্যাত প্রবন্ধে এই অত্যাচার-অবিচারের জ্বলন্ত চিত্র দিয়াছেন। "Then was seen what we believe to be the most frightful of all spectacles, the strength of civilisation without its mercy." (পাঠক Everyman's Library edition, Macaulay's Essays, vol i. pp 560, 541, 555 ইত্যাদি দেখিবেন।) অতি আধুনিক অধ্যাপক রাম্‌জে মুয়র সেই সময়কে Power without responsibility-র যুগ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

আর সেই মন্বন্তরের সময় দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা মুহম্মদ রজা খাঁ কি কাজ করিলেন? স্বয়ং হেষ্টিংস তাঁহার বিলাতের প্রভুদের জানাইতেছেন:—"The effects of the dreadful Famine which visited these Provinces in the year 1770 and raged during the whole course of that year, have been made known to you.....Notwithstanding the loss of at least one-third of the inhabitants of the Province, and the consequent decrease of the cultivation, the nott collection of the year 1771 exceeded even those of 1768 [অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে ষোল আনা ফসল জন্মানর বৎসর].* It was to be naturally expected that the diminution of the Revenue shou'd have kept an equal pace with the other Consequences of so great a Calamity. That it did not, was owing to its being violently kept up to its former Standard. One tax [called Najay নাজাই]·· equally impolitic in its Institution and oppressive in the mode of exacting it," ইত্যাদি।—[W. Hastings to the Court of Directors, dated 3 Nov. 1772. Forrest, London ed. ii. 263 et seq.]

হেষ্টিংস এই পত্রে দেখাইয়াছেন যে—

বাঙ্গলা সাল	বাঙ্গলা দেশে রাজস্ব টাকা আদায়
১১৭৫ [দুর্ভিক্ষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত] ··	১ ক্রোড় ৫২ লক্ষ
১১৭৬ [অল্প অল্প অজন্মা, শস্যের দাম চড়িল]	১ ক্রোড় ৩১ লক্ষ
১১৭৭ [সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ] ···	১ ক্রোড় ৪০ লক্ষ
১১৭৮ [প্রায় অর্দ্ধেক দেশ উজাড়, চাষী নাই, চাষ বন্ধ] ···	১ ক্রোড় ৫৭ লক্ষ।

* ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ হইতে রেসিডেন্ট বেচার সাহেবের লেখা পত্রেও প্রজার অকথ্য দুর্দ্দশা স্বীকার করা হইয়াছে। *C. H. I., v.* 207.

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ (নিতান্ত নেটিভ-প্রেমী নহেন) লিখিতেছেন—"The revenue affairs were solely in charge of Md. Raza Khan, who did not worry about the sufferings of the people. He collected the revenue almost in full and added 10 per cent for 1771."—(*Oxford History*, p. 508.)

ভারতে মুসলমান-শাসনের সেই অবনতির যুগে রাজকর্ম্মচারীদের অসহ্য অত্যাচারের ফলে হিন্দু প্রজারা ক্ষেপিয়া বিদ্রোহী ও দলবদ্ধ হইয়া উঠিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। বিখ্যাত লেখক সৈয়দ ঘুলাম হুসেন তবাতবাই (সিয়র্-উল্-মুতাখ্‌খরীন-রচয়িতা) তাঁহার সেই সর্ব্বজন-আদৃত ইতিহাসে ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন— "আজ্ আহদ্-ই মুইন্-উল্-মুল্‌ক্" হইতে "বহম্ রসীদ্" পর্য্যন্ত (ঐ মূল ফারসী গ্রন্থ, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আদি সংস্করণ, ৩য় ভাগ, ৫০-৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ; অর্থাৎ "মুইন্-উল্-মুল্‌ক্ (পঞ্জাবের সুবাদার)এর সময় হইতে…এই সুবাগুলির আয়ে ব্যয় পোষাইত না। সে জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল। তাহারা দুর্ব্বল, কোন আশ্রয় বা পলাইবার স্থান পাইল না। শিখ সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য— এমন কি, ধর্ম্মের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং যেখানেই অত্যাচার হইত, সেই বাড়ীর লোক মাথার চুল লম্বা রাখিয়া, '[শ্রী] অকাল, অকাল!' এই রব করিয়া গুরুগোবিন্দের পন্থ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, এবং অপর শিখগণ তাহাদের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইত।"

ঠিক সেই কারণে, সেই শতাব্দীতে, বাঙ্গলায়ও জোট বাঁধিয়া "সন্তানেরা" বিদ্রোহী হয়, ইহা বঙ্কিম দেখাইয়াছেন।

সত্য বটে, লোক তারিখ ও ঘটনার খুঁটিনাটি দেখিতে গেলে তাঁহার এই শ্রেণীর উপন্যাসে অনেক অভাব অনেক স্বকপোলকল্পনা ধরা পড়িবে, এমন কি বর্ত্তমান সময়ে চলিত স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতেও এগুলি অনেক স্থলে ভুল বা ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ইহাতে আছে মানুষের জীবন্ত ছবি। বঙ্কিমের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই অতীত ভারতের স্থলে স্থলে কল্পিত ব্যক্তিগণ নিজ প্রকৃত চরিত্র দেখাইয়া আমাদের নিকট অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেছেন ; আমরা সেই সেই যুগের ভারতের গ্রাম-নগর, নর-নারী, অবিস্মরণীয় কোন কোন মহাপুরুষদের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ পাইতেছি ; তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সময়কে নিজ পাড়াপ্রতিবাসীর, নিজ ঘরের লোকের মত চিনিতে পারিতেছি। তাঁহার এই উপন্যাস কয়টিতে ইতিহাস হইতে জানা পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিখুঁত সব সত্য নাই কেন ?

তাহার এক কারণ বঙ্কিমচন্দ্র সেই সেই যুগের ফোটোগ্রাফ দিতে আদৌ চান নাই; তিনি এগুলিকে গদ্য-কাব্য আকারে সৃষ্টি করিবেন, লোকশিক্ষার যন্ত্র করিবেন বলিয়া কলম ধরিয়াছিলেন। কিছু কিছু বাস্তব সত্য ইতিহাস হইতে লইয়া, তাহাতে তাঁহার অদ্বিতীয় চরিত্রসৃষ্টির কল্পনা যোগ করিয়া, সবটার মধ্যে নিজ উর্দ্ধপ্রবাহিণী ভাবধারা* ঢালিয়া দিয়া এই গ্রন্থগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, এক অপূর্ব্ব সামগ্রী বাঙ্গলা সাহিত্যকে দান করিলেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের দেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মসলার অভাবে উপন্যাস-লেখক—অনেক স্থলে পেশাদার ঐতিহাসিকও—কল্পনার সাহায্যে ফাঁক পুরাইতে বাধ্য হন। এ কথাটা অতি পরিষ্কার বুঝা যাইবে, যদি আমরা তাঁহার 'আনন্দমঠে'র সহিত স্কটের 'ওল্ড্ মর্টালিটি'র তুলনা করি। দুইটি গ্রন্থই বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বা ধর্ম্মোন্মত্ত যোদ্ধাদের রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষের কাহিনী। কিন্তু স্কটের গ্রন্থে কভেনাণ্টারদের বাক্য ও কার্য্যগুলির প্রায় সমস্তই ইতিহাসে পাওয়া যায়, কারণ তাহাদের কথাবার্ত্তার রিপোর্ট এবং তাহাদের লিখিত পুস্তিকা ও অসংখ্য চিঠি বর্ত্তমান আছে; ইতিহাস-লেখক ঐ বিদ্রোহীদের ঘরের কথা তাহাদের মুখ হইতেই শুনিতে পাইতেছেন; তাহার উপর প্রতিপক্ষের অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র কাহিনী তো আছেই। কিন্তু বিদ্রোহী সন্তানগণ নিরক্ষর; তাহারা বা তাহাদের দলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য কেহ সে সময়ে কোন বিবরণ লিখিয়া যায় নাই; তাই আজ আমাদের একমাত্র পুঁজি হেষ্টিংস লাটের কয়খানা চিঠি এবং রেকর্ড অফিসে রক্ষিত নিম্ন ইংরেজ কর্ম্মচারীর কয়খানা রিপোর্ট, সুতরাং এখানে একতরফা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ যুগের ঘটনার বিবরণ ও মানবচরিত্র সৃষ্টি করা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই।

কিন্তু এটা সত্যসত্যই ক্ষতির কারণ নহে। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে এমন পদার্থ আছে যাহা "পাথুরে, বিজ্ঞানসম্মত" ইতিহাসে কখন পাওয়া যায় না। সেটি সেই যুগের প্রাণ। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। লীটন যখন তাঁহার "লাষ্ট্ ডেজ্ অব্ পম্পি" লেখেন, তাহার পূর্ব্বে অনেক দিন ধরিয়া পম্পি-নগরী ধ্বংস হইবার সময় যে সব গ্রীক ও রোমান লোক তথায় বাস করিত তাহাদের ঘরকন্না, হাটবাজার,

* আইডিয়ালিজ্‌ম্ কথাটাকে যদি 'আদর্শবাদ' বলি, তবে এ অনুবাদে ইংরাজীর গন্ধ থাকিয়া যাইবে, তাই উপরের কথাটি ব্যবহার করিব। তেমনি "শিক্ষার বাহন" (vehicle) এই অদ্ভুত শব্দটা শুনা মাত্র শ্রীশ্রীশীতলা দেবীর বাহনকেই প্রথমে মনে পড়ে!

নাট্যশালা, কাছারি, দৈনিক জীবন ও চিন্তা, মন্দির ও গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের লেখা অনেক অনেক পুস্তক পড়িয়া এগুলির বিস্তৃত অতি নিখুঁৎ চিত্র আঁকিয়াছিলেন; যেন সেই যুগে সেই শহরের কতকগুলি ফোটোগ্রাফ দিয়াছেন। লীটনের নভেলখানিতে বাহ্য পরিচ্ছদ ঠিক আছে, অবিকল সত্য; কিন্তু উহার মধ্যে প্রাণ কই? উহার মধ্যকার মানবচরিত্রগুলি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে নাই কেন? সমালোচক মেকলে ঠিক বলিয়াছেন যে, এডিসনের মত পণ্ডিত ক্লাসিকাল্ স্কলারের রচিত কেটো নাটকের মহাসম্ভ্রান্ত রোমান্ সিনেটর্ অপেক্ষা স্কটের উপন্যাসে বর্ণিত বর্ব্বর দরিদ্র ডাকাত মস্টরুপার্ অনেক বড়, কারণ অধিকতর জীবন্ত, অধিকতর বাস্তব। এই পরীক্ষায় বঙ্কিমের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অপরাজিত, সাহিত্য সর্ব্বপ্রথম পদ অধিকার করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র প্রথা লীটনের পন্থার বিপরীত। প্রথমেই তো গোড়ায় গলদ; তাহার 'সন্তানেরা' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত; কিন্তু যে সব "সন্ন্যাসী ফকিরেরা" সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্গীতার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আর আসল "সন্ন্যাসী"রা ছিল শৈব, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের নাগা-সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, যদিও ইংরেজের ভয়ে তাহারা এখন অস্ত্র রাখিতে বা লুঠ করিতে পারে না। এই সব সন্ন্যাসী গোঁসাই যোদ্ধাদের প্রকৃত ইতিহাস "রাজেন্দ্রগিরি গোঁসাই" (মৃত্যু দিল্লীর বাহিরে যুদ্ধে, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং তাহার চেলা "হিম্মৎ বাহাদুর" সম্বন্ধে রচিত ফারসী গ্রন্থ এবং হিন্দী "হিম্মৎ বাহাদুর বিরুদাবলী" প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বিপ্লবকারী সন্ন্যাসীদের অতি মূল্যবান সত্য বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার *Dawn of New India* (1927)তে এবং রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ তাঁহার *Sannyasi Fakir Raiders of Bengal* গ্রন্থে (Bengal Secretariat Book Depot, 1930) দিয়াছেন। পাঠক উৎসুক হইলে এ দুইখানি ইতিহাস পড়িবেন।

সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী

এবং তাহাদের কার্য্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ডযুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য এবং এ বইখানি কোন মতেই ঐতিহাসিক এই বিশেষণ পাইতে পারে না।

সে কথা মানিলাম। কিন্তু 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র মধ্যে যে অমৃতরস আছে তাহা এ তিনখানি গ্রন্থ অপেক্ষা শতগুণ বেশী "সত্য" ঐতিহাসিক কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না। সেই রস বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের ঊর্দ্ধপ্রবাহিণী ভাবধারা-রূপ উৎস হইতে অবিরাম ঝরিতেছে। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে, আত্মসংযম ও ধর্ম্ম-অনুশীলনের ফলে মানব-চিত্ত ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈতিক সোপানে উঠিতে থাকে, অবশেষে এই সব কর্ম্মযোগীরা আর পার্থিব রক্তমাংসের নরনারী থাকে না, নরদেহে দেবতা বা বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়া যায়। এই যোগসাধনা বড় কঠিন, এই ক্রমোন্নতির পথ যেন ফুরায় না ; যেমন 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রামানন্দ ভক্তির ভাবগুলি ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না, তিনি ক্রমাগত দাবি করিতেছেন "আরও কহ" অর্থাৎ আরও উঁচুতে উঠ, আরও গভীরতর হৃদয়-স্তরে পৌঁছাও। বঙ্কিমের বর্ণিত আদর্শ ঠিক সেই মত কঠোর সাধনার ফল, ইহাতে সিদ্ধি অতি কম কয় জন পাইয়াছেন ; ভবানন্দ জীবানন্দের মত লোক পর্য্যন্ত ব্রতভঙ্গ করিলেন। দেবী চৌধুরাণী "দশ বৎসর ধরিয়া বাঁধ বাঁধিয়াছিল," কিন্তু তাহাকেও নিশি ঠাকুরাণী বলিতে বাধ্য হইলেন, "এই কি তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম ? এই কি সন্ন্যাস ? তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।"

এই নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুশীলনের যে জীবন্ত দৃষ্টান্তগুলি বঙ্কিম অতুলনীয় তুলি দিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের মন এক অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তিতে সতেজ হইয়া উঠে ; আমরাও যেন ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হইতেছি ; নিজ জীবনে কৃচ্ছ্র সাধনা করিবার, নৈতিক উন্নতির চরমে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনেও জাগিয়া উঠে ; আবার পরক্ষণেই হতাশা ও অবসাদ আসিয়া আমাদিগকে মর্ত্ত্যে নামাইয়া দেয়। আগুনে পোড়াইয়া হাতুড়ি পিটিয়া লোহাকে যেমন ইস্পাত করা হয়, তেমনই বড় দৈন্য, বড় দুঃখ, বড় কঠোর সংযমের ভিতর দিয়া শান্তি ও জীবানন্দ, দেবী ও শ্রী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মহান্ আদর্শ আকাশের রামধনুর মত চিরদিন দূর হইতে মানবকে আহ্বান করিতে থাকিবে—বিশ্বমানবকে, আমাদের জাতিকে, মৃতসঞ্জীবনী সুধা দিতে থাকিবে। এই গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন এই মর্ত্ত্যলোকের অতীত এক নূতন জগতের প্রবেশদ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল, তাহার ভিতর দিয়া 'অলোক আলোকে' উদ্ভাসিত এক

কল্পনার মায়াপুরী অল্প অল্প দেখা দিতেছে। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের চিহ্ন; ইহার জন্যই 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারামে'র অমরত্ব।

একখানা প্রাচীন প্রস্তরে এই বৌদ্ধ মন্ত্রটি খোদা আছে (সহজ সংস্কৃত আকারে দিলাম):—

ত্রিণি অমৃত-পদানি সু-অনুষ্ঠিতানি
নিয়ন্তি স্বর্গম্—দম ত্যাগ অপ্রমাদঃ।

"তিনটি অমৃত-পদ মানুষকে স্বর্গে পৌঁছাইয়া দেয়; সে তিনটি—আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, এবং স্থির সত্য বুদ্ধি।" ইহাতে গীতার শিক্ষা এক কথায় ব্যক্ত হইয়াছে; ইহাই বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়; এই জন্যই সেগুলি পাঠকচিত্ত উদ্বেলিত করিয়া দেয়, সুখ দেয় না।

আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, অতি প্রতিভাশালী কথাশিল্পীর রচনা; তাহাতে জ্বলন্ত বর্ণে প্রবৃত্তিমার্গ চিত্রিত হইয়াছে; তাহার নায়িকা শ্রীমতী গাভী (মাদাম্ বোভারি), যেদিকে বাসনা সেই দিকে গা ঢালিয়া দিয়া যান এমন সহজে এমন সুন্দররূপে যে পাঠক-পাঠিকা তাহাতে অজ্ঞাতসারে প্রলুব্ধ হয়। বিশ্ব-সাহিত্যে এগুলি হয়তো চিরদিন পড়িবার লোক পাইবে, কিন্তু ইহারা পাঠককে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারিবে না, এগুলি

নিয়ন্তি স্বপ্নম্—

অর্থাৎ পড়িয়া আরামে ঘুম পায়, একেবারে মনে ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক হয় না, ইহারা বিবেককে নাড়া দেয় না। বঙ্কিম সে পথে যান নাই।

আজ ৪৪ বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের গগন হইতে অপসৃত। কিন্তু তাঁহার মহাকাব্য 'আনন্দমঠে'র নিভৃত রস যে পান করিয়াছে, সেই যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছে যে, আমাদের জাতীয়তায় দীক্ষার ঋষি জ্যোতির্ম্মণ্ডিত দেহে হিমাচলের শিখরে দাঁড়াইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে ডাকিতেছেন—

স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ,
সব জড়তা হ'তে জাগ, জাগ রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে।

মুক্তি কোন্ পথে, এ প্রশ্নের উত্তর ইহাই।

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভূমিকা

(সম্পাদকীয়)

'আনন্দমঠে'র ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে স্যর্ যদুনাথ সরকার লিখিত একটি ভূমিকা এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের দিক্ দিয়া 'আনন্দমঠ'-সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ঐ ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'র "বিজ্ঞাপনে" (১৮৮৪ খ্রীঃ) স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও স্মরণীয়।

> "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।...পাঠক মহাশয়, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আনন্দমঠকে..."ঐতিহাসিক উপন্যাস" বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

'আনন্দমঠে'র তৃতীয় সংস্করণের (১৮৮৬ খ্রীঃ) দুইটি Appendix-এ Gleig's *Memoirs of the Life of Warren Hastings* এবং Hunter's *Annals of Rural Bengal* হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ "ঐতিহাসিক পরিচয়" দিয়াছেন।

ইতিহাস ছাড়াও অন্য নানা কারণে 'আনন্দমঠে'র প্রসিদ্ধি। এই উপন্যাস এবং ইহার অন্তর্গত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বদেশে ও বিদেশে যত আলোচনা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোনও রচনা লইয়া তত আলোচনা হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে, বঙ্গদেশে এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষে যে স্বদেশী-আন্দোলনের বন্যা দেশের আপামরসাধারণকে চঞ্চল এবং শাসক-সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, সরকারী এবং বেসরকারী সকল সমালোচক, সন্তান-বিদ্রোহের সহিত তাহার যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন; এই কারণে 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দে মাতরমে'র কম দুর্গতি হয় নাই। ক্ষুব্ধ মুসলমান-সম্প্রদায় এই পুস্তকে ইসলাম-বিরোধিতা এবং উক্ত সঙ্গীতে পৌত্তলিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়াছেন; এই আন্দোলনের শেষ এখনও হয় নাই।

সাহিত্য ও সমাজের দিক্ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসের ধারা ত্যাগ করিয়া 'আনন্দমঠে' সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন; এখানে তাঁহার সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক হইয়া

উঠিয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী তুইটি উপন্যাসে—'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—এই শেষোক্ত ধারারই পরিণতি; বস্তুত, তাঁহার এই শেষ উপন্যাস তিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচারদোষ-তুষ্ট বলিয়া বহু সাহিত্যিকের নিন্দাভাজন হইয়াছে; আবার অনেকে এই "উপন্যাস-ত্রয়ী"কে তাঁহার পরিণত বয়সের মহোত্তম কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস হইতে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকে; ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে উহা সমাপ্ত হয়। ১২৮৯ সালেই (ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীঃ) পুস্তকাকারে 'আনন্দমঠে'র প্রথম সংস্করণ "কলিকাতা জন্‌সন্ প্রেসে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত" হইয়াছিল। এই পুস্তক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গীকৃত হয়। প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা ১, প্রথম খণ্ড ২৫ ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০,—মোট ৪৬ পরিচ্ছেদে ১৯১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণে (৫ম সং.) ইহা উপক্রমণিকা ১, প্রথম খণ্ড ১৮, দ্বিতীয় খণ্ড ৮, তৃতীয় খণ্ড ১২ ও চতুর্থ খণ্ড ৮—মোট ৪৭ পরিচ্ছেদে ২১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। এখনকার দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদটি চতুর্থ সংস্করণের পর ও পরিশিষ্ট তুইটি দ্বিতীয় সংস্করণের পর নূতন সংযোজন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "উপক্রমণিকা"র সহিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত "উপক্রমণিকা"র বিশেষ পার্থক্য আছে—

> প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।"
> "আর কি আছে? আর কি দিব।"
> তখন উত্তর হইল, "তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।"
>
> —'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৮৭, পৃ. ৫৩৯।

পুস্তকে "এ পণে হইবে না" স্থলে "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে" এবং "তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব" স্থলে "ভক্তি" লিখিত হইয়াছে। এই সামান্য পরিবর্ত্তনেই পুস্তকের মূল আদর্শের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১২৮১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' "কমলাকান্তের দপ্তর। একাদশ সংখ্যা। আমার তুর্গোৎসব" প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রথম জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন করিলেন। 'আনন্দমঠে'র মূল আদর্শ এই পরিকল্পনারই পরিণতি। এই পরিণতি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে গোড়ার কথাগুলিও স্মরণ করিতে হইবে—

> দেখিলাম---অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে---আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল

সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? ·· চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

·· তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ·· সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ ·· ?

'আনন্দমঠে'র মূলমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত তথ্য ইহাই—"মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?" ছয় কোটি বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তকোটি হইয়াছে, তফাৎ এই মন্ত্রে। আর তফাৎ, "বন্দে মাতরম্" আশাবাদীর সঙ্গীত।

এই মাতৃপূজার সহিত 'আনন্দমঠে' অন্য যে একটি প্রবৃত্তি মাখামাখি হইয়া আছে, ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'র 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র "একটি গীতে" তাহার প্রথম দর্শন পাই; 'আনন্দমঠ' ঠিক ইহার আট বৎসর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দু জাতিকে স্বাধীন দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের মনে কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই; যদিচ পরিণত বুদ্ধির সহায়তায় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় এই স্বাধীনতা হিন্দুর লক্ষ্য নয়। তাঁহার 'আনন্দমঠে'র শেষ দৃশ্যে বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বাধীন হইবার এই প্রবৃত্তি তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই,

এবং এই কারণেই 'আনন্দমঠে'র সন্তানেরা মৃত্যু পণ করিয়াছিল। "একটি গীতে" দেখিতে পাই—

> গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি।
>
> মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মাজ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন।

'আনন্দমঠে'র সন্তানসম্প্রদায় বঙ্গজননীর এই লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম স্বীয় অপরিসীম প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিজয়-গৌরব দিতে পারেন নাই। 'আনন্দমঠে'র ট্র্যাজেডি ইহাই।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাওড়ায় বদলি হন; হাওড়াতে আসিয়াই স্থানীয় কলেক্টর সি. ই. বাক্‌লণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে, এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 'আনন্দমঠ' এই সময়ের রচনা। কেহ কেহ উপরি-উক্ত দুই ঘটনার সহিত 'আনন্দমঠে'র কিছু সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন।*

'আনন্দমঠ' রচনা সম্পর্কে বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন,

> বর্ষীয়ান্ খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানা প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল; কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৫১-৫২।

* অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ২৭৩।

জয়দেবের "ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" কবিতাটী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে; কি যৌবনে, এই কবিতাটী তাঁহার মুখে শুনিতাম, যখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটী যে তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতি 'আনন্দমঠে' রাখিয়া গিয়াছেন,...

আর একটী গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যকালে আপনি এই গীতটীতে মাতিয়াছিলেন, পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে এই গীত তিনি প্রথম শুনিলেন।...এক বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া সদর রাস্তায় এই গানটী গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রৎ—মধুর কণ্ঠে এই রাত্রে কে গীত গাহিতেছে শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম, গান শুনা যাইতেছিল না, অগ্রজ একটা জানালা খুলিয়া দিলে গীতটী শুনিতে পাইলাম—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।" বৈষ্ণব এই গীতটী গাহিতে গাহিতে ঠাকুর বাটীর দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" আওড়াইতে আওড়াইতে জানালা বন্ধ করিলেন।

—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩৯-৪০।

'আনন্দমঠ' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কাল কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,

> বউবাজার ষ্ট্রীটের যে বাড়ীর সম্মুখের খণ্ডে এক্ষণে মুখুর্জী কোম্পানির হোমিওপেথিক ঔষধের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় দিন কতক তিনি সেই বাড়ীতে ছিলেন। একদিন বৈকালে সেই বাড়ীতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। *

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখিয়াছেন,

বঙ্কিমের পিতৃগৃহ বর্ত্তমানসময়ে নিতান্ত ভগ্নাবস্থাগ্রস্ত। তাঁহার নিজ নির্ম্মিত বৈঠকখানাও ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ঐ গৃহে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচিত হইয়াছিল।

—'বঙ্কিমচন্দ্র' পৃ: ৩২-৩৩।

হুগলীতে অবস্থানকালে যে 'আনন্দমঠে'র গোড়াপত্তন হইয়াছিল, অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

> যখন আনন্দমঠ সূতিকাগারে, তখন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার আর একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেন, উভয়ের পাশাপাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনি আসেন, আমিও যাই। তিনি স্বরজ্ঞ, বড় টেবল হারমোনিয়ম্ লইয়া তিনি 'বন্দে মাতরম্'

* 'প্রদীপ'—আষাঢ়, ১৩০৫, পৃ. ২১৮-১৯।

গানে মল্লারের সুর বসান। বঙ্কিম বাবুকে সুরের খাতিরে যৎসামান্য অদল বদল করিতে হয়। একদিন ক্ষেত্রবাবু আসেন নাই, বঙ্কিম বাবু আনন্দমঠের শেষে যুদ্ধের ভাগ তাঁহার হাতের লেখা খাতায় আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি দেখিলাম, অজয় নদের উভয় পার্শ্বে স্থান, আমি 'সন্তান' শব্দ বুঝিতে না পারিয়া 'সন্তাল' পড়িতেছিলাম—মনে মনে। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এবার কি Santal Insurrection theme হইল না কি"। তিনি বলিলেন, "না Sanyasi Insurrection." আমি বলিলাম এই যে, "আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আর বার বার বলিতেছেন, সন্তাল, সন্তালগণ"। তিনি তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "একটা তোমার অনিচ্ছাকৃত ভুল—সন্তাল নয়, 'সন্তান'। আর একটা আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল—অজয় নদ ও বীরভূমি।" তখন হো হো করিয়া দুই জনে হাসিতে লাগিলাম। *

"বন্দে মাতরম্" গান রচনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা ইহা 'আনন্দমঠ' লেখার পূর্ব্বে রচিত; কেহ কেহ মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডফিন্ সাহেব কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া প্রতিহিংসাপরবশচিত্তে ইহা রচনা করিয়াছিলেন। "বন্দে মাতরম্" গানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যে উচ্চ ধারণা ছিল, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং বঙ্কিম-কন্যা প্রমুখ অনেকে তাহা বিবৃত করিয়াছেন।

'আনন্দমঠ', 'আনন্দমঠে'র বিভিন্ন চরিত্র, দেশমাতৃকার পূজা ও "বন্দে মাতরম্" সম্পর্কে এদেশে এবং বিদেশে অসংখ্য আলোচনা হইয়াছে। নিম্নলিখিত আলোচনা উল্লেখযোগ্য—

The Encyclopædia Britannica, 11th Edition, Vol. VI, pp. 9-10; Dr. G. A. Grierson—*The Times*, Sept 12, 1906; Sir Henry Cotton—*The Times*, Sept. 13, 1906; J. D. Anderson—*The Times*, Sept. 24, 1906; গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—'বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠ'; S. M. Mitra—*Indian Problems*, London, 1908; Lord Ronaldshay—*The Heart of Aryavarta*, Chapter X; Verney Lovett—*History of the Indian Nationalist Movement*, pp. 62-63; G. T. Garratt—*An Indian Commentary*, p. 136; J. D. Anderson—*The Modern Review*, Jan. 1919; হারাণচন্দ্র রক্ষিত—'বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম'; Sir Surendranath Banerjea—*A Nation in Making;* Count Keyserling—*The Book of Marriage;* কালীপ্রসন্ন ঘোষ—"আনন্দমঠের মূলমন্ত্র",

* বঙ্গদর্শন—ভাদ্র, ১৩১৯

'বান্ধব', ৭ম বর্ষ ; বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়—'নব্যভারত', ১ম খণ্ড ; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—"বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী", 'নারায়ণ', বৈশাখ, ১৩২২ ; কিরণশঙ্কর রায়—"আনন্দমঠ", 'সবুজপত্র', ১৩২৬ ; ললিতচন্দ্র মিত্র—'স্বদেশ প্রতিমা' ; Sri Aurobindo—*Rishi Bunkim Chandra* ; অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র' পৃ. ৩০৮-৩৩৮ ; নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' ২য়-৩য় খণ্ড ; Jayanta Kumar Das Gupta—*Life and Novels of Bankim Candra*, pp. 102-111 ; শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিম-জীবনী', ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৮৬-৩০৩ ; পূর্ণচন্দ্র বসু—'কাব্যসুন্দরী', পৃ. ২০০-২২৩ ; যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত—"বাঙ্গালার মাতৃমূর্ত্তি", 'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ ; ইত্যাদি

এতদ্‌ব্যতীত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি স্বদেশী-যুগে নানা ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রে 'আনন্দমঠ' ও "বন্দে মাতরম্" লইয়া অসংখ্য আলোচনা করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ'-সম্পর্কে অন্য অনেকের লেখাও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার উল্লেখ সম্ভবপর নহে।

ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের 'সাহিত্যে' 'আনন্দমঠ'-সম্পর্কে বঙ্কিমের একটি উক্তি প্রচার করিয়াছেন ; বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলিয়াছিলেন As a patriotic work 'আনন্দমঠ' খুব ভাল বটে, কিন্তু উহাতে আর্ট কম। কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-সম্পর্কে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

> আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন ? এ ঈর্ষ্যাপরবশ আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল "বন্দে উদরং।"

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে *Abbey of Bliss* নাম দিয়া 'আনন্দমঠে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী গদ্যে ও পদ্যে 'বন্দে মাতরম্' গান অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্য অনুবাদও আছে। হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলুগু, কানারিজ ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে।

এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার সমালোচনা কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া আমরা তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি।...

> Of all his works however, by far the most important from its astonishing political consequences was the *Ananda Math*, which was published in 1882, about the time of the agitation arising out of the Ilbert Bill. The story deals with the Sannyasi (*i. e.* fakir or hermit) rebellion of 1772 near Purnea,

Tirhut and Dinapur, and its culminating episode is a crushing victory won by the rebels over the united British and Mussulman forces, a success which was not, however, followed up, owing to the advice of a mysterious "physician" who, speaking as a divinely inspired prophet, advises Satyananda, the leader of "the children of the Mother," to abandon further resistance, since a temporary submission to British rule is a necessity ; for Hinduism has become too speculative and unpractical, and the mission of the English in India is to teach Hindus how to reconcile theory and speculation with the facts of science. The general moral of the *Ananda Math*, then, is that British rule and British education are to be accepted as the only alternative to Mussulman oppression, a moral which Bankim Chandra developed also in his *Dharmatattwa*, an elaborate religious treatise in which he explained his views as to the changes necessary in the moral and religious condition of his follow-countrymen before they could hope to compete on equal terms with the British and Mahommedans. But though the *Ananda Math* is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book, of which the *Bande Mataram* is the most famous.

As to the exact significance of this poem a considerable controversy has raged. *Bande Mataram* is the Sanskrit for "Hail to thee, Mother !" or more literally "I reverence thee, Mother !", and according to Dr. G. A. Grierson (*The Times*, Sept. 12, 1906) it can have no other possible meaning than an invocation of one of the "mother" goddesses of Hinduism, in his opinion Kali "the goddess of death and destruction." Sir Henry Cotton, on the other hand (*ib.* Sept. 13, 1906), sees in it merely an invocation of the "mother-land" Bengal, and quotes in support of this view the free translation of the poem by the late W. H. Lee, a proof which, it may be at once said, is far from convincing. But though, as Dr. Grierson points out, the idea of a "mother-land" is wholly alien to Hindu ideas, it is quite possible that Bankim Chandra may have assimilated it with his European culture, and the true explanation is probably that given by Mr. J. D. Anderson in *The Times* of September 24, 1906. He points out that in the 11th chapter of the 1st book of the *Ananda Math* the Sannyasi rebels are represented as having erected, in addition to the image of Kali, "the mother who Has Been," a white marble statue of "the Mother that Shall Be," which "is apparently a representation of the mother-land. The *Bande Mataram* hymn is apparently addressed to both idols."

The poem, then, is the work of a Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualized Kali. Of its thirty-six lines, partly written in Sanskrit, partly in Bengali, the greater number are harmless enough. But if the poet sings the praise of the "Mother"

"As Lachmi, bowered in the flower
That in the water grows"

he also praises her as "Durga, bearing ten weapons," and lines 10, 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouths of unscrupulous agitators. Literally translated these run, "She has seventy millions of throats to sing her praise, twice seventy millions of hands to fight for her, how then is Bengal powerless ?" As S. M. Mitra points out (*Indian Problems*, London, 1908), this language is the more significant as the *Bande Mataram* in the novel was the hymn by singing which the Sannyasis gained strength when attacking the British forces

During Bankim Chandra Chatterji's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognized, was not used as a party war-cry ; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitations that followed the partition of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or desired any such use of it is impossible to believe. According to S. M. Mitra, he composed it "in a fit of patriotic excitement after a good hearty dinner, which he always enjoyed. It was set to Hindu music, known as the *Mallar-Kawali-Tal*. The extraordinarily stirring character of the air, and its ingenious assimilation of Bengali passages with Sanskrit, served to make it popular."

Circumstances have made the *Bande Mataram* the most famous and the most widespread in its effects of Bankim Chandra's literary works.

আনন্দমঠ

[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত পঞ্চম সংস্করণ হইতে]

উৎসর্গ

*　　*　　*

ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

*　　*　　*

স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১২শ অধ্যায়

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।
সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।
ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।
এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।

The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British Government? or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy providential in any sense? or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with what immediate end in view did providence send the British to this country? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter:—"The Physician said, Satyanand, be not crest fallen. Whatever is, is for the best. It is so written that the English should first rule over the country before there could be a revival of the Aryan faith. Harken unto the counsels of Providence. The faith of the Aryas consisteth not in the worship of three hundred and thirty millions of gods and goddesses; as a matter of fact that is a popular degradation of religion—that which has brought about the death of the true Arya faith, the so-called Hinduism of the Mlechhas. True Hinduism is grounded on knowledge, and not on works. Knowledge is of two kinds—external and internal. The internal knowledge constitutes the chief part of Hinduism. But internal knowledge cannot grow unless there is a development of the external knowledge. The spiritual cannot be known unless you know the material. External knowledge has for a long time disappeared from the country, and with it has vanished the Arya faith. To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or external knowledge. Now there is none to teach that; we ourselves cannot teach it. We must needs get it from other countries. The English are profound masters of physical knowledge, and they are apt teachers too. Let us then make them kings. English education will give our men a knowledge of physical science, and this will enable them to grapple with the problems of their inner nature. Thus the chief obstacles to the dissemination of Arya faith will be removed, and true religion will sparkle into life spontaneously and of its own accord. The British

Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not once more become great in knowledge, virtue and power. Hence, O Wise man, refrain from fighting and follow me." This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education. We may state it in this form : India is bound to accept the scientific method of the west and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were and runs through the tissue of the whole work.

The Liberal,
8th April, 1882.

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন

এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।

আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর Captain Edwardes নামের পরিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা গেল। অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা গিয়াছে। শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে। এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল।

উপক্রমণিকা

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশু-পক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছু কাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "**ভক্তি**।"

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে এক দিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃণ্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতী বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন

ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না! অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া, কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, "এরূপে কদিন চলিবে?"

কল্যাণী বলিল, "বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যত দিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া, সহরে যাইও।"

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

ক। সহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।"

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুই জনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধ সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।"

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুই জন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটিকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেড়া ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?"

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা

তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। এক দল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, এক জন দস্যু বলিল, "আমরা সোণা রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—

আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।” এক জন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। “চাল দাও”, “চাল দাও”, “ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণা রূপা চাহি না।” দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে এক জন বলিল, “শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।” তখন সকলে “জয় কালী!” বলিয়া, উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। “বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!” এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য এক জন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, এক জন মৃতশবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর এক জন বলিল, “রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌ন মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব; এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।” আর এক জন বলিল, “যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।” তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী, কন্যা লইয়া শুইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারি দিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারি দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!" সেই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা তৃষ্ণার অবসাদে, কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে, দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গায়িতেছেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি! অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। পুরাণতত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্য বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকাসকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর 'দুর্ভেদ্য' অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি কুঠারীমধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন, মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিতলোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা, এ দেবতার ঠাঁই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।"

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল

আশীর্ব্বাদ করিয়া, গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া, সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন,

"মা, কন্যাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।" কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ "আমি যতক্ষণ না আসি, কোন চিন্তা করিও না" বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল, প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, "মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।"

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, "কি বলিবে?"

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।"

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, "কি বাধা আছে আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না? আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?"

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিম্বা তাঁহার ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া, কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?" কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে অগ্নিতে দুগ্ধ

তপ্ত হইয়াছিল, অবনতমুখে তাহাতে কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমার বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।" কল্যাণী বলিলেন, "একটু জল এখানে আছে কি?" ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পুরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।" ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অমৃত পান করিয়াছি —আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।" ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। গাছের মাথাসকল চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সরসর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো হইয়া তরতর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বিটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে। এমন দুই শত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি

একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন; যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক জনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবা পুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ?"

ভবানন্দ তখন বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে —"

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয়? আমরা আজ লুঠিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হতে আমি তাহার স্ত্রী কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া, তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজানা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজানা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেন না, মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ এক জন গোরা। গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথে চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজানার গাড়ী ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যায় দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া—তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন এক জন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল, এবং "শালা—চোর—" বলিয়াই সহসা এক ঘুষা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্ত হস্তে কেবল ঘুষাটি ফিরাইয়া মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল; তাহা বলা বাহুল্য। ঘুষাটি খাইয়া সিপাহী মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারি জন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল, এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি এক জন

সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন; বলিলেন, "শালাকো পাকড়লেকে সাদি করো।" সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে, বিবাহ করিতে হইবে না, বিবেচনায় তিন চারি জন সিপাহী গাড়ীর গোরুর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজানা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তাসকল ছিল না। নগরসকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সম্রাট্‌নির্ম্মিত অপূর্ব্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন হইতে নগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। এই জন্য পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে এক জন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর এক জন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ শালা ডাকু হো।"

ভবা। দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন পরা ব্রহ্মচারী আমি, ডাকাত কি এই রকম?

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতি করে। এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া, টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভু, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "লেও শালা, মাথে পর একঠো মোট লেও।" এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের মাথার উপর একটা তল্পী চাপাইয়া দিল। তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বলিল, "না; পলাবে। আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ীর উপর সেইখানে বেঁধে রাখ।" ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল যে, কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ মাথার তল্পী ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী তল্পী মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ীর চাকার কচকচ শব্দ হইতে লাগিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি, তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপর রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া, ব্রহ্মচারী চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, "আরও এক শালা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।" তখন এক জন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, "উহার মাথায় মোট দাও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। "এই শালা হাওলদারকো মারা" বলিয়া এক জন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া, পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে "হরি! হরি! হরি!" শব্দ করিয়া দুই শত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না। তখনই সিপাহীরা চারি দিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে হরি হরি শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার," বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া, গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া ছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিল, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।" অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া এক জন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিল; "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান্!

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে কুকাজ—ডাকাতি।" ভবানন্দ বলিল, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সে কি?"

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস্যু?

দশম পরিচ্ছেদ

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুই জনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্ব্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্ত্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই; সেই রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর নাই। এখনই যে গর্ব্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্ত্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তি-শালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নগ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।" *

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্ল-কুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী

০ ১ × ১

* মল্লার—কাওয়ালী তাল যথা—বন্দে মাতরং ইত্যাদি।

নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা,—”

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “তবে আবার গাও।”

ভবানন্দ আবার গায়িলেন,—

“বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকবালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।"

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা?" ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভবা। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল—সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ী লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার।

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখ নি, এক দিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখ্‌লাম, একবার বই ত ছুবার মর্‌ব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল ছুধ ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দস্যু গায়িল ঃ—

"সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে!
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা।

ভবা। কেন, এখনি ত দুশ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান।

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের ক জন ফৌজ ছিল?

মহে। ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে?

ভবা। নয় কিসে? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে ইংরেজ মুসলমানে এত তফাৎ কেন?

ভবা। ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায়—ধর, তার পর, ইংরেজদের জিদ্ আছে—যা ধরে, তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়্বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দুশ জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না।

মহে। তোমাদের এ সব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে।

মহে। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে, আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে?

মহে। আমার স্ত্রীকন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল; ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরম্" গায়িতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গায়িল—দেখিল যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিল,—

"যদি স্ত্রীকন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।"

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, "আনন্দমঠে," সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে,

তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ?" মহেন্দ্র বলিল, "পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্র। মা—যা **ছিলেন**।

ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে

কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,

"দেখ, মা যা **হইয়াছেন**।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী।"

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমরা **সন্তান,** অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্।

"বন্দে মাতরম্" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"এই মা যা **হইবেন**। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—" বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।" তখন দুই জনে যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,

"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।”

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার স্ত্রী কন্যা কোথায় ?”

ব্রহ্ম। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে ?

ম। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথায় বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব ?”

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি, তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্ব্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রের লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না, তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যত দিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, তত দিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিও। কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর চোখ মুছার ধুম পড়িয়া গেল। যতবার চোখ মুছা যায়, ততবার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর অনুচর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না। এই জন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্য ফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রম দূর করিলেন। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, "বাড়ীতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া, কোন প্রকারে এক জন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুই জন গতক্লম হইয়া, কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে ত বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে এক জন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই, হাস কেন?"

গোঁসাই বলিল, "তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?"

মহেন্দ্র। যে প্রকারে হউক, প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "আপনি সন্তান?"

বৈষ্ণব বলিল, "হাঁ, আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিল; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর এক দিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুই পাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি? বিপদ্ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বুঝিতে পারি না।"

ক। কেন?

মহে। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুন। এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, "আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ্ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল, বলিতে পারি না—কিন্তু আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্ত্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে, এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে, আমি সে দিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি। সেও জ্যোতির্ম্ময়ী; কিন্তু চারি দিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা, কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রীমূর্ত্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া, ঢেউ দিতে দিতে, সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত শব্দ হইল। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে; তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে।' তখন আবার বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল, 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' আমি কি বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।" এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। "ভৃঙ্গরাজ" কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব—চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে?"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোক ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?"

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি? বিষ খাইবে?"

ক। "খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—" কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন। প্রতি পলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করিলেন না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিন্তু বলিয়া কি বলিতেছিলে?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া—বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটিতে রাখিলেন। তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল, মনে করিল, এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্য—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময় তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া—সবে গুটীকত দাত উঠিয়াছে—মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয়, বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য্য লাগিয়াছিল; কেন না, কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?"

মন্দটাই আগে বাপ মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে, বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে যে দুই এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছটফট করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া, কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে—কল্যাণী, ও কি করিলে ?"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "প্রভু, কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।"

"কল্যাণী, কি করিলে" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও।"

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!"

কল্যাণী। "কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ, এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।" এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, "দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ মারিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুই জন একত্রে অনন্ত স্বর্গভোগ করিব।"

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল; তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে :—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

তখন কল্যাণী অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কাননির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুর স্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন চারি দিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন যেন গাছের পাখীরাও বলিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিগণকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুই জনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশু পক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী—এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেন না, তাহারা ভিক্ষোপজীবী; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা, তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল। এজন্য বুভুক্ষু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্দ্ধপূরণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিকবসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণ কল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী।" আর এক জন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল—কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী; সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর এক জন শষ্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুই জনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল, এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, এক টানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া এক জন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিন জন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচ জন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি, যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচ জনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।" তখন তাঁহারা দুই জনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, আমি হরিনাম করিয়া থাকি—হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমার খালাসের

হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন ঃ—

ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর, গমনবিলম্বন
অতি বিধুরা সুকুমারী॥

ইত্যাদি।

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল রাজসরকারে এতালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না ; কেন না, বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না, আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল হরে মুরারে!" মহেন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে এ স্ত্রী কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও; মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার স্ত্রী কন্যাকে শৃগালে কুক্কুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।"

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন যে, মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে, মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরীক্ষা?"

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল,

"মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, "মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীর। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামা জোড়া পাগড়ি বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপ যাইব না।

ধীর। কেন—সে কি ?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে ?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাত দিন খায় নাই, রাস্তার ধারে পড়িয়া ছিল। তাহার জীবনদান জন্য জীবানন্দ দণ্ড দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন।

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।"

নদীর ধারে আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে না কি ? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমান কর্ত্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, "এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁর জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়—এই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।"

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। পাঠকের স্মরণ

থাকিতে পারে, মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে, ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা। কেন না, প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম.। যাহা হউক, মাতা মৃতা, কন্যাটি জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারি দিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছু দূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহারও চালে একটি ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেওয়ালে আলিপনা—কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারি দিকে মাটির প্রাচীর, চারি দিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনুর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটি কখন চরকার শব্দ শুনে নাই।

বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। "এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা, তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি?"

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কীল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, "বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেজিপেঁজি পেলি না কি? ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বই কি, খাবে?"

জীবানন্দ বলিল, "হাঁ খাব।"

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটি সেই যবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটি কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় এই যুবতীকে ফুল্লকুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয় উননের তাপের আঁচ মেয়েটিকে একবার লাগিয়াছিল, তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, "ও নিমি! ও পোড়ারমুখি! ও হনুমানি! তোর এখনও দুধ জ্বাল হলো না?" নিমি বলিল, "হয়েছে।" এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করে যে, এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব না কি?"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে খাবে?"

জীবা। ঐ মেয়েটি খাবে দেখছিস্ নে, ঐ মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকতক জল পড়িল তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা?"

জীবানন্দ বলিলেন, "তোর কি রে পোড়ারমুখী?"

নিমি বলিল, "আমায় মেয়েটি দেবে ?"

জীবানন্দ বলিল, "তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি ?"

নিমি। "আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—" বলতে বলতে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, "তুই নিয়ে কি করবি ? তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটি দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে, আমি চললুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটি খাব ? দুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাচা কলায়ের দাল, জঙ্গলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন,

"নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর ? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি ?"

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই ?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই শহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।"

জীবানন্দ বলিল, "বোনাই কোথা ?"

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সের দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ্ টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া

অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, "দাদা, আর কিছু খাবে ?"

জীবানন্দ বলিল, "আর কি আছে ?"

নিমাইমণি বলিল, "একটা পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল,

"দাদা আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা। আর এক দিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, "দাদা, আমার একটি কথা রাখিবে ?"

জীবা। কি ?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল্ না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখবে ?

জীবা। কি আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল্ ?

নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া একবার মাটিপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, "একবার বউকে ডাক্‌বো ?"

জীবানন্দ আচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি এক দিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার, তাই আমাকে বলিস্।"

নিমাই বলিল, "তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী। একবার বউকে ডাক্‌বো ?"

জীবা। "আমি চললুম।" এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায়,—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কবাট রুদ্ধ করিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, "আগে

আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বউয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।"

জীবানন্দ বলিল, "আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্?"

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, "বড় কীর্ত্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ কর্বে, লোক মারবে, আমি তোমায় ভয় কর্বো! তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।"

জীবানন্দ হাসিল, "ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ্ ফের যদি এমন কথা বল্বি, তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার্ করে দিব।"

নিমি মনে মনে বলিল, "আমিও তা হলে বাঁচি।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বউ শিগ্গির, শিগ্গির!" বউ বলিল, "শিগ্গির কি লো! ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?"

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, "তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল।" সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কি লো, তুই কি খেপেছিস্ না কি?"

নিমাই দুম করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, "শাড়ী বের কর।"

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য, কেন না, এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই,—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অনমুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর

সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল, "কি লো নিমি, কি হইবে?" নিমাই বলিল, "তুই পর্‌বি।" সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন! ত ঢাকাই শাড়ী কেন? চল না এমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল, এই ন্যাক্‌ড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপজলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে, তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, "ছি, কাঁদিও না; আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—"

জীবা। গ্রহণ করিব—শান্তি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন,

"কেন দেখা করিলাম!"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রত ভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। এক দিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার; এক দিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই এক দিকে আর এক দিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না যে, কোন্ দিক্ ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ,—যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থি বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে? আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি। সে সহায় যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতন ধর্ম্ম কি? আমি কোন্ ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না: কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল, "ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার

বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

জীবানন্দ বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—২২ কাহণ কড়ি।"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, এক দিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। এক দিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্ণমুখে জ্ঞানানন্দনামা এক জন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্য নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্নসকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রুশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব্বশোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশৈক দূরে দুইটি অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃত স্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতি রোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, কাদম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে বন্দিভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটিও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে কর লগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব। এইরূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি

দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল যেন, যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র, দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারিহস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন; "আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার জন্য শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন —যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?" হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "এ বাহুতে কি বল নাই?"—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "এ

হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে।—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল, আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড় কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে।” সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢাল যোদ্ধৃবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়বড় শব্দ করিতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশুসকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষিসকল ভয়ে উচ্চ রব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুল রবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া, কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল। এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই, তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্ট সাধনে প্রয়োজন নাই।” সন্তানদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের সম্বাদ পাইয়া, দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থ এক দল “পরগণা সিপাহী” পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমত নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা

তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি ছাত্র বাস করিত; শান্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত; তাহারাও শান্তিকে আদর করিত।

এইরূপ শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্য্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত। টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শান্তিও কখন খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরণী দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলা কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে ও গালের উপর দুলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; শান্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত। যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না। ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্ত্তমানে, অশ্লীল সংস্কৃতের দুই চারিটা বুক্‌নি দিয়া, দুই একটা আদিরসাশ্রিত গল্প করিতেন, টিয়া পাখীর মত শান্তি সেগুলিও শিখিল—টিয়া পাখীর মত, তাহার অর্থ কি, তাহা কিছুই জানিত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া,

শান্তির পিতা "যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি" বলিয়া, শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভালবাসিত—শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। এক জন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

তখন জীবানন্দের পিতা মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ পরের মেয়ের দায় ভার নেয় কে?" জীবানন্দ বলিলেন, "আমি আনিয়াছি আমিই দায় ভার গ্রহণ করিব।" পিতা মাতা বলিলেন, "ভালই।" জীবানন্দ অনূঢ়—শান্তির বিবাহবয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, "কাজটা ভাল হয় নাই।" শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ীর নিকটেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। এক দিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে এক দল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ, এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ

করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালকসন্ন্যাসিবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায়মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রাখর্য্য, চতুরতা, এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত, এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শান্তি সংস্কৃতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, এক জন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়াছি, কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা তিনি শান্তির অভিনব যৌবনবিকাশজনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যাকে আদিরসাশ্রিত কাব্যসকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শান্তি তাহা শিখে নাই; এখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল। পৌরুষ চরিত্রের উপর নির্ম্মল স্ত্রীচরিত্রের অপূর্ব্ব প্রভা আসিয়া পড়িয়া, শান্তির গুণগ্রাম উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শান্তি পড়া ছাড়িয়া দিল।

ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কীল ঘুষার দ্বারা পূজিত করিত—কীল ঘুষাগুলি সহজ নহে। এক দিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জ্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শান্তির হাতখানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতখানা শান্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শান্তি তাহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল যে, সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শান্তি সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে, এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য মিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গ্যাস জ্বালে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেবের পরেও কখন কখন আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন; যে সিন্দুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্দুকেই টাকা লইয়া যান; যম যার প্রায় সবগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তারই বাকিটিকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নির্ব্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্ম্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

জীবানন্দ বলিল, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।"

শান্তি বলিল, "তুমি ফিরিয়া আসিবে ত?" জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোন দিক্ না চাহিয়া, সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীয় রমণীচরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল। সুখস্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক, শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল। তাহাই আমি পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল,

"তবু ত দেখা হলো।"

শান্তি কিছুই উত্তর করিল না। চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল—বলিল,

"দেখ দেখি বউ, কেমন মেয়েটি।"

শান্তি বলিল,

"মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো?"

নিমা। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। "দাদার মেয়ে" অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটি পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল,

"আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

"কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার ত অবসর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয়?" (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

"মেয়েটি দিব্য সুন্দর, নাদুস্ নুদুস্ চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।"

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এত দিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। যে আশায় এত দিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল! যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা করিব। একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই।"

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্ত্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি ব্যাপৃত হইল। মাথার রুক্ষ আগুল্‌ফলম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ব্ববিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তার পর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। ঘরে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল, "হায়! কি করিয়া কি করি।" তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা

পড়িয়া ছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রুগুম্ফ রচিত করিল। কিন্তু পরিতে পারিল না। ভাবিল, "ছি! ছি! ছি! তাও কি হয়। সে দিন কাল কি আছে! তবে বুড়ো বেটাকে জব্দ করিবার জন্য, এ তুলিয়া রাখা ভাল।" এই ভাবিয়া শান্তি সেগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া, কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া, কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত *

"দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"

"সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।"

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।"

"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।"

* রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি এত দিন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী পুনর্ব্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে ব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলা গুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি সোটা বল্লমে কি হইবে? অতএব আমাদিগের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।"

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার রণজয়ের জন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুই জনের উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিলেন, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? গোলা গুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?"

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি? এই আনন্দমঠে?

সত্য। তাও কি হয়? ইহার উপায় আমি বহু দিন হইতে চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান্ প্রতিকূল। আমি দেখিতেছি, তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে?

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া ছিল। সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে?"

সত্য। বিষ পান করিয়া।

জীব। কেন বিষ খাইল?

সত্য। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভব। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্ন কাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি?

সত্য। হাঁ, আর একটি নূতন লোক। পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ। আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথা বার্ত্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটী সোণা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। কেন না, জীবানন্দ লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটি উপদেশ বাকি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দুই জনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার উপর না কি?"

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভব। তাতে দোষ কি, সেটা ত নিষিদ্ধ নহে, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি?

জীব। বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমার কন্যা জীবিত আছে।"

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন?

মহে। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ?

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যত দিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, তত দিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তান-ধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প!

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই

সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি সড়কিওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যে অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম-ধর্ম্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথাসকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর—এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথা আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান্ শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্ব্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে ?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায় মাত্র ?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি দীক্ষিত হইবে ?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত ?"

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তানধর্ম্মের নিয়মসকল পালন করিবে ?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। মাতা পিতা ত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা ভগিনী?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাস দাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন—সম্পদ্—ভোগ?

উভ সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না?

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভ। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভ। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও "বন্দে মাতরম্।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন,

"দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মাব সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব৭ আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকার। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটির বাঁধ,

এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহনির্ম্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুকসকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পিসকল আনাইতেছি। শিল্পিসকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।"

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র, সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, "কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?"

শিষ্য বলিল, "কি প্রকারে বলিব? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয়ত সে ভণ্ডামি, নয়ত আত্ম-প্রতারণা।"

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বিবেচনা করিয়াছ। যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সে অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেন না, তুমি বয়সে অতি নবীন। বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।"

নূতন সন্তান বলিল, "আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।"

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে— অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না। সন্তান-ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন, "ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর, দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চোখের চাহনি কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এত বড় কাজে হাত দিতাম?"

শান্তি পোড়ারমুখী তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারি জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। এক জন আমি।

শান্তি। আর?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি ; তুমি দেবী, না মানবী ?"

শান্তি করজোড়ে বলিল, "আমি সামান্যা মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।"

সত্য। তাই বা কিসে ? তুমি কি বালবিধবা ? না, বালবিধবারও এত বল হয় না ; কেন না, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট ?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী ?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলা হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে ?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল,

"পাপাচরণ কি প্রভু ? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ ? সন্তান-ধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন,

"তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা — পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি ?"

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন ? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন ? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা করুন দেখি। ভীমের যত বল, ততগুলি পত্নী। কত বলিব ? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে ?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে ?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল ? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত ?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যে বিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণী জাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামিসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিলেন, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?"

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে?

শান্তি। তার পর?

সত্য। "মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুন আছে, সন্তানসম্প্রদায় কেন দাহ করিবে?" এই বলিয়া, পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল, "র বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুন! আমি পোড়াকপালি, না তোর মা পোড়াকপালি?"

বস্তুত সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বুড়ো বয়সে ছেলে মানুষকে বলা যায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে এক জন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল।

শান্তি বলিল, "ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এ ত দেখা হইল না?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে লোক আছে।"

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চল না।

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কি প্রকারে সপ্ত রথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারিভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কাল ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না। কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার ঘর?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে? কৈ, কেউ ত এখানে নেই।

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটি সকলের ভাল।

গোব। তা এ ঘরটা ত হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নিন্।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বললেই হয়, যা করেন তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক, প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র জীবানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, "এ কি এ? শান্তি?"

শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া, জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল,

"শান্তি কে মহাশয়?"

জীবানন্দ অবাক্—শেষ বলিলেন, "শান্তি কে মহাশয়? কেন, তুমি শান্তি নও?"

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, "আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।" এই কথা বলিয়া সে আবার পুথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "এ নূতন রঙ্গ বটে। তার পর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক'রে এসেছ?"

শান্তি বলিল, "ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয়। আমিও আপনাকে অসম্মান করিয়া কথা কহিতেছি না,—তবে আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করিতেছেন?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "এক্ষণে বিনীতভাবে ভৃত্যের নিবেদন, কি জন্য ভরুইপুর হইতে, এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।"

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখিতেছি না। ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া, আজ দীক্ষিত হইয়াছি।"

জী। আ সর্ব্বনাশ! সত্য না কি?

শা। সর্ব্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত।

জী। তুমি যে স্ত্রীলোক!

শা। সে কি? এমন কথা কোথা পাইলেন?

জী। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয়।

শা। ব্রাহ্মণী? আছে না কি?

জী। ছিল ত জানি।

শা। আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ আবার যোড়হাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, “আজ্ঞা হাঁ মহাশয়!”

শা। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার কর্ত্তব্য কি বলুন দেখি?

জী। আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্ব্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান।

শা। এ আপনার দুষ্টবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জু ভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে, পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্ত্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমীদারের খাজনা দিতে

পারে না ; জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদারসম্প্রদায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায়, কাড়িয়া খায়। চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এদিকে সন্তানসম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি এক দিকে এক ঘর মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ, আর এক দিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।"

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই, বিষ্ণুপূজা করবি? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া, মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমানরাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখন কখন প্রাণ বধ করে, যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুঠিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ, শস্ত্রযুক্ত এবং মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানের দলকে যবনসৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর এক দল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। এই সময়ে প্রথিতনামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের

প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। এক দিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন, তথাস্তু। কিন্তু সে দিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসও বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক এক জন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমীদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া, কোম্পানির সুশিক্ষিত সদস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া, সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানির সৈনিকেরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্ত্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে

এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলা চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দী, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরদ্রব্য-পহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ. আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগ্‌দীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন্ টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটা গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে, আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস, দ্বিতীয় ব্লেনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া, গোঁপ দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রীপুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী পুত্র লইয়া আসিব।" ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মাটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্য পক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান্ বাবুর্চীটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভবানন্দ মনে মনে গর গর করিতেছে; ভাবিতেছে, কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটি কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কি প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজেরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন, এ অসুরের বংশ এক দিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া দ্রৌপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। এক দিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস সাহেব

অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ-জাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহু দূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবও সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন, "তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত ফুল্লকুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "টুমি কে?"

সন্ন্যাসী বলিল, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন, "টুমি rebel।"

সন্ন্যাসী। সে কি?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলি কড়িয়া মাড়িব।

সন্ন্যাসী। মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণচর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। এক টানে জটা খুলিয়া ফেলিল; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাহেব। টুমি কে?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। যাঁহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। টুমি হামারা গোড়ে* ঠাকিব?

শান্তি। কি? তোমার উপপত্নীস্বরূপ?

সাহেব। ইষ্ট্রির মট ঠাকিটে পাড়, লেগেন সাদি হইব না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে; আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাক্‌বে? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।

সাহেব। টুমি বড় spirited woman আছে, টোমাড় courageএ হামি খুসি আছে। টুমি আমার গোড়ে চল। টোমাড় স্বামী যুড্ডে মড়িয়া যাইব। টখন তোমাড় কি হইব?

শান্তি। তবে তোমার আমার একটা কথা থাক। যুদ্ধ ত দু দিন চারি দিনে হইবেই। যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিতি, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত?

সাহেব। কলা খাইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে?

শান্তি। নে, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে,---

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

হরে মরারে। হরে মরারে।

আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিক্কণে বাজিল তাই ;—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

তাহার সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতাসকল কাঁপাইয়া তুলিল। শান্তি গাইতে গাইতে চলিল,—

"এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাস্‌ল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !"

সারঙ্গেও ঐ বাজিতেছিল,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে, বাহির হইতে একেবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখানে সেই শাখাপল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে। ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাটের মেজে, তার উপর মাটি ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি ?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, "নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে ?"

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "দেখ শান্তি! এক দিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন—"

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জন একত্র সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?"

জীবানন্দ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, "শিখাইলে ত!"

শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, "আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল 'বন্দে মাতরম'।" তখন দুই জনে গলা মিলাইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকা-শ্রেণী; সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশের একটি দোতালা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটি ঘরে যেখানে অর্দ্ধবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেইখানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা,

কালো কোলো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্ ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্ গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানা প্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

"ঠাক্রুণ দিদি, প্রাতঃপ্রণাম!"

ঠাকরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না; কেন না, সক্ড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল — হায়! তাহাতে পূজার সময় একটি বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না; কেন না, ঠাকরুণটি একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আব্রু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল, আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরমব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে, গোঁসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?"

ভব। তুমি ঠান্দিদি যে!

গৌরী। আদব ক'রে বল বলিয়া। তোমরা হলে গোঁসাই মানুষ, দেবতা। তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক। তা করিলেও করিতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষা গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, "সে কি ঠান্দিদি! রসের মানুষ দেখে ঠান্দিদি বলি। নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে, মনে নাই? আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকম আছে জান, আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করে ফেলি। সেই কথাটাই বল্‌তে এসেছি।"

গৌরী। সে কি কথা, ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! আমরা হলেম বিধবা।

ভব। তবে সাঙ্গা হবে না?

গৌরী। তা ভাই, যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়েমানুষ, কি বুঝি? তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতিকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, "সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে?"

গৌরী বিষণ্ণ হইল। মনে মনে সন্দেহ করিল, সাঙ্গার কথাটা তবে বুঝি তামাসা। বলিল, "আছে আর কেমন, যেমন থাকে।"

ভবা। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি একবার সাক্ষাৎ করিব।

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটি ঘরে ছেঁড়া মাতুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকাশ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণী-তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্বমত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু, পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় ঢল ঢল, বাহু তেমনি বনলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য। ইহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইহার চারি পার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নবনারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্রগুলির নীচে লেখা আছে, "চিত্র না বিচিত্র?" সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণি, শারীরিক মঙ্গল ত?"

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ। তোমার মৃত দেহে আমি জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে?

ভব। জীবন কি বিষ?

ক। না হলে অমৃত ঢালিয়া আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন?

ভব। সে অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময়।"

ভব। সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি— তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

ক। না।

ভব। অভিধান?

ক। ভাল লাগে না।

ভব। বিদ্যা অর্জ্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। এখন এ অশ্রদ্ধা কেন?

ক। আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখাপড়া না করাই ভাল। আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু?'

ভব। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি ত তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণি?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায়? তিনি কেমন আছেন?

ভব। ভাল আছেন।

ক। কোথায় আছেন? পদচিহ্নে?

ভব। সেইখানেই আছেন।

ক। কি কাজ করিতেছেন?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্রনির্ম্মাণ। তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভব। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। আমি বিষকণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্ম্মকণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে কেন?

ভব। ভাল, যা দিয়াছি, তা না হয় আমারই আছে। কল্যাণি! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন এত করিবেন?

ভব। করিব কল্যাণি। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কি ঠাকুর?

ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁরই হইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না?

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কিছু বলেন না?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি?

ক। কি বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তানধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতল জলে।

ক। এই মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য এ সব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ; সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে-দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণি দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়-পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল, "দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?"

কল্যাণী বলিল, "রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।"

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে যাও?"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক।"

ভব। বন্দে।

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "মাতরম্।"

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

অগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে?

ধীর। আপনারই সন্ধানে।

ভব। কেন?

ধীর। একটা কথা বলিতে।

ভব। কি কথা?

ধীর। নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভব। এইখানেই বল না, এ অতি নির্জ্জন স্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন?

ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে?

ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে নাকি?

ধীর। সেখানে একটি পরমসুন্দরী যুবতী বাস করে?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, "এ সকল কি কথা?"

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

ভব। তার পর?

ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভব। (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে? দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয় জন এ কথা জানে?

ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি?

ধীর। পার।

ভব। আইস, তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর। অস্ত্র আছে?

ধীর। আছে—শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা কয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম, তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল হয় না?

ভব। ক্ষতি কি—বল না।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম ;—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—

ভব। কল্যাণী, তাও জান ?

ধীর। বিবাহ কর না কেন ?

ভব। তাহার যে স্বামী আছে।

ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীর। সন্তান-ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য—তোমার যে প্রাণ যায়। ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল! (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল।)

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবারি বসাইও না—বলিতেছি। এই সন্তানধর্ম্মে আমার হাড় জর জর হইয়াছে, আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে। ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন, আমায় কেন ?

ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তানসেনা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধ জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তান-ধর্ম্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। বলিলেন, "ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাস-ঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভবানন্দ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন না। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্ম-কণ্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা দুর্ভেদ্য বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন-শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথীজলতরঙ্গ-সমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়-স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে,—দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্ম্মত্যাগী? ছি! মরিব!" এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ও কি

শব্দ? কাণে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না—কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মরিতে বলিল! পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের ত মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে নিরত কর। ধর্ম্মে,—হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে!"

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল, "ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। "এ কি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ। মহারাজ, কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।"

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিলেন—কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল—"হরে মুরারে! হরে মুরারে!" চিনিলেন—সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন;—

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

গোস্বামিবিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবীকণ্ঠনিঃসৃত হইয়া, রাগ-তাল-লয়-সম্পূর্ণ হইয়া, সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসন্তানিলতাড়িত তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন;—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর মেঘগর্জ্জনবৎ তানে গায়িল ;—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল ; বলিল, "প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে।" বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গাইল,—

"তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "মা, তোমার কুশলই হইবে।"

শান্তি। কিসে ঠাকুর—তোমার ত আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য !

সত্য। তোমারে আমি চিনিতাম না। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এত দিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদম্বিনীবিরাজিত বিদ্যুত্তুল্য ঘোর রোষকটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল; "কি ঠাকুর ! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব। মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি ? আমি ত সঙ্গে সঙ্গে মরিব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি, আমার স্বর্গ নাই ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, "আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা, আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

বিজলী হাসিল। শান্তি বলিল, "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরিবে, বোধ হয় মা, তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্য কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।" তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, "মার, মার, নেড়ে

মার।” কেহ বলিল, “জয় জয়! মহারাজকি জয়।” কেহ গায়িল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে!” কেহ গায়িল, “বন্দে মাতরম্!” কেহ বলে—“ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে, আপনার ধন আপনি খাইব?” দশ সহস্র নরকণ্ঠের কল কল রব, মধুর বায়ুসন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজনমনোরম “বন্দে মাতরম্!” সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয় বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন,

“শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দ্দন, লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর।” তখন সেই সহস্র-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল,—

“জয় জগদীশ হরে!
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।”

সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনর্বায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “হে সন্তানগণ, তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা এক জন বিধর্ম্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?”

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। “এখনই মারিব—কোথায় তারা, দেখাইয়া দিবে চল!” “মার! মার! শত্রু মার!” ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা

বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে—বেলা চারি দণ্ড হইলেই—ও কি ও—"

"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!" অকস্মাৎ চারি দিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তানসম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

"গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" নদীপারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!" সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমরা দেখ, কিসের তোপ।" কয়েক জন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোপ ইংরেজের।" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বারোহী, না পদাতি?"

জীব। দুই আছে।

সত্য। কত?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্য। গোরা আছে?. না কেবল সিপাহী?

জীব। গোরা আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, "তুমি গাছ হইতে নাম।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি বলিলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিল, তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তারা দুই জনেই মনে মনে বুঝিল যে, হয়ত এ জন্মের মত এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, "ভাই! এই সময় গাও 'জয় জগদীশ হরে'!" তখন সেই দশ সহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,

"জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তানসম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক ছিন্নবাহু ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল, "জয় জগদীশ হরে!" গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদী-সৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল; কেবল সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও পদধ্বনি।

তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতামধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর?"

উপর হইতে এক জন বলিল, "এই কাননের অতি নিকট, একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র!"

সত্যানন্দ বলিলেন, "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, "আইস।"

সেই দশ সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান

বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। এক জন জীবানন্দকে বলিল, "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি ?"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিলেন, "কি করিতে বল।"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তা হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভব। আজ আমার মরিবার দিন।

জীব। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই।

জীব। ভবানন্দ! তোমার কি পাপ, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, "মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে, সেই দিন মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি ?"

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তানসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তান-দলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এই সময় গাও বন্দে মাতরম্!" তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তানসেনা তোপের তালে গায়িল, "বন্দে মাতরম।"

দশম পরিচ্ছেদ

সেই দশ সহস্র সন্তান "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণবধ্বংসের প্রয়োজন নাই ; ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বাম পার্শ্বে কেহ নাই, চল, অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বাম দিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী—নূতন বর্ষায় নদী যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা নদীর জলে ডুবাইবে?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে, আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশ সহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে যে, বোধ হয়, একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদায় সন্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কর্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল, তাহা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার "বন্দে মাতরম্" শব্দ উত্থিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? ধানকাটার মত তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বাম ভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের এক জন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ দূর হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি এক দল ফৌজদারী সিপাহী, এক দল পরগণা সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা এক জন সহযোগীকে বলিলেন যে, "আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বাম দিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ যাইতেছেন, দক্ষিণ দিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্ব্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা হইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে।" কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

"অতিদর্পে হতা লঙ্কা।" কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুই শত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া, আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা 'জয় জগদীশ হরে' বল।" তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস —তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ্।" কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীনসহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস

নড়িতে পারিল না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, "ইহাকে বাঁধ।" দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিলেন, "ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও; চল, উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।"

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনাণ্ট ওয়াট্সন্‌কে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াট্সন্ তাহাদিগকে দুই দিক্ হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময় উচ্চৈঃশব্দ হইল, "পুলে যাও, পুলে যাও! ও পারে যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হঠিতে হঠিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল। পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস—তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।" তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ

তাহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, "বল বন্দে মাতরম্।" সকলে গায়িল, "বন্দে মাতরম্।" ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।" সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা এই ব্যূহমুখ রক্ষা করিব—তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।" কুড়ি জন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়ি জন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!—ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।" উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট্ কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই, নেড়ে ভাঙ্গিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন

উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথী-তরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্ব্বতাকার মত্ত হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল, পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরাজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্ম্মীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্ম্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াট্‌সন্ ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার মার।"

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২০।৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয় জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিলেন, "এক জন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ, তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয় জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে তবে ত আমি মরিব!"

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল, "ইংরেজ! আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তার পর এই বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, এক জন আইরিস্‌ম্যান্ কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন

ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে, এ সময় আমাকে রক্ষা করিবে! দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি; আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কেহ আছে?"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ১০।১৫।২০।৫০ জন সন্তান আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে?"

ধীর। "কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল না কি?" এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ এক জন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না!

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখনও বুঝ নাই?—(ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন।)

ভব। না—(এই সময়ে এক জন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস? (ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন) ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।"

ভব। কি প্রকারে?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও। (ভবানন্দ এক জন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন, এমত সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও! বলিও, আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রের আশীর্ব্বাদবাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'ভবানন্দের

কাছে থাকিও, আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে'।"

ভবানন্দ বলিলেন, "সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি!"

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে "বন্দে মাতরম্" গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাদ্য অধিক ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়া নাগরা, ঢাক ঢোল, কাঁসি সানাই, তুরী ভেরী, রামশিঙ্গা দামামা আসিয়া জুটিল। জয়সূচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, "জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্ম্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই, আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি; বিশেষ যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল—মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।" তখন সন্তানদল "বন্দে মাতরম্" বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল। বহু লোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাঁহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া;

অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া "হরে মুরারে" গায়িতে লাগিল! ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচ জনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এত দিন যে জন্য আমরা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবন সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, এক দণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?"

জীবানন্দ বলিলেন, "চলুন, এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।"

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথায়?

জীব। কেন, এই সৈন্য?

ধীর। এই সৈন্য কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। এক জনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রামসকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ন হইলেন, বলিলেন, "যাই হউক, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।"

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী।' এখন দেশের

রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুই জনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্ব্বদা ভয় কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইল; প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন না সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার মুখদর্শন করিবে না। এক্ষণে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।"

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে, তা ত জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।"

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।" এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?"

শান্তি বলিল, "আমার আশ্রমে আসুন।" এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া, মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, "আমি আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন ? কেন ?"[১] যে আসিয়াছিল সে বলিল, "দিন পূর্ণ হইয়াছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হে প্রভু ! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।"

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরম্" কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, "বল বন্দে মাতরম, নহিলে মারিয়া ফেলিব।" কেহ ময়রার দোকান লুঠিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে, "আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?" সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।" গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু।"

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারি দিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠসকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, "আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।" মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা আকবর! এত্না রোজের পর কোরাণসরিফ্ বেবাক্ কি ঝুঁটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে

করতে নারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।" এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল—আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, "জয় জগদীশ্বর! আজি তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও!"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, "কে যায়?" কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল, "আমি স্ত্রীলোক।" পাহারাওয়ালা বলিল, "যাবার হুকুম নাই।" কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল, "বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।" শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল, "যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন্ আজ্‌কা রাত্‌মে বড় আফ্‌ত, কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গির্‌বে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়ে যাবে, সো তো হাম্ কিছু জানে না, আজ্‌কা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।"

কল্যাণী বলিল, "বাবা, আমি ভিখারিণী—আমার এক কড়া কপর্দ্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বয়স আছে, মায়ি বয়স আছে, দুনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হ্যায়! বল্‌কে হামি ডেকেত হতে পারে।" কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ্, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাঁটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা দেখিল, মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের দুঃখে গাঁজায় দম মারিয়া ঝিঁঝিট খাম্বাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক; কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িল। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর

হাতে সে পড়িয়া গেল। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। এক জন গিয়া তাহার অঞ্চল ধরিল, বলিল, "তবে চাঁদ।" সেই সময়ে আর এক জন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, "সে কি, পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী!"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "অয়ি স্মিতবদনে! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ঐ বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিল, বলিল, "ও পোড়া কপাল! আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও ঐ দশা।" শান্তি বলিল, "ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?"

কল্যাণী বলিল, "তুমি কে? তুমি যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ! আমি সব জানি! আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ভয় কি? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চল পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।"

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্য পথে লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন—এবং তাহার বর্ত্তমান বাসস্থানও সর্ব্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়া মধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত উষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিল, "আমরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই—তুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!"

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।"

নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, "তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও ত নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক্ ওদিক্ বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হাঁ মা—কোথায় যাব মা?" নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল। কল্যাণীকে যে রাত্রে আপন কুটীরে আনে, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল যে, নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক, এ কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিল না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

ক। পুরুষ সাজিয়া কতদিন থাকিবে? দেখা হয় না,--কথা কহিতেও পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষে বলিলেন, "তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণি!"

দুই জনে সেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন—অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি গোঁসাই! সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?"

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত?" বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কি?

ন। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "কই, কিসে অবিশ্বাস করিলাম ?"

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন ?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল ; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্ব্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ সকল কথা ত অপরাধীর কথাবার্ত্তার মত নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না, বরং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল—সে কি অপরাধিনী হইতে পারে ? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন, এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল—মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন—কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া, কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে ত জুয়াচুরি ; তুমি স্ত্রীলোক ?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন ?

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন ?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। দেখিয়া, কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না ; বলিল, "ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী শান্তিদেবী।"

মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতকগুলা লুঠেড়াতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অগৌণে সন্তানশাসনার্থে Major Edwardes নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্য সে স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পরদিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারি দিকে "বন্দে মাতরম্" গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়, অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া, সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন

সম্ভাবনা। মেজর এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন, মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্প মাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীরদম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজশিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক্—বল 'বন্দে মাতরম্'।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন দুই জনে কাণে কাণে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে, ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এ পুরুষবেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার সজ্জাসকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকণ রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকালপ্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া, চলিয়া যায়; সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর?" বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। এক জন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্ম্মভেদী কটাক্ষে সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাড় বাড়ী কোঠা বিবি?"

বিবি বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

সাহেব। Well that is Padsin—Padsin is it? হুঁয়া একঠো গর হ্যায়?

বৈষ্ণবী বলিল, "ঘর?—কত ঘর আছে।"

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর!—হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

সাহেব। কেট্টে আড্‌মি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স্। একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা?

সাহেব। মেলামে—টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে?

শান্তি। কাল এসেছি সায়েব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখ্‌বো।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা সাহেব, হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পয়সাটা সিকেটা দাও—উঠে চলে যাই। আব ভাল করে বক্‌শিশ দাও ত না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "পরশু নেহি বিবি!"

শান্তি বলিল, "দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্‌, বিবি কি?"

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌। পরশু নেহি, আজ রাৎকো হাম্‌কো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরষের তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাব—আস্‌বো—ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

এড্‌। ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কয়তা হ্যায়?

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদ্‌রেল।

এড্‌। Great General হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও রূপেয়া বখসিস্‌ দেঙ্গে।

শান্তি। শই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ ঠুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড্‌। ঘোড়ে পর।

শান্তি। ঘোড়ায় চড়্‌তে জান্‌লে আর তোমার তাবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষে করি?

এড্‌। গদ্দী পর লে যায়েগা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা নাই?

এড্‌। ক্যা মুস্কিল, পান্‌শো রূপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্‌লে নামক এক জন যুবা এন্‌সাইনকে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ড্‌লে, তুমি যাবে?" লিণ্ড্‌লে শান্তির রূপযৌবন দেখিয়া বলিল, "আহ্লাদপূর্ব্বক।"

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ড্‌লেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, "ছি, এত লোকের মাঝখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই। আগে চল ছাউনি ছাড়াই।"

লিণ্ড্‌লে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া; শান্তি লিণ্ড্‌লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ড্‌লে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়্‌সওয়ার।"

শান্তি বলিল, "আমরা এমন পাকা ঘোড়্‌সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ড্‌লে রেকাব হইতে পা লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া, ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিণ্ড্‌লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া, মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেল্লায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।" তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার লোক ছিল। শীঘ্র তাহার নিকটে খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ড্‌লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ বলিলেন, "An imp of Satan! Strike the tents."

তখন ঠক্ ঠক্ খটাখট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মাল গাড়ীতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু মুসলমান মাদরাজী গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্‌মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ী ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিল, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবিরসংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছতলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে। ক্ষুধা যেটুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।" তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপব উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূব উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়।" নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?"

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল এই জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ পর্ব্বতশিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।" সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন "হরে মুরারে" উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উচু হইয়া উঠিল; এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্ব্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। এক জন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, একি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়াব মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোয়া উড়াইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ কবিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠ্‌বে, তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন,

"চেন তোমরা ! আমি জীবানন্দ গোস্বামী । সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি ।"

তুমুল নিনাদে কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা ! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী ।"

জীব। বল "হরে মুরারে ।"

কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "হরে মুরারে !"

জীব। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, "বন্দে মাতরম্ ।"

তখন কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, "বন্দে মাতরম্ ।" ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত আহত হইয়া, অশ্ব অস্ত্র সহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম্ গুম্, দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাষার কর্ত্তনীসম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য "হুর্‌রে ! হুর্‌রে !" শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্ব্বতবিমুক্ত বিশালতটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দ্দমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয় ব্রিটিশসেনা, পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস এইখানে মরি ।"

মহেন্দ্র বলিলেন, “মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।”

জীব। “আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।” তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, “কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।”

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, “অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।”

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন,

“কেহ আসিবে না? তবে আমি একা চলিলাম।”

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভাই! নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।”

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। বাম হস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে “হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে!” যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি “হরে মুরারে! হরে মুরারে!” গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।”

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্ত্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, “জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।”

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহ প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য “মার মার” শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজ-সেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন,

"সন্তানগণ! ঐ দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভনিসূদন কংশকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।"

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ললিততালধ্বনিসম্বলিত অস্ত্রের ঝঞ্চনায় সর্ব্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতিঘাত-প্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল, সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে, সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি!—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্ গুম্—সর্ব্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুর্‌রে বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে "মা!" কেহ ডাকিতেছে "বাপ!" কেহ চায় জল, কাহারও কামনা

মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্র জড়াজড়ি; জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। কোথায়, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে; সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটি দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায় যে, যাকে খুঁজিতেছি, সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, "উঠ মা! কাঁদিও না।" শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূর্ব্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজূটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।"

শান্তি, শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। সেই পুরুষ বলিলেন, "বুকে হাত দিয়া দেখ।"

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই; সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, "নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?"

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

সেই পুরুষ বলিলেন, "আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?" শান্তি আঙ্গুল দিয়া দেখিয়া বলিল, "বুঝিতে পারিতেছি না।" শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে! নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে! মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া, রক্তসকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতা পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন। তার পর, বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া

রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব?"

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে, "জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।"

জী। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ?

জী। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্ম্মে—সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুই জনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থ-দর্শন করিয়া বেড়াই।

জী। তার পর?

শা। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া, দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুই জনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, তত দিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত

হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।”

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, “শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।”

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

ভ্রম-সংশোধন :—৪ ও ১১৮ পৃষ্ঠায় Edwardes স্থলে Edwards পড়িতে হইবে।

APPENDIX I.

HISTORY OF THE SANNYASI REBELLION.

From Warren Hastings' Letters in Gleig's Memoirs.

You will hear of great disturbances committed by the Sinassies, or wandering Fackeers, who annually infest the province about this time of the year, in pilgrimages to Jaggernaut, going in bodies of 1,000, and sometimes even 10,000 men. An officer of reputation (Captain Thomas) lost his life in an unequal attack upon a party of these banditti, about 3,000 of them, near Rungpore, with a small party of Pergana sepoys, which has made them more talked of than they deserve. The revenue, however, has felt the effects of their ravages in the northern districts. The new establishment of sepoys which is now forming on the plan enjoined by the Court of Directors, and the distribution of them ordered for the internal protection of the provinces, will, I hope, effectually secure them hereafter from these incursions.—*Hastings to Sir George Colebrooke—dated 2nd February 1773.*—Gleig's *Memoirs*, Vol. I. 282.

Our own provinces have worn something of a warlike appearance this year, having been infested by a band of Senassies, who have defeated two small parties of Purgunnah sepoys (a rascally corps), and cut off the two officers who commanded them. One was Captain Thomas, whom you know. Four battalions of the brigade sepoys are now in pursuit of them, but they w. not stand an engagement, and have neither camp equipage, nor even clothes, to retard their flight. Yet I hope we shall yet make an example of some of them. as they are shut in by the rivers, which they cannot pass when closely pursued.

The history of this people is curious They inhabit, or rather possess, the country lying south of the hills of Tibbet from Caubul to China. They go mostly naked. They have neither towns, houses, nor families, but rove continually from place to place, recruiting their numbers with the healthiest children they can steal in the countries through which they pass. Thus they are the stoutest and most active men in India. Many are merchants. They are all pilgrims, and held by all castes of Gentoos in great veneration. This infatuation prevents our obtaining any intelligence of their motions, or aid from the country against them, notwithstanding very rigid orders which have been published for these purposes, insomuch that they often appear in the heart of the province as if they dropped from heaven. They are hardy, bold, and enthusiastic to a degree surpassing credit. Such are the Senassies, the gipsies of Hindostan.

We have dissolved all the Purgunnah sepoys, and fixed stations of the brigade sepoys on our frontiers, which are to be employed only in the defence of the provinces, and to be relieved every three months. This, I hope, will secure the peace of the country against future irruptions, and as they are no longer to be employed in the collections, the people will be freed from the oppressions of our own plunderers. —*Hastings to Josias Dupre.—9th March 1773.*

We have lately been much troubled here with herds of desperate adventurers called Senassies, who have over-run the province in great numbers, and committed great depredations. The particulars of these disturbances, and of our endeavours to repel them, you will find in our general letters and consultations, which will acquit the government of any degree of blame from such a calamity. At this time we have five battalions of sepoys in pursuit of them, and I have still hopes of exacting ample vengeance for the mischief they have done us, as they have no advantage over us, but in the speed with which they fly from us. A minute relation of these adventurers cannot amuse you, nor indeed are they of great moment; for which reason give me leave to drop this subject and lead you to one in which you cannot but be more interested, &c.—*Hastings to Purling—dated 31st March 1773*, para ,4.—Gleig's *Memoirs of Hastings*.—Vol. I. 294.

In my last I mentioned that we had every reason to suppose the Senassie Fakiers had entirely evacuated the Company's possessions. Such were the advices I then received, and their usual progress made this highly probable; but it seems they were either disappointed in crossing the Burramputrah river, or they changed their intention, and returned in several bands of about 2000 or 3000 each; appearing unexpectedly in different parts of the Rungpoor and Dinagepoor provinces. For in spite of the strictest orders issued and the severest penalties threatened to the inhabitants, in case they fail in giving intelligence of the approach of the Senassies, they are so infatuated by superstition, as to be backward in giving the information, so that the banditti are sometimes advanced into the very heart of our provinces, before we know anything of their motions; as if they dropt from heaven to punish the inhabitants for their folly. One of these parties falling in with a small detachment commanded by Captain Edwards, an engagement ensued, wherein our sepoys gave way, and Captain Edwards lost his life in endeavouring to cross a nullah. This detachment was formed of the very worst of our Purgunnah sepoys, who seem to have behaved very ill. This success elated the Senassies, and I heard of their depredations from every quarter in those districts. Captain Stuwart, with the 19th battalion of sepoys, who was before employed against them, was vigilant in the pursuit, wherever he could hear of them, but to no purpose; they were gone before he could reach the places to which he was directed. I ordered another battalion from Burrampore to march immediately, to

co-operate with Captain Stuwart, but to act separately ; in order to have the better chance of falling in with them. At the same time I ordered another battalion to march from the Dinapoor station, through Tyroot, and by the northern frontier of the Purneah province, following the track which the Senassies usually took, in order to intercept them, in case they marched that way. This battalion, after acting against the Senassies, if occasion offered, was directed to pursue their march to Cooch Bahar, where they are to join Captain Jones, and assist in the reduction of that country.

Several parties of the Senassies having entered into the Purneah province, burning and destroying many villages there, the collector applied to Captain Brooke, who was just arrived at Panity, near Rajahmahl with his new-raised battalion of light infantry. That officer immediately crossed the river, and entered upon measures against the Senassies ; and had very near fallen in with a party of them, just as they were crossing the Cosa river, to escape out of that province ; he arrived on the opposite bank before their rear had entirely crossed ; but too late to do any execution among them.

It is apparent now that the Sennassies are glad to escape as fast as they can out of the Company's possessions ; but I am still in hopes that some of the many detachments now acting against them may fall in with some of their parties, and punish them exemplarily for their audacity.

It is impossible, but that, on account of the various depredations which the Senassies have committed, the revenue must fall short in some of the Company's districts ; as well from real as from pretended losses. The Board of Revenue, aware of this last consideration, have come to the resolution of admitting no pleas for a reduction of revenue, but such as a. attended with circumstances of conviction, and by this means they hope to prevent, as much as in their power, all impositions on the Government, and to render the loss to the Company as inconsiderable as possible. Effectual means will be used, by stationing some small detachments at proper posts on our frontier, to prevent any future incursions from the Senassie Fakiers, or any other roving banditti ; a measure, which only the extraordinary audacity of their last incursions hath manifested to be necessary. This will be effected without employing many troops ; and I hope, that in no future time the revenues shall again suffer from this cause.—*Hastings to Sir George Colebrooke—dated 31st March 1773.*

The. Seniassies threatened us with the same disturbances at the beginning of this year as we experienced from them the last. But by being yearly provided to oppose them, and one or two severe checks which they received in their first attempts, we have kept the country clear of them. A party of horse which we employed in pursuit of them, has chiefly contributed to intimidate these ravagers, who seem to pay little regard to our sepoys, having so much the advantage of them in speed, on which they entirely rely for their safety. It is my intention to proceed more

effectually against them by expelling them from their fixed residences which they have established in the north-eastern quarter of the province, and by making severe examples of the zemindars who have afforded them protection or assistance.—*Hastings to Laurence Sulivan—20th March 1774.*

APPENDIX II.

HISTORY OF THE SANYASI REBELLION

From "The Annals of Rural Bengal."

'A set of lawless banditti,' wrote the Council in 1773, 'known under the name of Sanyasis or Faquirs, have long infested these countries ; and, under pretence of religious pilgrimage, have been accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging, stealing, and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practise.' In the years subsequent to the famine, their ranks were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with, and the cold weather of 1772 brought them down upon the harvest fields of Lower Bengal, burning, plundering, ravaging, 'in bodies of fifty thousand men.' The collectors called out the military ; but after a temporary success our Sepoys 'were at length totally defeated, and Captain Thomas (their leader), with almost the whole party, cut off.' It was not till the close of the winter that the Council could report to the Court of Directors, that a battalion, under an experienced commander, had acted successfully against them ; and a month later we find that even this tardy intimation had been premature. On the 31st March 1773, Warren Hastings plainly acknowledges that the commander who had succeeded Captain Thomas 'unhappily underwent the same fate ;' that four battalions of the army were then actively engaged against the banditti, but that, in spite of the militia levies called from the landholders, their combined operations had been fruitless. The revenue could not be collected, the inhabitants made common cause with the marauders, and the whole rural administration was unhinged. Such incursions were annual episodes in what some have been pleased to represent as the *still life* of Bengal.—Hunter's *Annals of Rural Bengal*, pp. 70-2.

'আনন্দমঠে'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ

'আনন্দমঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা হইলেও প্রথম ও পরবর্ত্তী সংস্করণ-গুলিতে পরিবর্ত্তনের পরিমাণ সামান্য নয়। ঘটনা-সংস্থান ও 'শান্তি'-চরিত্রের পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মত-পরিবর্ত্তনে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধা ছিল না; এ বিষয়ে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে তাঁহার উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

মত পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? মতপরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখনও মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।

'আনন্দমঠ' ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে' সুরু হইয়া ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে সমাপ্ত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে ইহার পাঁচটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১ম—১২৮৯ বঙ্গাব্দ (১৮৮২), ২য়—১২৯০ বঙ্গাব্দ (১৮৮৩), ৩য়—১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৬, এপ্রিল), ৪র্থ—ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রীঃ এবং ৫ম—১৮৯২ খ্রীঃ। আমরা ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি। মূল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন ও পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংক্ষেপ বিবৃতি দিয়াছেন। প্রথম চারি সংস্করণে 'আনন্দমঠে'র ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম, অজয়ের তীরবর্ত্তী কোনও আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশ; কিন্তু আসলে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল উত্তর-বঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় সংস্করণে এই ভুলের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, পরিবর্ত্তন করেন নাই। পঞ্চম সংস্করণে এই পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে বীরভূমের নদী, অরণ্য ও পর্ব্বত এমন ভাবে মিশিয়া ছিল যে, সামান্য কয়েকটা নাম তুলিয়া অথবা বদলাইয়া বীরভূমকে বরেন্দ্রভূম করা সম্ভব হয় নাই; বরেন্দ্রভূমিকে ছাপাইয়া বীরভূমিই ফুটিয়া উঠে। পঞ্চম সংস্করণে 'শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা' হইয়াছে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠভেদ অতি সামান্য। কয়েক স্থলে মাত্র কয়েকটি শব্দ যোগ করা হইয়াছে, কিংবা কোন শব্দের বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে; আমরা সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যে সকল স্থলে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন বা পাঠভেদ হইয়াছে, তাহাই উল্লেখ করা গেল।

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮—২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ পংক্তির "সহরে" স্থলে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ঐ ঐ স্থলে "নগরে" আছে ; এবং ২য় পংক্তির "নগরে" শব্দটি তারকা-চিহ্নিত করিয়া পাদটীকায় বলা হইয়াছে—

নগর বা রাজনগর—সাবেক বীরভূম রাজ্যের রাজধানী।

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮, ২য় পংক্তির "সহরে যাইও।"-র পর ১ম সংস্করণে ছিল—

নগরে মহেন্দ্রের পিতৃস্বসা বাস করেন।

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮, ৮ম পংক্তির গোড়ায় বাদ গিয়াছে—

"যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে"

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮, শেষ পংক্তি "কি হাতিয়ার লইবে?" কথাগুলির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার পাছু পাছু গৃহপ্রবেশ করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কল্যাণী একখানা রূপাবাঁধা ছোরা কোথা হইতে বাহির করিয়া আবার তাহা রাখিল। বলিল, "এ অস্ত্র স্ত্রীজাতির নয়।" এই বলিয়া আর কি খুঁজিতে লাগিল।

মহেন্দ্র বলিল, "আবার কি?"

কল্যাণী বলিল, "কিছু না।" এই বলিয়া

প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৬, ৯ম পংক্তির "গৃহত্যাগ করিয়া"-র পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

মুরশিদাবাদের পথে

প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৬, ১১শ পংক্তির "তাহা জানি।"-র পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

সন্তানের একাজ নহে।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৬, ২৪শ পংক্তির "নগরে" স্থলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে "রাজনগরে" আছে।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৬, শেষ পংক্তির "সিপাহী চলিয়াছে।"-র পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

"রাজনগর, বা নগর" কি তাহা বুঝাইতে হইতেছে।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭, ১ম পংক্তির "বাঙ্গালা প্রদেশ" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭, প্রথম অনুচ্ছেদের পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশ ছিল—

বাঙ্গালার পক্ষে সাধারণ নিয়ম এই। কিন্তু বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। বীরভূম প্রদেশ বীরভূমের রাজার অধীনে। রাজনগর বা নগর—তাহাদেরই রাজধানী। বীরভূমের রাজারা পূর্ব্বে স্বাধীন ছিলেন, সম্প্রতি মুরশিদাবাদের অধীন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বীরভূমে হিন্দুরাই স্বাধীন রাজা ছিলেন। কিন্তু আধুনিক রাজবংশ মুসলমান। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার পূর্ব্বে রাজা আলিনকি খাঁ বাহাদুর সিরাজ উদ্দৌলার সহায়তায় কিছু লম্বাই চৌড়াই করিয়া কলিকাতা লুটিয়া আসিয়াছিলেন। তার পর ক্লাইবের পাদুকাস্পর্শে মুসলমানজন্ম সার্থক করিয়া বেহেস্তে যাত্রা করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন।

প্রথম খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭, ৮ম পংক্তির "অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য।" স্থলে ১ম, ২য় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

বাঙ্গালার অন্যান্য অংশের ন্যায় বীরভূমের কর ইংরেজের প্রাপ্য।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭, ৮ম পংক্তির "কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর।" স্থলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

কিন্তু শাসনের ভার বীরভূমের রাজার উপর।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭, ১০-১১শ পংক্তির "কিন্তু খাজানা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

বীরভূম প্রদেশে এ পর্য্যন্তও কালেক্টার নিযুক্ত হয় নাই। রাজাই ইংরেজের কর আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন।

অতএব বীরভূমের খাজনা কলিকাতায় যায়।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭, ১৬শ পংক্তির "একজন গোরা।" কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

সে কোম্পানীর চাকর নহে। দেশীয় রাজগণের সৈন্যগণমধ্যে তখন অনেক গোরা অধ্যক্ষতা করিত।

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৮, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের গোড়ায় ১ম, ২য় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

পাঠক এইস্থানে দিঙ্‌নিরূপণ করুন।

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২০, ২য় পংক্তির গোড়ায় "আরও এক শালা ঐ।" এই কথা কয়টি প্রথম সংস্করণে ছিল না।

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২০, ১৪শ পংক্তির "চতুষ্কোণ করিবার" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

লাইন ফরম করিবার

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২০, ১৪শ পংক্তির "আজ্ঞা দিলেন।" কথাগুলির পর "ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না।"—অংশটি প্রথম সংস্করণে ছিল না; পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে ইহা যোজিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২১, ১৬শ পংক্তির "জমিদারের ছেলে · কাজের বেলা হনুমান্‌!" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

তুমি কি কাপুরুষ যে যুদ্ধে ভয় পাও?

প্রথম খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২১, শেষ পংক্তির "এরা কি রকম দস্যু?" স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

এরা দস্যু না দেবতা?

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৩, ১৬শ পংক্তির "অবলা কেন মা এত বলে।" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

কে বলে মা তুমি অবলে!

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৪, ২৪শ পংক্তিতে "রাজার?" স্থলে প্রথম সংস্করণে ছিল—

রাজা বেটা কে?

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৪, ২৬শ পংক্তির "যে রাজা রাজ্য···রাজা কি ?" স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

হিন্দুর রাজ্যে আবার মুসলমান রাজা কি ?

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৫, ৫ম পংক্তির "কেবল দুধ ঘির যম।" কথাগুলি ১ম সংস্করণে নাই।

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৫, ১৩-১৪ পংক্তির "মুসলমান রাজা" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "রাজা" আছে।

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৫, ২৩শ পংক্তির "অবলা কেন মা এত বলে।" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

কে বলে মা তুমি অবলে—

প্রথম খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৮, ৬ষ্ঠ পংক্তির "বিষ্ণুর অঙ্কোপরি" স্থলে ১ম, ২য় ও তৃতীয় সংস্করণে আছে—

সর্ব্বোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুল রত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা

প্রথম খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৩১, ১০ম-১১শ পংক্তির "সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল।" এই কথাগুলি ১ম সংস্করণে নাই।

প্রথম খণ্ড—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪০, ৩য়-৬ষ্ঠ পংক্তিতে যে গানটি আছে, তাহা প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিতরূপ ছিল--

ধীরসমীরে, যমুনাতীরে,
বসতি বনে বনমালী।

প্রথম খণ্ড—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪২, ১৬শ পংক্তির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

"কুরু মম বচনং সত্বররচনং"—কি করিতে হইবে ?

প্রথম খণ্ড—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪২, ১৭শ পংক্তিতে "তটিনীতীরে" স্থলে ১ম সংস্করণে "যমুনাতীরে," এবং ১৮শ পংক্তির "বরনারী' স্থলে "বনমালী" ছিল।

প্রথম খণ্ড—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪২, ১৯শ পংক্তির "আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া" স্থলে ১ম সংস্করণে "কেহ" ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫০, ২০শ পংক্তির "জ্ঞানানন্দনামা এক জন অতি তেজস্বী সন্তান" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "ধীরানন্দ" ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫০, ২২শ পংক্তির "জ্ঞানানন্দ" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "ধীরানন্দ" ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫১, ১ম পংক্তির "বাঙ্গালায় নাই।" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "বীরভূমে নাই।" ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পবিচ্ছেদ। পৃ. ৫১, ২য় পংক্তিতে "ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন জানি।" এই কথাগুলি ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নাই।

প্রথম খণ্ড—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫২, ১৭শ পংক্তি ও ২৫শ পংক্তির "জ্ঞানানন্দ" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "ভবানন্দ" আছে।

প্রথম খণ্ড—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫২, ১৯শ পংক্তির এবং পৃ. ৫৩, ৬ষ্ঠ পংক্তির "নদীর জলে" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে যথাক্রমে "অজয়ের জলে" ও "অজয়ে" আছে।

প্রথম খণ্ড—অষ্টাদশ পবিচ্ছেদ। পৃ. ৫৩, ২৫শ পংক্তির "তখন সত্যানন্দ বলিলেন," হইতে পৃ. ৫৪ শেষ—"পলায়ন করিতে লাগিল।"—এই অংশের পরিবর্ত্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

কিন্তু এই সকল কার্য্যে তাহাদের অনেক সময় নষ্ট হইল। ইত্যবসরে নগরের রাজা আসদুলজমান বাহাদুর নগরস্থ সৈন্য সকল সংগ্রহ করিলেন, এবং কামান, গোলা, বন্দুক লইয়া সন্তানসম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইলেন। সন্তানদিগের অস্ত্র কেবল ঢাল তরবারি ও বল্লম। কামান, গোলা, বন্দুক দেখিয়া তাহারা কিছু ভীত হইল। তোপের মুখে অসংখ্য সন্তান মরিতে লাগিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "ফিরিয়া চল, অনর্থক বৈষ্ণববধে প্রয়োজন নাই।" তখন পরাজিত হইয়া সন্তানেরা ম্লানমুখে নগর ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের পর প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে; এবং ইহার পর ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদটি (পৃ. ৫৫-৫৯) যোজিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ.৬০, ২৬শ পংক্তির "আচ্ছাদিত করিল।" —এই কথাগুলির পরে ১ম সংস্করণে ছিল—

কিন্তু কিছুই তো ঢাকিল না। সে হৃদয়ের অপূর্ব্ব গঠন-শোভা বস্ত্রের উপর হইতে সম্পূর্ণ অনুমেয় রহিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬১, ১ম-৪র্থ পংক্তির "কিন্তু পরিতে ·· রাখিল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

চাঁদমুখখানি নবীন দাড়ি গোঁপে শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬১, ৫ম পংক্তি "আবৃত করিল।" কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

যদি কোন কবি সে রূপ দেখিত, তাহা হইলে এই নবীন "কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতী দধানাকে" দেখিয়া এবার মন্মথের বিনাশ দূরে থাকুক, পুনরুজ্জীবনের শঙ্কা করিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬১, ৬ষ্ঠ পংক্তির "নিরীক্ষণ করিল।"-র পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কোথায় নাই নিশ্চিত বুঝিয়া, অতি গোপনে সংরক্ষিত একটি পেটিকা খুলিল। খুলিয়া তাহা হইতে একটি মোট বাহির করিল। মোট খুলিয়া তাহার ভিতর যাহা ছিল তাহা মাটির উপরে সাজাইল। কতকগুলি তুলটের পুথি। ভাবিল "এগুলি কি করি, সঙ্গে লইয়া গিয়া কি হইবে? এত বা বহিব কি প্রকারে? রাখিয়া গিয়াই বা কি হইবে? রাখারই বা আর প্রয়োজন কি—দেখিয়াছি জ্ঞানেতে আর সুখ নাই, এ ভস্মরাশিমাত্র—এ ভস্ম ভস্মই হোক।"—এই বলিয়া শান্তি সেই গ্রন্থগুলি একে একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আর কি কি তাহা এখন বলিতে পারি না, পুড়িয়া ভস্মাবশিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬১, ৮ম পংক্তির "বনদেবীগণ" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "গ্রামবাসিগণ" আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭১, ৬ষ্ঠ পংক্তির "চাহনি"-র পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

এ বুড়োর কাছে

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭১, ২১শ পংক্তির "চারি জন" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "দুই জন" ছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭১, ২৫শ পংক্তির "আর ?" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "দ্বিতীয় ?" আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭১, ২৬শ. পংক্তির "ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।" এই দুইটি নাম ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭২, ৪র্থ পংক্তির "তাই বা কিসে ? তুমি"—এই কথাগুলির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

ভৈরবী নও, বৈষ্ণবী নও, তবে

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৩, ৬ষ্ঠ-৮ম পংক্তির "স্বামী যে ধর্ম্ম…পরীক্ষা করিয়া দেখি।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি আছে—

স্বামীর ধর্ম্মচ্যুতির ভয়ে আমি কাতরা। বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীরুহও শুষ্ক হয়, আমি মহান্ মহীরুহতলে বৃষ্টি করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্য। সে কি ? মহান্ মহীরুহের অনাবৃষ্টির ভয় ? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ?

শান্তি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিতে পারে।

সত্য। কি ঘটিয়াছে ? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে ? হিমালয় গহ্বরে ডুবিয়াছে ?

শান্তি। কেবল সহধর্ম্মিণী-সাহায্যের অভাবে।

সত্য। কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতেছি না।

শান্তি। কাল মধ্যাহ্নে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

এবার সেই পলিতকেশ ব্রহ্মচারী চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে বসিল। সত্যানন্দকে আর কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই।

শান্তি বলিল "প্রভু, আপনার চক্ষে জল কেন ?"

সত্য। প্রায়শ্চিত্ত কি জান ?

শান্তি। জানি, আত্মহত্যা।

সত্য। তাই কাঁদিতেছি। জীবানন্দের শোকে কাঁদিতেছি।

শান্তি। আমিও তাই আসিয়াছি; যাহাতে জীবানন্দ না মরে, সেই জন্য আসিয়াছি।

সত্য। বৎসে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। তুমি সন্তানমধ্যে পরিগণিত হইলে। আমি এতক্ষণ তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই তিরস্কার করিতেছিলাম? আমি কি বুঝিব? বনচারী ব্রহ্মচারী বৈ ত নই। স্ত্রীলোকের তুল্য হইব কি প্রকারে? জীবানন্দ মরিবে, আমিও রাখিতে পারিব না, তুমিও রাখিতে পারিবে না। জীবানন্দ আমার প্রাণাধিক প্রিয়, কিন্তু দেখ দক্ষিণ হস্ত গেলে দেবতার কার্য্য করিতে পারিব না। যত দিন পার, জীবানন্দকে পৃথিবীতে রাখিও। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রহ্মচর্য্যা রাখিও। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য হইলে। সন্তান মাত্রই আমার আনন্দ। এই জন্য সন্তানেরা সকলে আনন্দ নাম ধারণ করে। এ আনন্দমঠ। তুমিও আনন্দ নাম ধারণ কর। তোমার নাম নবীনানন্দই রহিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৩, ১৭শ পংক্তির "বুড়ো বয়সে ছেলে মানুষকে" কথাগুলি ১ম সংস্করণে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৫, ৬ষ্ঠ পংক্তির "প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া" হইতে পৃ. ৭৬-এর শেষ "শয়ন করিলেন।"—এই অংশের পরিবর্ত্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ছিল—

তদুপরি শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ ঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। হরিণ চর্ম্মের উপর একটা মানুষ শুইয়া আছে, ক্ষীণ প্রদীপালোকে অতটা ঠাওর হইল না। জীবানন্দ তাহারই উপর উপবেশন করিতে গেলেন। উপবেশন করিতে গিয়া শান্তির হাঁটুর উপর বসিলেন। হাঁটু অকস্মাৎ উচু হইয়া জীবানন্দকে ফেলিয়া দিল।

জীবানন্দের একটু লাগিল। জীবানন্দ উঠিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে হে তুমি বেল্লিক?"

শান্তি। আমি বেল্লিক না, তুমি বেল্লিক। মানুষের হাঁটুর উপর কি বসবার জায়গা?

জীব। তা কে জানে যে তুমি আমার ঘরে চুরি করিয়া এসে শুইয়া আছ?

শান্তি। তোমার ঘর কিসের?

জীব। কার ঘর?

শান্তি। আমার ঘর।

জীব। মন্দ নয়, কে হে তুমি?

শান্তি। তোমার বোনাই।

জীব। তুমি আমার হও না হও, আমি তোমার বোধ হইতেছে। তোমার গলার সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণীর গলার একটু সাদৃশ্য আছে।

শান্তি। বহুদিন তোমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার একাত্মভাব ছিল, সেই জন্য বোধ হয় গলার আওয়াজ একরকম হয়ে গেছে।

জীব। তোর যে বড় জোর জোর কথা দেখ্‌তে পাই? মঠের ভিতর না হতো তো এক ঘুষোয় দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতুম।

শান্তি। দাঁত ভেঙ্গেছে অনেক সাঙাত। কাল রাজনগরে কটা দাঁত ভেঙ্গেছিলে, হিসাব দাও দেখি। বড়াইয়ে কাজ নেই, আমি এখানে ঘুমুই। তোমরা সন্তানের দল, লেজ গুটিয়ে, বামুনঠাকুরুণদের আঁচলের ভিতর লুকোওগে।

এখন জীবানন্দ ঠাকুর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। মঠের ভিতর সন্তানে সন্তানে মারামারি করা সত্যানন্দের নিষেধ। কিন্তু এরও বড় মুখের দৌড়, দুঘা না দিলেও নয়। রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। অথচ গলার আওয়াজটা মধ্যে মধ্যে বড় মিঠে লাগিতেছে, যেন কি মনে হয়, যেন কে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছে, আর বলিতেছে এলেই ঠ্যাঙে লাঠী মার্‌বো। জীবানন্দের উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না, বসিতেও পারেন না। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন,

"মহাশয় এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগ দখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।"

শান্তি। এ ঘর আমার, অর্দ্ধ দণ্ড ভোগ দখল করিতেছি। আপনি বাহিরে যান।

জীব। মঠের ভিতরে মারামারি করিতে নাই বলিয়াই লাথি মারিয়া তোমায় নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই, কিন্তু এখনি মহারাজের অনুমতি আনিয়া তোমায় তাড়াইয়া দিতে পারি।

শান্তি। আমি মহারাজের অনুমতি আনিয়াই তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি দূর হও।

জীব। তাহা হইলে এ ঘর তোমার। মহারাজকে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি, আগে বল তোমার নাম কি?

শান্তি। আমার নাম নবীনানন্দ গোস্বামী, তোমার নাম কি?

জীব। আমার নাম জীবানন্দ গোস্বামী।

শান্তি। তুমিই জীবানন্দ গোস্বামী! তাই এমন?

জীব। তাই কেমন!

শান্তি। লোকে বলে, আমি কি কর্‌বো।

জীব। লোকে কি বলে?

শান্তি। তা আমার বল্‌তে ভয়ই কি? লোকে বলে জীবানন্দ ঠাকুর বড় গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের সর্ব্ব শরীর রাগে গর গর করিতে লাগিল, বলিলেন, "আর কিছু আছে?'

শান্তি। আছে অনেক কথা—নিমাই ব'লে আপনার একটি ভগিনী আছে।

জীব। তুমি বড় বেল্লিক হে—

শান্তি। তুমি ভল্লুক হে।

জীব। তুমি উল্লুক, অর্ব্বাচীন, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, ভণ্ড, পামর!

শান্তি। তুমি —যলায়বায়াবোচীচঃ—তুমি—স্তু শ্চুভি শ্চ শাং—তুমি ষ্টুভিষ্টুষ্যদাস্তটোঃ।

জীব। বের শালা এখান থেকে—তোর দাড়ি ছিঁড়িব।

শান্তি তখন গণিল প্রমাদ! দাড়ি ধরিলেই মুস্কিল। পরচুলো খসিয়া পড়িবে। শান্তি সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে তৎপর হইল।

জীবানন্দ পিছু পিছু ছুটিল। মনে মনে ইচ্ছা, ভণ্ডটা মঠের বাহিরে গেলে দুই ঘা দিব। শান্তি যাই হউক স্ত্রীলোক—দৌড়ধাপে অনভ্যস্ত। জীবানন্দ এ সকল কাজে সুশিক্ষিত। শীঘ্র গিয়া শান্তিকে ধরিল। এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া প্রহার করিবে বলিয়া তাহাকে কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিতে গেল। স্পর্শ মাত্রেই জীবানন্দ চমকিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শান্তি বাহু দ্বারা জীবানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল।

জীবানন্দ বলিল, "এ কি! তুমি যে স্ত্রীলোক! ছাড়! ছাড়! ছাড়!" কিন্তু শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা দেখ গো! এক জন গোঁসাই জোর করিয়া স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে।"

জীবানন্দ তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে এনো না। ছাড়! ছাড়! আমার ঘাট হয়েছে, ছাড়!"

শান্তি ছাড়ে না, আরও চেঁচায়, শান্তির কাছে জোর করিয়া ছাড়ানও সহজ নয়। জীবানন্দ যোড়-হাত করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ছাড়।" শেষে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে অরণ্য পরিপূরিত হইয়া গেল।

এ দিকে মঠের গোঁসাইরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া, অনেকে ধুন্দুচির ভিতর প্রদীপ জ্বালিয়া লাঠি সোঁটা লইয়া বাহির হইলেন। দেখিয়া জীবানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। শান্তি বলিল, "অত কাঁপিতেছ কেন? তুমি ত বড় ভীত পুরুষ! আবার লোকে তোমাকে বলে মহাবীর?"

গোঁসাইরা আলো লইয়া নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া জীবানন্দ সকাতরে বলিলেন, "আমি অতিশয় কাপুরুষ, তুমি আমায় ছাড়, আমি পলাই।"

শান্তি। জোর করিয়া ছাড়াও না।

জীবানন্দ লজ্জায় স্বীকার করিতে পারিলেন না যে, তিনি স্ত্রীলোকের জোরে পারিতেছেন না। বলিলেন,

"তুমি বড় পাপিষ্ঠা।"

শান্তি তখন মুচকি হাসিয়া, বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিল,

"প্রাণাধিক! আমি তোমার প্রতি অতিশয় আসক্ত। তোমার দাসী হইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, আমায় গ্রহণ করিবে, স্বীকার কর, ছাড়িয়া দিতেছি।"

জীব। দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর হ পাপিষ্ঠা! অমন কথা আমাকে কাণে শুনিতে নাই।

শান্তি। আমি পাপিষ্ঠা, তাতে সন্দেহ নাই; নহিলে স্ত্রীজাতি হইয়া পুরুষের কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইতে যাইব কেন—আমার কথাটি রাখিবে? ছাড়িয়া দিতেছি।

জীব। ছি! ছি! ছি! আমি ব্রহ্মচারী—আমাকে অমন কথা বলিতে নাই—তুমি আমার—

শান্তি সভয়ে বলিল, "চুপ কর! চুপ কর! চুপ কর! আমি শান্তি।"

এই বলিয়া শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। পরে যোড়হাত করিয়া বলিল, "প্রভু! অপরাধ নিও না। কিন্তু ছি! পুরুষমানুষের ভালবাসার ভাণ্ করাকে ধিক্! আমাকে চিনিতেই পারিলে না!"

তখন জীবানন্দের মনে সকল কথা প্রস্ফুট হইল। শান্তি নহিলে এ কার্য্য আর কার? শান্তি নহিলে এ রঙ্গ আর কে জানে? শান্তি নহিলে কার বাহুতে এত বল? তখন আনন্দিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া জীবানন্দ কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু অবকাশ পাইলেন না, গোঁসাইয়েরা আসিয়া পড়িয়াছিল। ধীরানন্দ আগে আগে। ধীরানন্দ এই সময়ে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলমাল কিসের?"

জীবানন্দ ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? শান্তি সেই সময়ে চুপি চুপি তাঁহাকে বলিল,

"কেমন বলিয়া দিই—তুমি আমায় ধরিয়াছিলে?"

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শান্তি, ধীরানন্দের কথার উত্তর দিল—বলিল,

"গোলমাল—একটা স্ত্রীলোকে চেঁচাইতেছিল। 'আমার সতীত্ব নষ্ট করিল! আমার সতীত্ব নষ্ট করিল' বলিয়া চেঁচাইতেছিল। কিন্তু কই? জীবানন্দ ঠাকুর এত খুঁজিলেন, আমি এত খুঁজিলাম, দেখিতে পাইলাম না। এই বনটার ভিতর আপনারা একবার দেখুন দেখি—ওদিকে শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

গোঁসাইদিগকে শান্তি অরণ্যের নিবিড় অংশ দেখাইয়া দিল। জীবানন্দ শান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন

"বৈষ্ণবদিগকে এত দুঃখ দিয়া তোমার কি ফল? ও বনে গেলে কি ওরা ফিরিবে? সাপেই থাক্, কি বাঘেই থাক্।"

শান্তি। যখন বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের নাম শুনেছে, তখন একটু কষ্ট না পেলে ফিরিবে না। তা না হয় ফিরাইতেছি।

এই বলিয়া শান্তি গোসাইজিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি ভৌতিক মায়াও হইতে পারে।"

শুনিয়া একজন গোসাই বলিল, "তাই সম্ভব। নহিলে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবে?"

গোসাইয়েরা সকলেই এই মতে মত দিল। ভৌতিক মায়া স্থির করিয়া সকলেই মঠে ফিরিল। জীবানন্দ বলিল, "এসো, আমরা এইখানে বসি—এ ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইয়া বল—তুমি এখানে কেন—কি প্রকারে আসিলে—এ বেশই বা কেন? এত রঙ্গই বা কোথায় শিখিলে?" শান্তি বলিল, "আমি কেন আসিলাম?—তোমার জন্য আসিয়াছি। কি প্রকারে আসিলাম?—হাঁটিয়া। এ বেশ কেন?

আমার শক। আর এত রঙ্গ শিখিলাম কোথায় ? একটি পুরুষমানুষের কাছে। সব তোমায় ভাঙ্গিয়া বলিব। কিন্তু এখানে বনে বসিব কেন ? চল তোমার কুঞ্জে যাই।"

জীব। আমার কুঞ্জ কোথায় ?

শান্তি। মঠে।

জীব। সেখানে স্ত্রীলোক যাইতে আসিতে নিষেধ।

শান্তি। আমি কি স্ত্রীলোক ?

জীব। আমি মহারাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

শান্তি। আমার প্রতি মহারাজের অনুমতি আছে। কুঞ্জেই চল, সব বলিতেছি। বিশেষ ঘরের ভিতর না গেলে আমার দাড়ি খুলিব না। দাড়ি না খুলিলে তুমি এ পোড়ার মুখ চিনিতে পারিবে না। ছি! পুরুষ এমন!

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৮, ২২শ পংক্তির "স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন"-এর পরিবর্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

তখন নগরের মহারাজাধিরাজের চৈতন্য হইল।

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৮, ২৮শ পংক্তির "বলিতে বলিতে চলিয়া যায়।" কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

রাজা আসদ-উলজমান বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। অনেকগুলি গোলা, কামান, হাতী, ঘোড়া পাঠাইলেন, কিছুতেই সন্তানদিগের "জয় জগদীশ হরে" শব্দের নিবারণ নাই। আসদ-উলজমান দেখিলেন যে রাজ্যচ্যুত হই।

তখন তিনি কাতরে ইংরেজকে চিঠি লিখিলেন। লিখিলেন যে, কোন মতে আমি আর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারি না বা পাঠাইতে পারি না; আপনারা রক্ষা করেন তবেই খাজনা আদায় করিব, নচেৎ আপনারা আসিয়া আদায় করুন। ইংরেজেরা পূর্ব্ব হইতে নিজে কতক কতক খাজনা আদায় করিতেছিলেন কিন্তু এখন তাঁহাদিগেরও যত্ন বিফল হইতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৯, ১০ম পংক্তির "বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

বিদ্রোহ নিবারণ জন্য বীরভূম প্রদেশে প্রেরণ করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৯, ২০শ পংক্তির "হইয়া গেল।" কথাগুলির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে নিম্নলিখিত পংক্তিটি ছিল—

এইরূপে ১১৮০ সাল বীরভূমে সন্তান নাম কীর্ত্তিত করিতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮০, ২৫ পংক্তির "দ্রৌপদীর" স্থলে প্রথম সংস্করণে "সাঁওতাল-কুমারীদিগের" এবং "মনোযোগ দিলেন।" কথাগুলির পর ছিল—

তখনকার ভারতীয় ইংরেজেরা এখনকার ইংরেজদিগের ন্যায় পবিত্রচরিত্র ছিলেন না।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮১, ১১শ পংক্তির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে এই কথাগুলি ছিল—

বাঘ কি? -বাঘ তো নয়,

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮১-৮২, টমাসের সহিত শান্তির কথোপকথনে প্রথম সংস্করণে টমাসের মুখ দিয়া "টুমি, টোমায়" প্রভৃতি সাহেবী ঢঙে বাংলা উচ্চারিত হয় নাই।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮১, ১৭শ পংক্তি "টুমি rebol।" স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

তুমি বিদ্রোহী।

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৪, ১২-১৪শ পংক্তির "কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন?...প্রায়শ্চিত্ত কেন?"—এই অংশ প্রথম তিনটি সংস্করণে নাই।

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৪, ১৬শ পংক্তির "শিখাইলে ত!"-র পর প্রথম তিনটি সংস্করণে আছে—

আমিও শিখিলাম। তুমিই স্ত্রীকুলে ধন্যা।

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৪, ২০শ পংক্তির "গায়িল।" কথাটির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে ছিল—

গাইতে গাইতে দুই জনেই কাঁদিয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৭, ১৭শ পংক্তির "না"' স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

সকলি শেষ হইযাছে। কেবল স্ত্রীর শেষ হয় নাই।

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৭, ১৯-২১শ পংক্তির স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে ছিল—

ক। স্বর্গ বর্গ বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন?
ভব। যাহা আপনি বুঝি না, তাহা বুঝাইতে পারি না। সাহিত্য পূর্ব্বমত পড়া হইতেছে?
ক। পূর্ব্বাপর বুঝি না। কুমারসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া হিতোপদেশ পড়িতেছি।
ভব। কেন কল্যাণি?
কল্যাণী। কুমারে দেবচরিত্র, হিতোপদেশে পশুচরিত্র।

ভব। দেবচরিত্র ছাড়িয়া, পশুচরিত্রে এ অনুরাগ কেন ?

ক। চিত্ত বশ নহে বলিয়া। [এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ২য়-৩য় সংস্করণে কেবলমাত্র "বিধিলিপি।" আছে]

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৮, ১২শ পংক্তি "ধর্ম্মে কণ্টক।" কথাগুলির পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

কণ্টকেনৈব কণ্টকং।

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৮, ২৮শ পংক্তি "তবে তাঁরই হইব।" স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

তবে তাঁর পায়ে লুটাইব।

তৃতীয় খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৩, ১-৫ম পংক্তির "বলিলেন ··হইলেন না।"—এই অংশের পরিবর্ত্তে প্রথম সংস্করণে ছিল—

ধীবানন্দও সরিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৩, ২৩-২৫শ পংক্তির "গজের মত···ছি! মরিব!" স্থলে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

গজদেহ স্থাপন করিয়া কি করিব? ইহা আমাকে করিতে হইয়াছে, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। আপনাব ওজন আপনি না বুঝিয়া মানদণ্ডে আমি তুলিত হইতে উঠিয়াছিলাম। যে লোভী, যে পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয় পরবশ, যে অধর্ম্মী তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তাহার আবাব সত্য কি? পাপে আমাব ভয় কি? অনন্ত নরক আমাব কপালে নিশ্চিত। ইহজীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এই ইহজীবন ধ্বংসে আমাব ভয় কি? অতএব যাহাই কপালে ঘটুক, আমি এ দুষ্কর্ম্ম করিব। এদিকেও প্রাণ যায়, সে দিকেও প্রাণ যাইবে। যে বিপদ দূরবর্ত্তী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে বিপদ নিকটবর্ত্তী তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধাব কবিতে হয়। আমি ধীরানন্দের পরামর্শ শুনিব।—না! ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, এ জীবন হয়তো এই মুহূর্ত্তেই সর্পদংশনে শেষ হইতে পারে, কিন্তু জন্মান্তরের তো শেষ নাই। এ জীবনে আমি যদি সুখী হই, সে দুই দিনের জন্য, পরলোকে যদি আমি দুঃখী হই, সে অনন্তকালের জন্য।"

তৃতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৫, ১০ম পংক্তির পরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে নিম্নোদ্ধৃত অংশ ছিল—

শান্তি গলা চিনিল, বলিল, "রহ্ পোড়াকপালীর ছেলে! বুড়ো বয়সে তুমি মেয়েমানুষেব সঙ্গে গায়িতে এসো।" এই বলিয়া শান্তি সারঙ্গের তারগুলি আর একটু চড়াইয়া লইয়া, কণ্ঠ আর একটু উচুতে তুলিয়া দিয়া, গায়িল,—

বেদামুদ্ধরতে জগন্তি বহতে,
ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে
ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে
কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।

বলিতে বলিতে সে দীর্ঘ তাল সেই উচ্চৈরব সে গগনবিদারক তান ছাড়িয়া দিয়া শান্তি গায়িল,—

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল
ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল
জয় জয় দেব হরে।"

বাহির হইতে যে সঙ্গে গায়িতেছিল সে [আর সহ্য করিতে পারিল না। শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত কান্তি, শ্বেত বসন, শ্বেত পুষ্পাভরণ লইয়া আসিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল,—বলিল, "মা গাও, তোমা হইতে সনাতন ধর্ম্ম উদ্ধার হইবে, গাও" বলিয়া—কেবলমাত্র ১ম সংস্করণে এই অংশটুকু আছে।] আপনি গাইল,

দিনমণিমণ্ডন, ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস—

তৃতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৫, ১৭শ পংক্তির "চিনিতাম না।" কথাগুলির পর প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটুকু ছিল—

চিনিলে আমি বলিতাম হে জীবানন্দ! আমার নিকট শপথ কর যে তুমি পত্নীসহবাস ত্যাগ করিবে না। মা আমার এক ভিক্ষা আছে, তুমি স্ত্রীবেশ আর গ্রহণ করিও না। সন্তানবেশ গ্রহণ করিয়া অসি চর্ম্ম বল্লম গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তানসেনা মধ্যে প্রবেশ কর।

শান্তি। প্রভো এ আজ্ঞা আমায় কেন করেন? আপনার আজ্ঞায় শিবের শত্রু জয় করিয়াছি, বিষ্ণুর শত্রুও জয় করিতে হইবে? বলিয়া শান্তি গায়িল,

"মধু মুর নরক বিনাশন
গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান
অমল কমলদললোচন
ভব মোচন ত্রিভুবন ভবনিধান
জয় জয় দেব হরে।"

বাবা! আপনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন কেন, দেখিতেছেন না কি কাণ্ড হইতেছে?

সত্য। কি কাণ্ড হইতেছে?

শান্তি। আপনি কি জানেন না?

সত্য। সকল জানি না।

শান্তি। তবে আমি কাল বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে—আমার স্বামীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ আমি। মৃত্যুদণ্ড তাঁহার কপালে বিধান। তিনি ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। সুতরাং আমাকেও মরিতে হইবে। কিন্তু আপনার কার্য্য উদ্ধার হইবে কি? কে কার্য্যোদ্ধার করিবে?

তৃতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৬, ৭ম পংক্তি "মা," কথাটির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

মনের কথা সকল তোমায় বলি, জীবানন্দ বল, ভবানন্দ বল, মহানন্দ বল, যে কেহ বল, আমার মনের কথা বুঝিবার যোগ্য তুমি ভিন্ন কেহ নহে।

তৃতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৬, ১৯শ পংক্তি "নদীতীরে" এবং ২০শ পংক্তি "নদীসৈকতপার্শ্বে" স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে যথাক্রমে "অজয়তীরে" ও "অজয়সৈকত-পার্শ্বে" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৭, ২৮শ পংক্তির "শত্রুদের" ও "তাহাদের" স্থলে ১ম সংস্করণে "ইংরেজের" আছে।

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৮, ৯ম পংক্তি "নদীর" এবং ১০ম পংক্তি "নদীপারে" স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে যথাক্রমে "অজয়ের" ও "অজয়পারে" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৯, ১০-১১শ পংক্তির পাঠ ১ম সংস্করণে এইরূপ ছিল—

"জয় জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়তি করবালা—"

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৯, ১৯শ পংক্তিতে "কৃপা করিবেন"-এর পর ১ম সংস্করণে ছিল—

এই সময় তোমরা তাঁহার কার্য্য কর

তৃতীয় খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদে যে যে স্থলে "নদী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে "অজয়" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৩, ৯ম পংক্তির "অবশিষ্ট সেনা" হইতে ১১শ পংক্তির "রক্ষা নাই।" পর্য্যন্ত অংশটির পরিবর্ত্তে ১ম সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশটি ছিল—

তাহারা যখন আম্রকাননে প্রবেশ করে, তখন গাছের উপর হইতে এক জন বলিল, "গাছে উঠ! গাছে উঠ! নহিলে বনের ভিতর ঢুকিয়া ইংরেজ তোমাদিগকে মারিবে।" ত্রস্ত সন্তানেরা গাছের উপর উঠিল।

গাছের উপর হইতে নবীনানন্দ গোস্বামী কথা কহিতেছিলেন। সকলে গাছে উঠিলে, নবীনানন্দ বলিলেন, "বন্দুক তৈয়ারি রাখ—এখান হইতে আমরা নিরাপদে শত্রুসংহার করিব।" সকলে বন্দুক তৈয়ার রাখিল।

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদের (পৃ. ১০৩) গোড়ায় প্রথম সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশটি ছিল—

লেপ্টনাণ্ট ওয়াটসন দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলিলেন। দুর্ব্বুদ্ধিই বা কি, জীবানন্দের দক্ষিণে কাপ্তেন হে যাইতেছে দেখিয়া ওয়াটসন মনে করিলেন যে, আমি ঠিক বামে গিয়া ঘেরিব, এই ভাবিয়া আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলিলেন। তখন অকস্মাৎ হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দে গাছের উপর হইতে তাঁহার সৈন্যপৃষ্ঠে বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। লেপ্টনাণ্ট ওয়াটসন তখন উপরে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন "আকাশ হইতে গুলি পড়ে না কি!" নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে একজন বলিল, "না সাহেব, আমরা গাছ থেকেই মারিতেছি, এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছের উপর দুই চারিটা গুলি চালাও না।"

আর এক জন বলিল, "সাহেব, ঐখানে একটু দাঁড়াইয়া দেখ, শুনিয়াছি জীবানন্দ নাকি যীশুখ্রীষ্ট ভজিবে, ঐ আসিছে।"

লেপ্টনাণ্ট ওয়াটসন দেখিলেন বেগোছ, ইহাদিগের কিছু করিতে পারিব না। সৈন্যগণকে বলিলেন "তোমরা শীঘ্র অগ্রসর হও, একটু দূরে গেলে গাছের বাঁদরে আর কামড়াইতে পারিবে না।"

তখন গাছের বাঁদরের বন্দুকের দৌড়ের বাহিরে সৈন্য লইয়া ওয়াটসন দ্রুতবেগে জীবানন্দের আক্রমণে চলিলেন।

শান্তি তখন গাছের উপর হইতে বলিল "ভাই বাঁদরের দল, একবার লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া রাঙ্গামুখোদের বাঁদরের কামড়ের জ্বালাটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।" শান্তি মনে মনে বলিতে লাগিল যে "যদি মেয়ে মানুষ না হইতাম তো"—সকলটুকু লিখিতে পারিলাম না। আগে নবীনানন্দ গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল, সঙ্গে ঝুপ ঝাপ করিয়া বৃক্ষস্থ সকল সন্তান লাফাইয়া পড়িল, তখন নবীনানন্দ বলিলেন "ধীরে ভাই, ধীরে, মিল মিশে, গোল কর না; সার বাঁধ, বন্দুক কাঁধে, বল্লম হাতে, ছুট! দৌড়! বল বন্দে মাতরং।" তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে তাহারা লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের ব্যাটেলিয়নের উপর ধাবমান হইল।

শান্তি পিছাইয়া পড়িল—বলিল "ছি! কি করিতেছি? স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধে যাই কেন? আমার ধর্ম্ম ত এ নয়! আমি গাছের বাঁদর গাছেই থাকি।" এই বলিয়া শান্তি ফিরিয়া আসিয়া গাছের উপর উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

জীবানন্দ প্রায় পুল পাইয়াছিল, কিন্তু দূর হইতে বন্দে মাতরং কাণে গেল। জীবানন্দ বলিল "ভাই দূর হইতে বন্দে মাতরং শুনিতেছি, ভাই মরি মর্‌বো, পুলে কাজ নাই, চল একবার উহাদের সঙ্গে গিয়া বন্দে মাতরং গাই।" জীবানন্দের সেনার আর প্রাণভয়ে পলান হইল না। বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে সেই হতাবশিষ্ট পঞ্চসহস্র সন্তানসেনা লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের দিকে ধাবমান হইল এবং বজ্রের মত লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনার উপরে পড়িয়া তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিল। এক দিকে জীবানন্দের সৈন্য আর এক দিকে নবীনানন্দের প্রেরিত সৈন্য দুই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে দৃঢ়বল পর্ব্বততুল্য ইংরেজ সেনা ক্ষয়িত হইতে লাগিল। ক্ষয় হয় তবু ভাঙ্গে না! ইংরেজের অতুল বল, অতুল সাহস, অতুল অধ্যবসায়। রাউণ্ডের পর রাউণ্ড, ফায়ারের পর ফায়ার, বৃষ্টির পর বৃষ্টি, মেঘের উপরে আরো মেঘ! পৃথিবী অন্ধকার হইল, গগন প্রতিধ্বনিতে বিদারিত হইতে লাগিল, কাননে ঝড় বহিল, পশু পক্ষী ভয়ে বিবরে লুকাইল, অজয়ে তুফান উঠিল। নবীনানন্দ বৃক্ষ হইতে ডাকিল "মার মার যবন মার। ঐ ওপাশে, এই সেনার পরে জীবানন্দ আছে, যাও ফৌজদারী বাদসাহী ভেদ করিয়া যাও ভাই। মার মার ফৌজদারী মার।" তখন দক্ষিণ বামে বিদ্ধ হইয়া, আহত নিহত বিপুল স্থানচ্যুত বিদারিত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। মাঝখানে জীবানন্দের দলে এবং নবীনানন্দের প্রেরিত দলে দেখা হইল। তখন শান্তি আর থাকিতে পারিল না। "ছি! নারীজন্মেই ধিক!" এই বলিয়া শান্তি আবার গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল। যেখানে দুই বিজয়ী সন্তানসেনার সম্মিলন হইয়াছে সেইখানে কুরঙ্গীর ন্যায় শান্তি ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রের মাঝখানে জীবানন্দে নবীনানন্দে দেখা হইল। দুই জনে দুই জনকে আলিঙ্গন করিল। যখন একটু অবসর পাইল তখন জীবানন্দ বলিল "শান্তি, আজ তোমার সমক্ষে মরিলে কি সুখ হইত!"

নবীনানন্দ বলিল "মরিবার এখনও সময় আছে, তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ত বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, মরিবার দরকার হলে আমায় বলিও, আমি পথ দেখাইয়া দিব; যাও দেখি যদি ঐ পথে মৃত্যু নামে অমূল্য নিধি খুঁজিয়া পাও।" এই বলিয়া শান্তি কাপ্তেন হের সৈন্য দেখাইয়া দিল। যাইবার সময়ে জীবানন্দের কাণে কাণে বলিয়া দিল, "আজ মরিতে পাইবে না। সত্যানন্দের আদেশ।"

তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ অশ্বারোহণে সসৈন্যে কাপ্তেন হের প্রতি ধাবমান হইলেন। শান্তি বিষণ্নমনে নারীজন্মকে ধিক্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া গাছে উঠিয়া "গেছো মেয়ে" বলিয়া আপনার নিন্দা করিতে লাগিল। কাপ্তেন হেও দেখিলেন যে, যাহার পলায়ন অবরোধ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, সেই স্বয়ং আবার সম্মুখে আসিতেছে। কাপ্তেন হে ফিরিয়া জীবানন্দকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহার অভিমুখী হইলেন। যেমন দুইটী পর্ব্বতনিঃসৃত নদী বিপরীত দিক হইতে আসিয়া উপত্যকার এক গহ্বরে পরস্পরকে প্রহত করে—উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার ফেণনিচয় আকাশে প্রেরিত

করে, শব্দে পর্ব্বতকন্দর বিদীর্ণ করে, তেমনি হে ও জীবানন্দের সেনাদ্বয় তুমুল সংগ্রামের সংঘর্ষণে সংঘর্ষিত হইল। জয় পরাজয় নাই, শত শত প্রাণী নিহত হইতেছে, একবার ইংরেজসেনা "হুরূরে" বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া শত শত সন্তান দলিত করিতেছে। আবার "কলয়সি করবালং" বলিয়া সন্তানের দল ইংরেজের সেনাদলকে দলিত করিতেছে। জয় পরাজয় নাই, কি হয় বলা যায় না। কাপ্তেন হের কাছে ইংরেজের বাছা বাছা সেনা, বিশেষ গোরা অনেক,—পরাজয় কাহাকে বলে তাহারা ইউরোপে বা ভারতবর্ষে কখনও তা জানে না। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরশ্রেণীবৎ তাহারা স্থির দাঁড়াইয়া রহিল। সন্তানেরা যত উদ্যম করিল কিছুতেই গোরার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। তাহারা শত শত সন্তান নিহত করিতেছে কিন্তু একপদ পশ্চাদ্গামী হয় না!

ইংরেজের ভাগ্যক্রমে

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। ১০৪ পৃষ্ঠায় যে যে স্থলে "যবন" শব্দ আছে সেই সেই স্থলে ১ম সংস্করণে "ইংরেজ" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৪, ২৭শ পংক্তি "নেড়ে" স্থলে ১ম সংস্করণে "ইংরেজ" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। ১০৫ পৃষ্ঠায় যে যে স্থলে "যবন" আছে ১ম সংস্করণে সেই সেই স্থলে "ইংরেজ" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৮, ৬ষ্ঠ পংক্তির "যবন" স্থলে ১ম সংস্করণে "ইংরেজের" এবং ঐ পংক্তির "আর নাই," কথাগুলির পর ১ম সংস্করণে "মুসলমানের" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৮, ৮ম পংক্তি "রাজধানী" স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে "নগর" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৮, ১৯শ পংক্তি "এ প্রদেশ সমস্ত" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

নগর ভিন্ন সমস্ত বীরভূম

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৮, ২০শ পংক্তির "বরেন্দ্রভূমিতে" স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে "বীরভূমিতে" ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৯, ১৭শ পংক্তির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

মাথার উপর গাছের ডালে বসিয়া কে বলিল "আমি জানি কন্যা কোথায় আছে।" মহেন্দ্র উন্মুখ হইয়া বলিলেন "তুমি কে?"

সত্যানন্দ একটু রুষ্টভাবে উন্মুখ হইয়া বলিলেন, "নবীনানন্দ! আমি তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম! তুমি এখনও এখানে কেন?"

শান্তি গাছের উপর হইতে বলিল, "প্রভু, স্বর্গে মর্ত্ত্যে আপনার অধিকার আছে, গাছের ডালে কি?" এই বলিয়া ঝুপ করিয়া শান্তি নামিয়া পড়িল।

চতুর্থ খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১১, ১৭শ পংক্তির "ধাবিত হইল।" কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

যেখানে মহারাজ বীরভূমাধিপতি আসাদ-উল্-জমান বাহাদুর রাজসিংহাসনে সুখে আসীন, সেই খানেই দারুণ রাজ্যধ্বংসসূচক বার্ত্তা পৌঁছিল। তখন অতি ব্যস্তে

চতুর্থ খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৭, ১৪শ পংক্তির "সাহসে ভর করিয়া," কথাগুলির পর ১ম ও ২য় সংস্করণে ছিল—

যা থাকে কপালে বলিয়া,

চতুর্থ খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৮, ২য় পংক্তির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

মহেন্দ্র বিষণ্ণভাবে বলিল, "হউক—তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে।" পরে শান্তির মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কি প্রায়শ্চিত্ত আপনি জানেন?"

শান্তি বলিল, "মৃত্যু। কোন্ সন্তানে না জানে? আগামী মাঘী পূর্ণিমায় সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এই বলিয়া শান্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। মহেন্দ্র আর কল্যাণী বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৮, ৪র্থ পংক্তির "উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের" স্থলে ১ম সংস্করণে "বীরভূমি ইংরেজ মুসলমানের" এবং ২য় ও ৩য় সংস্করণে "বীরভূমি মুসলমানের" ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৮, ৯ম পংক্তি "সন্তানশাসনার্থে Major Edwards" স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে "বীরভূমি শাসনার্থ উড" ছিল। সুতরাং পরে যে যে স্থলে "এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌" আছে, পূর্ব্ব সংস্করণগুলিতে সেই সেই স্থলে "উড" ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৮, ২৩শ পংক্তি "নদীতীরে একটা মেলা" স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে "কেন্দুবিল্লগ্রামে [জয়দেব—১ম সং] গোস্বামীর মেলা" ছিল। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে যে যে স্থলে "মেলা" শব্দটির উল্লেখ আছে সেই সকল স্থলে "কেন্দুবিল্ল" ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১২০, ৯ম ও ১১শ পংক্তির "মেজর সাহেব" স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে "মেজর উড" ছিল। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে শান্তি ও সাহেবের কথোপকথনে "সাহেব" ও "এড্‌ওয়ার্ড্‌স"র স্থলে পূর্ব্ব সংস্করণগুলিতে "উড" ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১২০, ২৮ পংক্তির "মেলামে" কথাটির পর প্রথম তিন সংস্করণে ছিল—

কিয়া বোল্‌টা হ্যায়। কিংগুল—

শান্তি। কেঁতুলী—কেঁতুলীর মেলায় তারা যাবে না।

উড।

চতুর্থ খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১২২, ১৫শ পংক্তির শেষ শব্দ "পা" স্থলে ১ম সংস্করণে "মাথা" ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১২২, ২৪শ পংক্তির "ফেলিয়া দিয়া" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

যমালয় নামক খারাপ যায়গায় পাঠাইয়া দিয়া

চতুর্থ খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। যে যে স্থলে "এড্‌ওয়ার্ড্‌স্‌" আছে, সেই সেই স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে "উড" ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৩১, ১ম-৩য় পংক্তির "তুমি বুদ্ধির···পারিবে না আর।" পর্য্যন্ত অংশ প্রথম তিনটি সংস্করণে ছিল না।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদে "সনাতন ধর্ম্ম" স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে "আর্য্যধর্ম্ম" ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৩১, ২০শ-২১শ পংক্তি "ইংরেজরাজ্যে···ধর্ম্মাচরণ করিবে।"—এই অংশটুকু ১ম সংস্করণে নাই।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৩২, ৬ষ্ঠ-৭ম পংক্তির "ব্রত সফল···স্থাপিত করিয়াছ।"—এই অংশটুকুর পরিবর্ত্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও?

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৩২, ১১শ-১২শ পংক্তির পরিবর্ত্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

মহাপুরুষ। তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে—তোমারও আর পরমায়ু নাই।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৩২, শেষ পংক্তির পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

দেবী চৌধুরাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা

ভাদ্র, ১৩৪৬

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৬এ জুন) রাত্রি ৯টায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই তুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানা উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলা দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় রচনার একটি প্রামাণিক 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল ও Scholarly সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম—১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে—করা হইতেছে; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে আমি গৌরব বোধ করিতেছি।

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। তাঁহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্কিমের রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও উল্লেখযোগ্য।

শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে তাঁহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাঁহারা বহু

অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ও জীবনীর উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই সুযোগে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্বল থাকুক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫
কলিকাতা
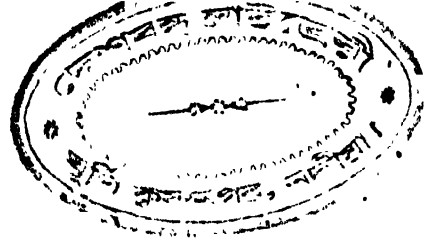
ভূমিকা

'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আমাদের জানাইয়াছেন—"ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই।...দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ [অর্থাৎ 'আনন্দমঠে'র মত] একটু ঐতিহাসিক মূল আছে।...'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড্ সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্, এই নামগুলি ঐতিহাসিক।...দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

এ কথা সত্য। নাম ও তারিখ ধরিয়া দেখিতে গেলে এই উপন্যাসে ইতিহাসকে মানিয়া চলা হয় নাই। প্রকৃত ভবানী পাঠক এক জন ভোজপুরী অর্থাৎ আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ। তাহার সহযোগী এবং ততোধিক বড় ডাকাতের সর্দ্দার মজ্‌নুন্ সাহ, মেওয়াতী অর্থাৎ বর্ত্তমান আলোয়ার রাজ্যের লোক; বাঙ্গলায় তাহার জন্ম হয় নাই, এবং মৃত্যুর পর তাহার দেহ বাঙ্গলা হইতে সেই সুদূর মেওয়াতে কবর দিবার জন্য পাঠান হয়, বাঙ্গলার হেয় জমিতে নহে। তাহাদের অনুচরগণ রাজপুত, কেহই বাঙ্গালী নহে—"Not a Bengal(i) rabble, but a number of well-armed Rajputs." (১৭৭৬ এবং ১৭৮৭ সনের সরকারী রিপোর্ট)। ভবানী পাঠক ১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে ইংরেজ সিপাইদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যায়, স্ব ইচ্ছায় ধরা দিয়া দ্বীপান্তরে যাইবার পর নহে (আর, তখন আন্দামানে কয়েদী পাঠান প্রথা আরম্ভ হয় নাই)। ফলতঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস পদত্যাগ করিবার কয়েক বৎসর পরে এই সব ডাকাতদের দমন হয় এবং "দেবী"ও অদৃশ্য হন। দেবী চৌধুরাণী নিজ দল ভাঙ্গিবার কয়েক বৎসর আগে গুড্‌ল্যাড্ রঙ্গপুর ছাড়েন।

কিন্তু যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সামাজিক আব-হাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি বাঙ্গালীরাও ডাকাতি করিত। চলন্-বিলের ধারে একটি গ্রামের এক বিখ্যাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশের পুরুষেরা নৌকাযোগে ডাকাতি করিতে করিতে যে নিজের নূতন জামাইকে হত্যা করেন এবং তাহার অনুতাপে ঐ পাপ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন, তাহার কথা রাজশাহী-পাবনা জেলায় লোক-প্রসিদ্ধ।

আর, হেষ্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম মহা পণ্ডিত ছিলেন, বহু বিভিন্ন বিষয়ে

তাঁহার পড়াশোনা ছিল, এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে পঠিত জ্ঞানকে তিনি পরিপাক করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, যে 'দেবী চৌধুরাণী'র জন্য কাল ও স্থান, সে দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসন-পদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল ; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক। আর স্থান, সীমান্তপ্রদেশ ; 'আনন্দমঠে' বন্য ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার বীরভূম জেলা, 'সীতারামে' সমুদ্রের প্রায় ধারে কোণঠেষা ভূষণা পরগণা, আর 'দেবী চৌধুরাণী'তে রঙ্গপুর জেলা। মুঘলযুগে মোঙ্গোল জাতীয় কোচ ও আহোম রাজ্য তখন বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার উত্তরের ও পূবের অনেকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; কখন আগাইত, কখন পিছাইত, সুতরাং যুদ্ধ, অন্ততঃ লুঠতরাজ নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। সুবা বাঙ্গলার কেন্দ্রস্থ জেলাগুলিতে যেমন নিয়মবদ্ধ শাসন ও "সম্রাটের শান্তি" সজোরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সীমান্ত পরগণাগুলিতে তাহা ছিল না। মহামতি বার্ক একটি সুন্দর উপমা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিস্তৃত সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড হইতে প্রেরিত রক্তের বেগ অতি দূরবর্ত্তী আঙ্গুলের ডগায় পৌঁছিতে পৌঁছিতে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বীরভূম, ভূষণা, রঙ্গপুরেও তাহাই হইত। এই চিরসত্য বঙ্কিমের সৃষ্ট বিদ্রোহীদের পথ সুগম করিয়া দেয়, তাঁহাকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই।

আর তখন বাঙ্গলা দেশের রাজস্ব-বন্দোবস্তেও অরাজকতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। টোডরমলের জমি মাপিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা (জব্‌তী) বাঙ্গলার কোন অংশে প্রচলিত হইবার সময় পায় নাই ; সর্ব্বত্রই এক এক জন জমিদারের নিকট থোকে টাকা লইয়া বাঙ্গলার সুবাদার, তথা দিল্লীর বাদশাহ সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেন। তাহাও আবার সব জেলায় নহে। মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের পর রাঢ় অঞ্চলে মাত্র নিয়মিতভাবে ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইত। রাজশাহী (অর্থাৎ সমস্ত রাজশাহী ও পাবনা এবং বগুড়ার দক্ষিণ অংশ লইয়া) ইসলাম খাঁর সময়ে সম্পূর্ণ বশীভূত হইল, এবং ঘোড়াঘাট (অর্থাৎ বর্ত্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রঙ্গপুর, এই তিনটি জেলার সীমানার মিলন-স্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারি দিকে একটা বৃত্ত টানিলে যতটা জমি তাহার মধ্যে পড়ে, তাহা,) আরও পরে রীতিমত সরকারী খাজনা দিতে আরম্ভ করিল। ময়মনসিংহ জেলাটা তাহারও এক শত বৎসর পরে মুর্শিদ কুলী খাঁর প্রবল শাসনে নিয়মিত-রাজস্ব-প্রদায়ী জেলা হইল, এবং সেটা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নূতন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারদের

পরিশ্রমে। এইরূপে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুশাসন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সুবা বাঙ্গলার মোট রাজস্ব বাড়িতে লাগিল; মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রথমে আকবরী জমা ছাড়াইয়া উঠেন, আলীবর্দ্দী তাহার উপর রাজকর কয়েক লাখ বাড়াইয়া দেন, এবং সর্ব্বশেষে হতভাগ্য মির কাসিম ইংরেজদের শোষণের ফলে মোট খাজনার পরিমাণ অসম্ভব রকম বেশী করিয়া তোলেন।

কিন্তু নবাবের শাসনশক্তি যেই পলাসী ও উঁদুয়ানালার যুদ্ধের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িল, অথচ যখন ইংরেজেরা বণিক্‌ত্ব ত্যাগ করিয়া দেশশাসনের দায়িত্ব লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন রকমে খাজনার টাকা আদায় হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট, ঠিক সেই সময়, সর্ব্বপ্রথমে সীমান্ত জেলাগুলিতে শান্তি গেল, অরাজকতা তন্দ্রা হইতে জাগিল, প্রজা দরিদ্র হইল, খাজনা কোথা হইতে আসিবে? মির কাসিমের বর্দ্ধিত হারের জমা আদায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইল। তখন সরকারী তহসিলদারগণ প্রজাদের মারপিট এবং নিজেদের উদর পূরণের জন্য লুঠ আরম্ভ করিয়া দিল। ঠিক যেমন অযোধ্যা রাজ্য যত দিন অকর্ম্মণ্য নবাবদের অধীন ছিল, তত দিন কোন জেলায় খাজনা আদায় করিতে হইলে সিপাহীর পল্টন পাঠান আবশ্যক হইত, কখন কখন দুই একটা তোপও—এখানেও সেইরূপ হইল।

'দেবী চৌধুরাণী'তে বর্ণিত যুগে ইংরেজেরা জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে সর্ব্বোচ্চ দরে এক এক বৎসরের জন্য (পরে একবার ৫ বৎসরের জন্য) জমিদারী ইজারা দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্ব্বদেশেই দেখিয়াছেন যে, এই কুপ্রথার ফল ভীষণ প্রজাপীড়ন, চাষের হ্রাস, জমিদারদের সর্ব্বনাশ এবং রাজারও নিয়মিত বার্ষিক আয়ে দ্রুত অবনতি। দেশের এই দুর্দ্দশার চিত্র বঙ্কিম ঠিক আঁকিয়াছেন, ইহার কোন অংশ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর যাহাই করুক না কেন, অনেক বৎসর ধরিয়া মফঃস্বলে শান্তি, প্রজার সুখ, এবং রাজস্বের নির্দ্দিষ্টতা আনিয়া দেয়। কিন্তু তাহা যখন ঘটে, তখন "দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে" এবং প্রফুল্ল এক পাল "বড় ডব্‌ডবে চোখ, গালফোলা" জমিদার-শাবক পালন করিতে ব্যস্ত; ডাকাত-রাণীর বজরা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—তখন আর তাহার আবশ্যকতা নাই।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। ঐ নিরস্ত্র বজরাটা যেরূপে ইংরেজ সিপাইদের ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌কে বন্দী করিল, তাহা অসম্ভব মনে হইবে কি? জলের মধ্যে লাঠির কাছে সঙ্গীনের পরাজয় কি "বঙ্কিমের বিকৃত মস্তিষ্কের" কল্পনা মাত্র, যেমন একজন অতি প্রসিদ্ধ লেখক 'আনন্দমঠে' শান্তির ঘোড়াচড়াকে বর্ণনা করিয়াছেন? সেই যুগে ভারতের সত্য ইতিহাসে ঠিক এইরূপ ঘটনা দুই জায়গায় দেখিতে পাই। ডাঙ্গা

ও জলের সন্ধিস্থলে, যেমন নদীর ঘাটে, শিক্ষিত ইংরেজ সৈন্য বড় অসুবিধায় পড়ে, সেরূপ কুস্থানে অল্পক্ষণ দ্রুতগামী যুদ্ধে লাঠি শড়কিই বিজয়ী হয়; ডাঙ্গায় রীতিমত স্থলযুদ্ধে নহে, নৌকায় করিয়া পুরাপুরি জলযুদ্ধেও নহে। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৬৭৯ সনে খান্দেরী দ্বীপের উপর নামিতে গিয়া ছোট নৌকার আরোহী ইংরেজ সেনানী লেফ্‌টেনাণ্ট থর্প এবং আর দুই জন ইংরেজ মারা যায় এবং অনেক ইংরেজ মারাঠাদের হাতে বন্দী হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত আছে—১৭৪৮ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এন্‌সাইন্‌ ইংলিশ নামক কর্ম্মচারী কাসিমবাজার হইতে জলপথে কলিকাতায় চারি লাখ টাকার অধিক মূল্যের মাল লইয়া যাইবার সময় কাটোয়ার নিকট কম জলে পৌঁছিলে মারাঠা সৈন্যেরা অতি সহজে বিনা রক্তপাতে তাঁহার সব মাল লুঠিয়া লয় এবং সাহেবকে নিরস্ত্র করে। আমার *Shivaji*, p. 274 এবং *Bihar & Orissa during the Fall of the Mughal Empire*, p. 98-এ ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এই সময়কার রঙ্গপুরের ঘটনা সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র হইতে নিম্নলিখিত কয়টি কথামাত্র জানা যায়—

"In [June] 1787, Lieutenant Brennan was employed against a notorious leader of dacoits, named Bhawani Pathak. He despatched a native officer with 24 sepoys, who surprised Pathak with 60 of his followers, in their boats. A fight took place in which Pathak himself and three of his lieutenants were killed and eight wounded, besides 42 taken prisoners. We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dacoit, by name Devi Chaudhurani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazes in her pay, and committed dacoities on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title of *Chaudhurani* would imply that she was a zamindar, probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture.

On receiving Lieut. Brennan's report, the Collector of Rangpur wrote to him, on 12th July 1787,..."I cannot at present give you any orders with respect to the female dacoit mentioned in your letter. If on examination of [the] Bengal[i] papers which you have sent it shall appear that there are sufficient grounds for apprehending her,...I shall send you such orders as may be necessary."

ইহাই হইল 'দেবী চৌধুরাণী'র ঐতিহাসিক তথ্য, অর্থাৎ তথ্যের একান্ত অভাব। কিন্তু এই জাতীয় কচকচির উপর কোন মহাকাব্যের মূল্য একেবারেই নির্ভর করে না।

'আনন্দমঠ' 'সীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিম কাব্য-রচনা করিতে বসিয়াছিলেন—'রাজসিংহ' এ তিনটি অপেক্ষা অনেক অধিকমাত্রায় ঐতিহাসিক হইলেও তাহাকে কাব্য বলা ভুল হইবে, যদি "কাব্য" বলিতে জীবনের অন্তস্তলের পর্য্যালোচন, "a criticism of life" (ম্যাথু আর্নল্ডের ব্যাখ্যা) বুঝি। এই তিনখানি মহাগ্রন্থে ইতিহাস লেখা, এমন কি, ঐতিহাসিক দৃশ্যপট আঁকা পর্য্যন্ত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না; মানবের হৃদয়কে দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত করা, তাহাকে উর্দ্ধতম স্তরে তুলিয়া দেওয়া, এই ছিল তাঁহার প্রতিভার কাজ। এই 'দেবী চৌধুরাণী'-গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম ছত্রেই তিনি অধ্যাপক সীলীর বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রচার করিতেছেন—"The substance of religion is Culture; the fruit of it, the Higher Life."

অর্থাৎ স্বর্গের ও মর্ত্তের মধ্যে সম্বন্ধ বজায় রাখাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন, সংযম ও আত্মত্যাগ—এই তিনটি বহুদিন ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ঐ সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া যায়। প্রফুল্লের জীবন তাহার চরম দৃষ্টান্ত, শান্তি এবং শ্রীও এই সাধনার ভিতর দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফলে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যই বঙ্কিমের শিল্প-কৌশলের প্রমাণ।

শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী—এ তিন জন নায়িকাকে দূর হইতে দেখিলে একই ছাঁচে ঢালা বলিয়া ভ্রম হওয়া সহজ। তিন জনই অনুপমা সুন্দরী, আবার তাহাদের "বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর" ['দেবী চৌধুরাণী', ১-১৪]; "হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী" ['সীতারাম,' ১-১০]; "[আমাকে বীরব্রত] শিখাইলে ত" ['আনন্দমঠ', ৩-৩]। তিন জনই অতি দরিদ্রের কন্যা, পিতৃহীনা অসহায়া, অল্পবয়সে বিবাহিতা, কিন্তু তিন জনেই স্বামিসঙ্গ-বঞ্চিতা। তিন জনকেই জীবনে প্রায় একই রকম অসাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়া চলিতে হইল;—সেই কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সধবা হইয়া বিধবার মত ব্রহ্মচারিণী, নিজগৃহ পর্য্যন্ত নাই, দেশপর্য্যটন, শারীরিক বল ও ব্যায়াম অভ্যাস, গীতাপাঠ, নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা,—এই সবগুলি দিয়া যৌবনে তাহাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিল। পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালী ভদ্রঘরের কোমলা নারী, শেষে বিদ্রোহী সন্তানবীর, ডাকাতের সর্দ্দার, "সিংহবাহিনী মূর্ত্তি" বা ভৈরবী হইয়া দাঁড়াইল। অতি দীর্ঘকাল দুঃখে দহিয়া, দৈন্য সহিয়া, আত্মসংযম করিয়া তবে তাহারা এত শক্ত হইল। এর মধ্যে শান্তির শরীরগঠন ও যোগশিক্ষা আগেই হইয়া গিয়াছিল, আর দুইটির হইল "মহাপুরুষ"-জাতীয়

জীবের অধীনে আসিয়া। তিন জনের অভিজ্ঞতা একই, শুধু অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সময়ে পার্থক্য।

অথচ এই তিনটি বিরহিণীর চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা নহে। এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও পরিত্যক্তা শান্তিকে কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই ('আনন্দমঠ' ২-৭ বাদে)। সে কাঁদিয়াছিল শুধু একদিন, গ্রন্থ শেষে (৪-৭) সেই পূর্ণিমার রাত্রে, শেষ যুদ্ধের পর—

"বিজন বনে তমসা নিশীথে
মৃত পতি লয়ে কোলে সাবিত্রী দুঃখিনী"

যে জন্য কাঁদিয়াছিল।

আর প্রফুল্ল? তাহার প্রথম প্রথমকার কান্না দেখিয়া নয়ান বউয়ের বিষাক্ত বর্ণনা মনে পড়ে—

সাগর। দেখতে কেমন?
নয়ন।...যেন গালফুলো গোবিন্দের মা। (৩-১৩)।

কিন্তু সেই প্রফুল্লই যখন নিশ্চয় জানিল যে, শ্বশুর কিছুতেই তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবেন না, তখন, "প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল।" (১-৩)। আবার পরদিন যখন সতীন তীক্ষ্ণ ছুরি মারিয়া বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?...ঠাকুর বলিয়াছেন, [তোমাকে] চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও"—তখনও প্রফুল্ল কাঁদিল না, "দেখা যাবে" বলিয়া নীরবে বিদায় লইল। (১-৬)। জ্বলন্ত লোহা হাতুড়ির আঘাত পাইয়া শক্ত হইতে আরম্ভ করিল।

ইহার অতি অল্পকাল পরে, তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে, সে একবার কাঁদিয়াছিল বটে, কিন্তু সেটা গার্হস্থ্য জীবনের শেষ আশাকে বিদায় দিবার জন্য নয় কি?

প্রফুল্ল। মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?
নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।
প্রফুল্ল। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্, তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপন পতি-ভক্তি। (১-১৩)।

কিন্তু দশ বৎসরের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা ও আত্মসংযমের ফলে এই কোমল বাঙ্গালীর মেয়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়াছে, অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে। অবশেষে যখন

ভাবিল যে, আজ জীবনান্তে ব্রজেশ্বরের দেখা পাইয়াছে, তখন "প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া, চোখের জলের স্রোত ছুটিল" (৩-২)। সে যে তখন মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে; শ্বশুরের মানরক্ষা করিবার জন্য, শত শত অনুচরকে বৃথা যুদ্ধ হইতে বাঁচাইবার জন্য, নিজে হইতে সাহেবদের কাছে ধরা দিবে, বিষ খাইয়া মরিবে; এই তো জীবনের শেষ দিন. আসিয়াছে; আজিকার দিন সেই পূর্ব্বের দশ বৎসরের জীবন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলিবে।

ফলতঃ প্রফুল্লকে অন্তরে গৃহিণী করিয়া বঙ্কিম সৃষ্টি করিয়াছেন; শান্তি ছিল বনের পাখী, ঘরের খাঁচা তাহার জন্য নয়; শ্রী গৃহিণী হইতে পারিত, হইতে পারিলে সুখী হইত, কিন্তু জ্যোতিষে বিশ্বাসের ফলে কঠোর আত্মত্যাগ করিয়া নিজেকে জোর করিয়া ঘর-সংসার হইতে দূরে টানিয়া ফেলিল। নিশি সহজেই প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল—

> নিশি বলিল, "এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস?
>
> ...ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।... তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।"
>
> দেবী। 'সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।' (২-৮)।

প্রফুল্ল জানিত যে, স্ত্রীজীবনের পূর্ণ বিকাশ রূপে নহে, অর্থ-লাভে প্রতাপ-চালনে বা ভোগে নহে, কেবল মাতৃত্বে। বৃক্ষের অভিব্যক্তির শেষ এবং সর্ব্বোচ্চ স্তর ফলে,—পাতায় নহে, ফুলে নহে, গন্ধে নহে। তাই প্রফুল্ল ঘরে ফিরিল।

আর শ্রী? সেও গৃহিণী হইবার উপযুক্ত মন প্রাণ লইয়াই জগতে আসিয়াছিল; পরিত্যাগকারী, পর-হইয়া-যাওয়া স্বামীর জন্য তাহারও প্রাণ পাগল—

> শ্রী—"আমি ঈশ্বর জানি না—স্বামীই জানি।...স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। যে দিন বালিকা-বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।...কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি।" ('সীতারাম', ১-১৪)।

অর্থাৎ শ্রীও প্রফুল্লের শেষ পরিণতিতে পৌঁছিয়া সন্ন্যাসিনীত্ব গৃহিণীত্বে লুপ্ত করিতে পারিত; কিন্তু করিল না; দূরে রহিল, সীতারামের কাছে ধরা দিল না। কেন? তাহার অদৃষ্ট, সীতারামের অদৃষ্ট,—অর্থাৎ যাহা মানুষ আগে হইতে দেখিতে পায় না, এমন একটা শক্তি সমস্ত পুরুষকার, সমস্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ ব্যর্থ করিয়া দিল।

সেই ধ্বংসকারী বন্যার স্রোতে এ দুই জন তো ভাসিল, আর ভূষণারাজ্য লোপ পাইল, চন্দ্রচূড় বিফল হইলেন, শত শত নিরপরাধ কুলবধূ পর্য্যন্ত এই প্রলয়ে ডুবিল। ইহাই প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল,—যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে মানবের শত চেষ্টা, সহস্র বুদ্ধি, হৃদয়ের রক্তদান, সকলই বিফল হইবে, যেমন ভাগীরথী-স্রোতে ঐরাবতও ভাসিয়া যায়। অদৃষ্টের বাণী আসিল যে, যদি রাজা লেয়াস্ রাণী জোকাষ্টাকে লইয়া ঘর-সংসার করেন, তবে তাঁহাদের পুত্র পিতৃহন্তা ও মাতৃগামী হইবে। ইহার বিরুদ্ধে সব চেষ্টা ও আয়োজন করা হইল, কিন্তু মানবগণ জানিল না, বুঝিল না, কেমন করিয়া, এই ভবিতব্য অবশেষে ঘটিল; আর তাহার ফলে লেয়াস্ অপঘাতে মারা গেলেন, জোকাষ্টা আত্মহত্যা করিল, তাহাদের অদৃষ্টের শাপে দগ্ধ পুত্র ইডিপাস নিজের চোখ উপড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও অদৃষ্টের কোপের প্রলয় থামিল না,—ইডিপাসের দুই পুত্র কাটাকাটি করিয়া মরিল, দেবী-প্রতিমা কন্যা এন্টিগনী মরিল, সেই কন্যার প্রেমিক মরিল, দেশ পর্য্যন্ত অভিশপ্ত, যুদ্ধে ছারখার হইল, এবং এই পাপের জের আরও এক পুরুষ পর্য্যন্ত চলিল, ["এপিগনী"]। সফোক্লিসের নাট্য-প্রতিভা এই সত্যকে সাহিত্যে চির অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

সেই মত, শ্রী নিজকে জোর করিয়া সীতারাম হইতে দূরে রাখিল বটে, কিন্তু "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" হইলই হইল, এক অভাবনীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রকারে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে অদৃষ্টের খেলা নাই, সেখানে পুরুষকারই জয়ী। এই অন্তঃস্থিত মহাপার্থক্য 'সীতারাম' হইতে ঐ আর দুইখানি উপন্যাসের কার্য্যকলাপ ও ফলাফল পৃথক্ জাতীয় করিয়া দিয়াছে।

শান্তি বনের পাখী, অবশেষে বনে—অর্থাৎ "হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিতে" (৪-৭) উড়িয়া গেল। শ্রী প্রলয়ের স্রোতে "কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না" (সীতারাম, ৩-২৩)।

আর প্রফুল্ল, সে ঘরে ফিরিল।

সাগর—"এখন গৃহস্থালীতে মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে?"

প্রফুল্ল—"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।...কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগ কঠিন নয়।...আমি এই সন্ন্যাস করিব।"...সে

যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাকুক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর-পরিচয়ও আছে। (৩-১৩-১৪)।

একজন মহাকবি,—ইংরেজ, কিন্তু ঋষির মত দিব্যদ্রষ্টা—চাতক পক্ষীকে দেখিয়া বলিয়াছেন, "তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী, তুমি স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছ"—

> Type of the wise, who soar but never roam,
> True to the kindred points of heaven and home.

প্রফুল্লের জীবনও এই চরম সামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত; নিষ্কাম ধর্ম্মে, দশ বৎসর ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যে গঠিত "দেবী"ই আদর্শ গৃহিণী হইতে পারেন। তাই বঙ্কিম বলিতেছেন—

> "এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমাকে দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন'।...কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম।'"

এই চিরন্তন প্রফুল্ল ১৭৭৬-১৭৮৬ সনের বঙ্গদেশ হইতে অনেক দূরে, অনেক উপরে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভূমিকা

(সম্পাদকীয়)

ইতিহাসের দিক্ দিয়া 'দেবী চৌধুরাণী' সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার তাঁহার ভূমিকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রফুল্ল-চরিত্রে যে নারীজীবনের পূর্ণ বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে, 'সীতারামে'র শ্রী ও 'আনন্দমঠে'র শান্তির সহিত তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়। ইহার কিছু কাল পরে একটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; নিছক শিল্পসৃষ্টির জন্য গল্প রচনা হইতে তিনি বিরত হন। এখন হইতে ১৮৮২ সালের মধ্যে তিনি 'রাজসিংহ' নামে একটি "ক্ষুদ্র কথা" মাত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'কে বর্ত্তমান বৃহৎ রূপ দিয়াছিলেন। ১৮৮২ সাল হইতে ১৮৯৪ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মাত্র তিনখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। এই উপন্যাস তিনখানি ('আনন্দমঠ'—১৮৮২ ; 'দেবী চৌধুরাণী' —১৮৮৪ ; 'সীতারাম'—১৮৮৭) তাঁহার পূর্ব্বেকার সকল গল্প উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত। যে 'অনুশীলনতত্ত্ব' লইয়া তিনি শেষজীবনে অবিরত মাথা ঘামাইতেন, উপন্যাসচ্ছলে তাহারই সহজ প্রচারের জন্য তিনি এই তিনটি উপন্যাসের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে 'অনুশীলনতত্ত্ব' প্রচারের একটা "কল" বলিয়া গিয়াছেন। এই তিনখানি উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের "ত্রয়ী" নামে প্রসিদ্ধ।

স্মরণ রাখিতে হইবে, পাদরি হেস্টির সহিত 'স্টেটস্‌ম্যানে' বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত তর্কযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 'দেবী চৌধুরাণী' রচনার সূত্রপাত হয়। অনুশীলন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যকে দৃষ্টান্তসহযোগে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিবার এই সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ত্রয়ী" লইয়া এখন পর্য্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপিনচন্দ্রের আলোচনা নানা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। তন্মধ্যে অধুনালুপ্ত 'নারায়ণ' ও 'বঙ্গবাণী'র নাম করা যাইতে পারে। পাঁচকড়িবাবুর

"বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী" প্রবন্ধ ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

> বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিত মাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙ্গালিত্বের পরিচায়ক, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বাঙ্গালী, দেবীচৌধুরাণী বাঙ্গালী কুলাঙ্গনা, সীতারাম বাঙ্গালী ভৌমিক, চন্দ্রচূড় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে।…
>
> এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্য্যায় দেখাইয়াছেন।…সন্ন্যাসীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। আনন্দমঠে মহেন্দ্র সিংহ সন্তান বটে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস পান নাই। দেবীচৌধুরাণী ব্রাহ্মণকন্যা; সীতারাম কায়স্থ ভৌমিক ও সেনাপতি। আনন্দমঠে তিনি ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবে সমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন; দেবীচৌধুরাণীতে শক্তিকে সর্ব্বসিদ্ধির আধারভূতা করিয়া বঙ্গীয় মানবতার উন্মেষ সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন; সীতারাম উপন্যাসে শক্তি বিরূপা হইলে, পুরুষ মোহান্ধ হইলে, কেমন বাড়া ভাতে ছাই পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিত্বের শ্লাঘা ও অপহ্নব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দেবী চৌধুরাণী'র যে মূলগত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বঙ্কিমের মনোগত অভিপ্রায় আমাদের নিকট অনেকটা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

> দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনুশীলন তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ

পরিস্ফুট। দেবীচৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবীচৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্ত্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে; অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণবঠাকুরাণী। যখন শক্তি-মূর্ত্তি, তখন পুরুষ সম্মূঢ়; ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে সম্মূঢ়, প্রফুল্লর রূপে সম্মূঢ়। এই পুরুষের তৃপ্তি-তুষ্টি সাগর বৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বৌ এবং ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রফুল্ল বা দেবীচৌধুরাণী। প্রফুল্লকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী করিতে যাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন। প্রফুল্লকে এক রাত্রির জন্য স্বামিসঙ্গে সুখী করিয়া কবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পথে একটা কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা—ঘর-সংসার দেখা। যেমন কর্ম্মী তেজস্বী ব্রাহ্মণ ডাকাতের হাত দিয়া কবি দেবীরাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোনা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কবি প্রফুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ-ভঙ্গী দেখান নাই। যেন প্রফুল্ল আসাতেই নয়ান বৌয়ের ঝগড়া থামিল, সাগর বৌয়ের অভিমান দূর হইল, আর ব্রজেশ্বর যেন "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ" পুরুষের হিসাবে, প্রফুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রফুল্ল, সাগর ও নয়ান বৌ—এই তিন গুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই তিনের সমাধান করিলেন প্রফুল্ল, সংসারে একটা negative সুখের বা স্বস্তির লহর তুলিলেন প্রফুল্ল, ফলভাগী হইল ব্রজেশ্বর। এইটুকুর জন্য প্রফুল্লকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান, সবই শিখিতে হইল, কুস্তী করিতে হইল, লাঠি খেলিতে হইল, নানা ভঙ্গীতে ত্যাগের মক্স করিতে হইল, দেবীরাণীর দোকানদারী বসাইতে হইল, ডাকাতের দলের সর্দ্দার হইতে হইল! ভবানী পাঠকের গুরুগিরির পর্য্যবসান হইল সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থলীর কার্য্যে—বাসনমাজায় ও সপত্নীবশীকরণে। আদিরসের কবি আদি-রসটুকু ভুলিতে পারেন নাই, domesticityর লোভটুকু সামলাইতে পারেন নাই। এতটা শিক্ষার পরেও প্রফুল্ল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তান্ত্রিক মতে শাক্ত ভৈরবী হইতেও পারেন নাই।...কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অপূর্ব্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙ্গালীয়ানা মাখান। উহা বাঙ্গালীর ঘরে কখনও ছিল না, বাঙ্গালীর ঘরে কখনও হইবে না।

জাজপুর হইতে বদলি হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। জাজপুরেই 'দেবী চৌধুরাণী' রচনার সূত্রপাত। শচীশ-চন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৩১-৩৩) এই সময়ের একটি ডাকাতির উল্লেখ আছে, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার অভিজ্ঞতা 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রয়োগ করিয়াছেন। ওয়েস্ট্‌মেকট সাহেব তখন হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সুরু হইতেই খিটিমিটি বাধিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় বউবাজার স্ট্রীটে বাসা লইয়া, সেখান হইতে হাওড়া যাতায়াত করিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র অবস্থা তখন কাহিল, মার্চ মাস পর্য্যন্ত (১২৮৯, চৈত্র) কোনও রকমে বাহির হইয়া তাহা বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র

'বঙ্গদর্শনে' নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য কলিকাতার বউবাজারের বাসায় বসিয়া 'দেবী চৌধুরাণী' রচনা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও 'বঙ্গদর্শন'কে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হইতে আবার বাহির হইয়া মাঘে উহা চিরতরেই বন্ধ হইয়া যায়, 'দেবী চৌধুরাণী'র দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র শেষ হয়। ওয়েস্ট্‌মেকট সাহেবের হুকুমে বাধ্য হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে হাওড়ায় বসবাস করিতে হয়। 'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে বাহির হয় ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে—পুস্তকাকারে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়*, পূর্ণচন্দ্র বসু, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতিও 'দেবী চৌধুরাণী' লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' পুস্তকে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেবী চৌধুরাণী'কে রোমান্স পর্য্যায়ে ফেলিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'দেবী চৌধুরাণী'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ পাণ্ডুলিপি আকারেই ছিল। এই পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সেই অংশটুকু রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ-সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রতিভা' (১৩৪৫) পুস্তকের 63-86 পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর হইতে তুলসীরাম এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ হইতে জে. প্রসাদ ইহার হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভি. অম্মল মাদ্রাজ হইতে 'দেবীচন্দ্রপ্রভা' নাম দিয়া ইহার তামিল অনুবাদ, এবং মস্‌লিপটম হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সি. ভাস্কর রাও ইহার তেলুগু অনুবাদ এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর হইতে বি. ভেঙ্কটাচার্য্য ইহার কানাড়ী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথ বিশ্বাস 'ভবানীপাঠক' নাম দিয়া 'দেবী চৌধুরাণী'র এক অতি অক্ষম পরিশিষ্ট প্রকাশ করেন।

* "যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঠিক সেই সময়ে, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর "দেবী চৌধুরাণী" প্রকাশিত হয়। আমি ঐ পুস্তকের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা করি। তাহা আমাদের পাক্ষিকেই প্রকাশিত হয়। আর কোন কাগজেই দেবী চৌধুরাণীর অত বড় বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। ভূদেববাবু ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন এবং "এডুকেশন গেজেটে" "উচ্চ অঙ্গের সমালোচনা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহার পুস্তকের ঐ সমালোচনা দেখিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কোনও বন্ধুর নিকট সমালোচকের তত্ত্ব লইয়াছিলেন।"

—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, 'নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ৬৬৫-৬।

দেবী চৌধুরাণী

[১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে]

যাঁহার কাছে

প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম,

যিনি স্বয়ং

নিষ্কাম ধর্ম্মই ব্রত করিয়াছিলেন,

যিনি এখন

পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়,

তাঁহার

পবিত্র পাদপদ্মে

এই গ্রন্থ

ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

The Substance of Religion is Culture.

"The Fruit of it The Higher Life"—*Natural Religion by the Author of Ecce Homo, p. 145.*

"The General Law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more Religious"—*Auguste Comte—Catechism of Positive Religion—English Translation by Congreve, 1st Edition, p. 374.*

বিজ্ঞাপন

দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশমাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

"আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।

দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার "Statistical Account" মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় বেশী নয়, এবং "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুড্‌ল্যাড্ সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্য্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী।"

"যাই মা।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, "কেন মা?"

মা বলিল, "যা না—ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি? আজ ঘরে যে কিছু নেই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি। কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কি?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, "তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুণ আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়েমানুষের তাই ঢের।"

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার জন্য ধুচুনী হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, "চাল কই?" প্রফুল্লকে দেখাইল, আধমুটা চাউল আছে মাত্র—তাহা একজনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধুচুনী হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাও?"

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নহিলে শুধু ভাতই কপালে যোটে কই?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস্ করিব।

মা। উপস্ করিয়া কয়দিন বাঁচিবি?

প্র। না হয় মরিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস্; তুই উপস্ করিয়া মরিবি, আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি, ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? এক দিনের উপবাসে মানুষ মরে না। এসো না, মায়ে ঝিয়ে আজ পৈতে তুলি। কাল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সুতা কই?

প্র। কেন, চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই?

তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা ধুচুনী হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনী কাড়িয়া লইয়া তফাতে রাখিল। বলিল, "মা, আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?"

মা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, "সবই ত আছে মা—কপালে ঘটিল কৈ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে, এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোমার অন্ন খায় কে?

প্র। শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে যোটে, তবে খাইব—নহিলে আর খাইব না। তুমি চেয়ে চিন্তে যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা! তাও কি হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুরবাড়ী যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনও তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণ-পোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি?

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ কমিবে, এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।"

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মা বুঝিল যে, মেয়ের পরামর্শই ঠিক। তখন মা, যে কয়টি চাউল ছিল, তাহা রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, "তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে? অনেক পথ।"

তাহার মাতা বলিল, "আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।"

প্রফুল্ল বলিল, "না, থাক্।"

মা ভাবিল, "থাক্। আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।"

মেয়ে ভাবিল, "থাক্। সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!"

তখন দুই জনে মলিন বেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভবাবু খুব বড়মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতালা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমসুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এদিকে প্রফুল্লের মা, কন্যা বড়মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু ছিল, ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্ব্বস্বই তার কত টাকা?—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক্ কুলান্ করিতে

পারিল না। বরযাত্রদিগের লুচি মণ্ডায়, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রগণের কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রেরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাঁধিল; প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, যে কুলটা, জাতিভ্রষ্টা, তাহার সঙ্গে হরবল্লভবাবুর কুটুম্বতা করিতে হয় করুন,—বড়মানুষের সব শোভা পায়, কিন্তু আমরা কাঙ্গাল গরিব, জাতই আমাদের সম্বল—আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে জলগ্রহণ করিব না। সমবেত সভামধ্যে এই কথা প্রচার হইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা, মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না, বিশেষ, হরবল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ-বাড়ীতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখন তাহাদের সংবাদ লইলেন না; পুত্রকে লইতেও দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দুই এক বার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্ত্তা অন্তঃপুরমধ্যে আপরাহ্নিক নিদ্রার সুখে অভিভূত। গৃহিণী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ী, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে, সেখানে প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব?"

গিন্নী। কেন—পরিচয় আবার কি বলিয়া দেয়?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরাণী কাজ করিতেছিল। সে দুই এক বার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরেই। সে বলিল, "ওগো, চিনেছি গো! ওগো চিনেছি! কে! বেহান?"

(সেকালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত।)

গিন্নী। বেহান? কোন্ বেহান?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী।

গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা?"

প্রফুল্লের মা বলিল, "তোমার বড় বউ।"

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি।

গিন্নী। কেন গা?

প্র, মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়ীতে আসিতে নাই?

গিন্নী। আসিতে থাকিবে না কেন? শ্বশুর শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভাল মানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে?

প্র, মা। শ্বশুর শাশুড়ী যদি সাত জন্মে নাম না করে?

গিন্নী। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন?

প্র, মা। খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?

গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক-পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?

গিন্নী। আ মলো! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে দেখি যে?

প্র, মা। না, কোঁদল করিতে আসি নাই। তোমার বউ একা আস্‌তে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে; আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোম্‌টা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর কর্‌তে পেলেম না!" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে কর্‌বে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হলো। বলিলেন, "কি কর্‌ব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নী আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্ত্তা মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; হাতে মুখে জল দেওয়া হইয়াছে—হাত মুখ মোছা হইতেছে। দেখিয়া, কর্ত্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "কে ঘুম ভাঙ্গাইল? আমি এত ক'রে বারণ করি, তবু কেউ শোনে না।"

কর্ত্তা মহাশয় মনে মনে বলিলেন, "ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কি দরকার আছে?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। বেস্ ঘুমাইয়াছি—কথাটা কি?"

গিন্নী মুখখানা হাসি-ভরাভরা করিয়া বলিলেন, "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। তাই বল্‌তে এসেছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া—কেন না, বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র—গৃহিণী, প্রফুল্ল ও তার মাতার আগমন ও কথোপকথন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথাগুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লের দিকে অনেক টানিয়া বলিলেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্ত্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এত বড় স্পর্দ্ধা! সেই বাগ্দী বেটী আমার বাড়ীতে ঢোকে? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে—হাজার হোক্, বেটার বউ—আর বাগ্দীর মেয়ে বা কিরূপে হলো? লোকে বল্‌লেই কি হয়?"

গিন্নী ঠাকুরুণ হার কাত নিয়ে খেল্‌তে বসেছেন—কাজে কাজেই এই রকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। "বাগ্দী বেটীকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।" এই হুকুমই বাহাল রহিল।

গিন্নী শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মারিতে হয়, তুমি মার; আমি আর তোমার ঘরকন্নার কথায় থাকিব না।" এই বলিয়া গিন্নী রাগে গর্ গর্ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। 'একখানা কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটা দিয়ে একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল্ল সেখানে গেল। প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "দ্বার দিলে কেন?"

মেয়েটি বলিল, "কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব, তাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর, ভাই।"

প্র। তুমি কে, ভাই?

সা। আমি, ভাই, তোমার সতীন।

প্র। তুমি আমায় চেন নাকি?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম।

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর, তা কেন? পোড়া কপাল আর কি—আমি কেন সে হ'তে গেলেম? আমার কি তেমনই দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু?

সা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে?

সা। জান না? তুমি কেমন ক'রেই বা জান্‌বে? কখন ত এসো নি, আমাদের আর এক সতীন আছে জান না?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই তুমি।

সা। না। সে সেই,—আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত?

সা। রূপ দেখে আমার কান্না পায়!

প্র। তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে?

সা। না, তা নয়। তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে ব'লো না। (সাগর বড় চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল) আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান্। তাই সেই টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি, আর বলিতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিত, সে ঘরণী গৃহিণী হলো কিসে?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না ; আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের সঙ্গে বড় বনে না। তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে কর্ম্মে কখন আনে। এই দুই চারি দিন এসেছি, আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে, সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল, "আমায় ডাক্‌লে কেন?"

সা। তুমি কিছু খাবে?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, "কেন, এখন খাব কেন?"

সা। তোমার মুখ শুষ্ক, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্‌লেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি।

প্রফুল্ল তখনও পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু উত্তর করিল, "শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝ্‌তে। আমার অদৃষ্টে কি হয়, তা না জেনে আমি এখানে কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয় ত তাই খাব, আর কিছু খাব না।"

সা। না না, এদের কিছু তোমার খেয়ে কাজ নাই। আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেস্ সন্দেশ।

এই বলিয়া সাগর কতকগুলা সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল। সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শরীর স্নিগ্ধ করিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমি শীতল হইলাম, কিন্তু আমার মা না খাইয়া মরিয়া যাইবে।"

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন?

প্র। কি জানি? বোধ হয়, পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

সা। এক কাজ কর্‌ব?

প্র। কি?

সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব?

প্র। তিনি কে?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কি করবেন?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবেন না।

সা। দূর! তাই কি বল্‌ছি? কোন বামুন-বাড়ীতে।

প্র। যা হয় কর, মার কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মত ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিল, "মা, তাই ত! গৃহস্থবাড়ী উপবাসী থাকিবেন! অকল্যাণ হবে যে।" ব্রহ্ম প্রফুল্লের মার সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, "এখন ভাই, যে গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।"

সা। গল্প আর কি? আমি ত এখানে থাকি না—থাক্‌তে পাবও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাক্‌ব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না। তা, তুমি এয়েচ, যেমন করে পার, থাক। আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।

প্র। থাক্‌ব বলেই ত এসেছি। থাক্‌তে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকিব?—থাকি, যদি—

সা। যদি কি?

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল, "বুঝ নাই ভাই?"

সাগর তখন বুঝিল। একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও। দিনের বেলা ত আর দেখা হবে না।"

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছি না। আমাদের গল্পের তারিখ এক শত বৎসর পূর্ব্বে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামিদর্শন পাইতেন না।

প্রফুল্ল বলিল, "কপালে কি হয়, তাহা আগে জানিয়া আসি। তার পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই থাকে, একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তিনি কি বলেন, শুনিয়া যাইব।"

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার শাশুড়ী তাহার তল্লাস করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, "কোথা ছিলে মা ?"

প্র। বাড়ী ঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নী। আহা! তোমারই বাড়ী ঘর, বাছা—তা কি কর্‌ব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন—আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।"

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, "তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে এক জন মানুষের এক বেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব? আমি বাগ্দীই হই—মুচিই হই—তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে?"

শাশুড়ী বলিল, "অবশ্য বলিব।" তার পর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুই জনে দ্বার বন্ধ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "কে গো?"

"আমি গো।"

সাগর প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, "কথা ক'স্‌নে; সেই কালপেঁচাটা এসেছে।"

প্র। সতীন?

সা। হ্যাঁ—চুপ!

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, “কে গা ঘরে, কথা ক’স্‌নে কেন? যেন সাগর বোয়ের গলা শুনিলাম না?”

সা। তুমি কে গা—যেন নাপিত বোয়ের গলা শুনিলাম না?

“আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বোয়ের মতন?”

সা। কে তবে তুমি?

“তোর সতীন! সতীন! সতীন! নাম নয়ান বৌ।”

(বউটির নাম—নয়নতারা—লোকে তাহাকে “নয়ান বৌ” বলিত—সাগরকে “সাগর বৌ” বলিত।)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল, “কে! দিদি! বালাই, তুমি কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে? সে যে একটু ফরসা।”

নয়ন। মরণ আর কি—আমি কি তার চেয়েও কালো? তা সতীন এমনই বটে—তবু যদি চৌদ্দ বছরের না হতিস্!

সা। তা চৌদ্দ বছর হলো ত কি হলো—তুমি সতের—তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

ন। রূপ যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধুয়ে খাস্। আমার যেমন মরণ নাই, তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা করতে এলেম।

সা। কি কথা, দিদি?

ন। তুই দোরই খুল্‌লি নে, তার কথা কব কি? সন্ধ্যে রাত্রে দোর দিয়েছিস্ কেন্ লা?

সা। আমি ভাই লুকিয়ে ছুটো সন্দেশ খাচ্চি। তুমি কি খাও না?

ন। তা খা খা। (নয়ন নিজে সন্দেশ বড় ভালবাসিত) বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি?

সা। আবার একজন কি? স্বামী?

ন। মরণ আর কি! তাও কি হয়?

সা। হ’লে ভাল হতো—ছুই জনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

ন। ছি! ছি! ও সব কথা কি মুখে আনে?

সা। মনে?

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিবি কেন ?

সা। তা ভাই, কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে, না বুঝাইয়া বলিলে কেমন করিয়া উত্তর দিই ?

ন। বলি, গিন্নীর না কি আর একটি বউ এয়েছে ?

সা। কে বউ ?

ন। সেই মুচি বউ।

সা। মুচি ? কই, শুনি নে ত।

ন। মুচি, না হয় বাগ্দী ?

সা। তাও শুনি নে।

ন। শোননি—আমাদের এক জন বাগ্দী সতীন আছে।

সা। কই ? না।

ন। তুই বড় দুষ্ট। সেই যে, প্রথম যে বিয়ে।

সা। সে ত বামনের মেয়ে।

ন। হ্যাঁ, বামনের মেয়ে! তা হলে আর নিয়ে ঘর করে না ?

সা। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্দীর মেয়ে হবে ?

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন লা, পোড়ার মুখী ?

সা। তুই আর এক জনকে গাল দিচ্ছিস্ কেন্ লা, পোড়ার মুখী ?

ন। মর্‌গে যা—আমি ঠাকুরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

এই বলিয়া নয়নতারা ওরফে কালপেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়—তখন সাগর দেখিল প্রমাদ! ডাকিল, "না দিদি, ফের ফের। ঘাট হয়েছে, দিদি, ফের! এই দোর খুলিতেছি।"

নয়নতারা রাগিয়াছিল—ফিরিবার বড় মত ছিল না। কিন্তু ঘরের ভিতর দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে, ইহা দেখিবার একটু ইচ্ছা ছিল, তাই ফিরিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—সন্দেশ নহে—আর এক জন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কে ?"

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে ?

সা। মুচি বৌ।

ন। এই সুন্দর ?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে, আর জ্বালাস্ নে তোর চেয়ে ত নয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এ দিকে কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসলেন। গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে ? গৃহিণীর পাঁচ জন দাসী আছে—কিন্তু স্বামিসেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে। যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই ?

কর্ত্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্দী বেটী গিয়াছে কি ?"

গৃহিণী মাছি তাড়াইয়া নথ নাড়িয়া বলিলেন, "রাত্রে আবার সে কোথা যাবে ? রাত্রে একটা অতিথ এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বৌটোকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব ?"

কর্ত্তা। অতিথ হয়, অতিথশালায় যাক্ না ? এখানে কেন ?

গিন্নী। আমি তাড়াতে পার্ব না, আমি ত বলেছি। তাড়াতে হয়, তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বৌ কিন্তু—

কর্ত্তা। বাগ্দীর ঘরে অমন ছুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমি তাড়াচ্চি। ব্রজকে ডাক্ ত রে।

ব্রজ, কর্ত্তার ছেলের নাম। এক জন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইশ; অনিন্দ্য সুন্দর পুরুষ,—পিতার কাছে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু, তোমার তিন সংসার মনে আছে ?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

"প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগ্দীর মেয়ে ?"

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "সে বাগ্দী বেটী—আজ এখানে এসেছে—জোর ক'রে থাক্‌বে, তা তোমার গর্ভধারিণীকে বল্‌লেম যে, ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না। ওঁর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চল্‌বে না? তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও।"

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা।" মার কথায় উত্তর দিল, "ভাল।"

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বৌকে তাড়াবে—বৌ খাবে কি করিয়া?"

কর্ত্তা বলিলেন, "যা খুসি করুক—চুরি করুক, ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।"

গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, "তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকুঞ্জে গিয়া দর্শন দিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মঠাকুরাণী তদ্গতচিত্তে মালা জপ করিতেছেন, আর মশা তাড়াইতেছেন। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "ঠাকুরমা!"

ব্রহ্ম। কেন, ভাই?

ব্রজ। আজ না কি নূতন খবর?

ব্রহ্ম। কি নূতন? সাগর আমার চরকাটা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই? তা ছেলে-মানুষ, দিয়েছে দিয়েছে। চরকা কাট্‌তে তার সাধ গিয়েছিল—

ব্রজ। তা নয় তা নয়—বলি আজ না কি—

ব্রহ্ম। সাগরকে কিছু বলিও না। তোমরা বেঁচে থাক, আমার কত চরকা হবে। তবে বুড়ো মানুষ—

ব্রজ। বলি আমার কথাটা শুন্‌বে?

ব্রহ্ম। বুড়ো মানুষ, কবে আছি কবে নেই, দুটো পৈতে তুলে বামুনকে দিই বৈ ত নয়। তা যাক্ গে—

ব্রজ। আমার কথাটা শোন, নইলে তোমার যত চরকা হবে, সব আমিই ভেঙ্গে দেব।

ব্রহ্ম। কি বল্‌ছ? চরকার কথা নয়?

ব্রজ। তা নয়—আমার দুইটি ব্রাহ্মণী আছে জান ত?

ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণী? মা মা মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল—রূপকথা বল। ভাই, এত রূপকথা পাব কোথা?

ব্রজ। রূপকথা থাক্—

ব্রহ্ম। তুমি যেন বল্‌লে থাক্, তারা ছাড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা জান? বলি শোন। এক বনে বড় একটা শিমুলগাছে এক বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী থাকে—

ব্রজ। সর্ব্বনাশ! ঠাকুরমা, কর কি? এখন রূপকথা! আমার কথা শোন।

ব্রহ্ম। তোমার আবার কথা কি? আমি বলি, রূপকথা শুনিতেই এয়েছ—তোমাদের ত আর কাজ নাই?

ব্রজেশ্বর মনে মনে ভাবিল, "কবে বুড়ীদের ৺প্রাপ্তি হবে।" প্রকাশ্যে বলিল, "আমার দুইটি ব্রাহ্মণী—আর একটি বাগ্দিনী। বাগ্দিনীটি না কি আজ এয়েছে?"

ব্রহ্ম। বালাই বালাই—বাগ্দিনী কেন? সে বামনের মেয়ে।

ব্রজ। এয়েছে?

ব্রহ্ম। হাঁ।

ব্রজ। কোথায়? একবার দেখা হয় না?

ব্রহ্ম। হাঁ। আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ মার দু চক্ষের বিষ হই! তার চেয়ে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা শোন।

ব্রজ। ভয় নাই—বাপ মা আমাকে ডাকাইয়া বলিয়াছেন—তাকে তাড়াইয়া দাও। তা দেখা না পেলে, তাড়াইয়া দিব কি প্রকারে? তুমি ঠাকুরমা, তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। ভাই, আমি বুড়ো মানুষ—কৃষ্ণনাম জপ করি, আর আলো চাল খাই। রূপকথা শোন ত বল্‌তে পারি। বাগ্দীর কথাতেও নাই, বামনীর কথাতেও নাই।

ব্রজ। হায়! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে!

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিস্ নে—বড় ডাকাতের ভয়! কি, দেখা কর্‌বি?

ব্রজ। তা নহিলে কি তোমার মালাজপা দেখ্‌তে এসেছি?

ব্রহ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজ। সতীনে কি সতীনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যা না। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না।

ব্রজ। চরকা ভেঙ্গেছে ব'লে? নয়ানকে বলে দেব—সে যেন একটা চরকা ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্ম। হাঁ—সাগরে, আর নয়ানে! যা যা!

ব্রজ। গেলে বাগ্দিনী দেখ্‌তে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ীর কাথাটাই শোন্ না; কি জ্বালাতেই পড়লেম গা? আমার মালা জপা হলো না। তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক্—আর চুয়াত্তর বছরই হোক্—কই, কেউ ডাক্‌লে ত কখন 'না' বলিত না।

ব্রজ। ঠাকুরদাদার অক্ষয় স্বর্গ হৌক্—আমি চৌদ্দ বছরের সন্ধানে চলিলাম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?

ব্রহ্ম। যা যা যা! আমার মালা জপা ঘুরে গেল। আমি নয়নতারাকে বলে দিব, তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস্।

ব্রজ। ব'লে দিও। খুসী হ'য়ে দুটো ছোলাভাজা পাঠিয়ে দেবে

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে, একটি উপরে।

নীচের ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘরে রাত্রে শুইত; দিনমানে নিদ্রা আসিলে সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত। অতএব ব্রজেশ্বর, ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপকথার জ্বালা এড়াইয়া সেই উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর এক জন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথম স্ত্রী।

বড় গোল বাঁধিল। দুই জনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখনও কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ এক জন তাড়াইতে আসিয়াছে, আর এক জন তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল?

উচিত যাই হউক—উচিতমত কিছুই হইল না। প্রথমে দুই জনের একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ একাল! তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া—আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক্! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডব্‌ডবে চোকের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে—আ! ছি! ছি!—ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।

যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অশ্লীলতা-দোষে নিজে দূষিত হইতেছিলেন, এবং গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার কারণ হইতেছিলেন—যখন নির্ব্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেছিল যে, বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। মুখখানা বুঝি অল্প একটু হাসিয়াছিল—কি যার মুখ, তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল—তাই ব্রজেশ্বরের কাণ সে দিকে গেল। ব্রজেশ্বর সে দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মুখখানা বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাপটায় বেড়া—তখন মেয়েরা ঝাপটা রাখিত—তার উপর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্ম-পলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর, স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর ছেলেমানুষ; স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না।

সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া, কুলুপে চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া, দুড়্ দুড়্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর, কুলুপ পড়িল শুনিতে পাইয়া, "কি কর, সাগর! কি কর, সাগর!" বলিয়া চেঁচাইল। সাগর কিছুতেই কাণ না দিয়া দুড়্ দুড়্ ঝম্ ঝম্ করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্মঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিলেন, "কি লা সাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এসে শুলি যে?"

সাগর কথা কয় না।

ব্রহ্ম। তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?

সা। তা নইলে আর তোমার আশ্রমে আসি? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো শো! এখনই আবার ডাক্‌বে এখন! আহা! তোর ঠাকুরদাদা এমন বার মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখনই ডেকেছে—আমি আরও রাগ করে যেতাম না—তা মেয়েমানুষের প্রাণ ভাই! থাক্‌তেও পারিতাম না। এক দিন হলো কি—

সা। ঠান্‌দিদি, একটা রূপকথা বল না।

ব্র। কোন্‌টা বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর কথা বল্‌বো? একলা শুন্‌বি, তা নূতন বৌটা কোথায়? তাকে ডাক্ না—দুজনে শুন্‌বি।

সা। সে কোথা, আমি এখন খুঁজিতে পারি না। আমি একাই শুন্‌বো। তুমি বল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী সে সংবাদ অনবগত, দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন; পরে যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না, তখন দুঃখিত-চিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাঙ্গা চরকা লইয়া, সেই নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কাণের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।

"কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "সাগর শিকল খুলিয়াছে, আমি চলিলাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।"

ব্র। এখন যাইও না। আমি একবার কর্ত্তাকে বলিয়া দেখিব।

প্র। বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে?

ব্র। না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া, আমি কি অধর্ম্মে পতিত হইব?

প্র। তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে এক দিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়াছ—আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।

ব্র। নিতান্ত পক্ষে, তিনি যাহাতে তোমার খোরপোষ পাঠাইয়া দেন, তা আমায় করিতে হইবে।

প্র। তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।

ব্র। আমার কিছুই নাই, কেবল আমার এই আঙ্গটিটি আছে। এখন এইটি লইয়া যাও। আপাততঃ ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে। তার পর যাহাতে আমি দু পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনার অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে দিল। প্রফুল্ল আপনার আঙুলে আঙ্গটিটি পরাইতে পরাইতে বলিল, "যদি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও?"

ব্র। সকলকে ভুলিব—তোমায় কখন ভুলিব না।

প্র। যদি এর পর চিনিতে না পার?

ব্র। ও মুখ কখনও ভুলিব না।

প্র। আমি এ আঙ্গটিটি বেচিব না। না খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখন বেচিব না। যখন তুমি আমাকে না চিনিতে পারিবে, তখন তোমাকে এই আঙ্গটি দেখাইব। ইহাতে কি লেখা আছে?

ব্র। আমার নাম খোদা আছে।

দুই জনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিলে, সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পোড়ারমুখী নয়ান বলিল, "দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি?"

প্র। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনার মুখে বলে না।

ন। সে আবার কি?

সাগর। বুঝ্‌তে পারিস্ নে? কাল উনি আমাকে তাড়াইয়া আমার পালঙ্কে, বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়াছিলেন। মিন্সে আবার সোহাগ ক'রে আঙ্গটি দিয়েছে।

সাগর নয়নকে প্রফুল্লের হাতে ব্রজেশ্বরের আঙ্গটি দেখাইল। দেখিয়া নয়নতারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?"

প্রফুল্লের সে কথা আর মনে ছিল না, সে ব্রজেশ্বরের আদর পাইয়াছিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথার উত্তর?"

ন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কি করিয়া খাইবে?

প্র। তার আর উত্তর কি?

ন। ঠাকুর বলিয়াছেন, চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও।

"দেখা যাবে" বলিয়া প্রফুল্ল বিদায় হইল।

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কীদ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, "আমি, ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়ীতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?

প্র। আমার আর লজ্জা কি?

সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ী আসিল। প্রফুল্লের মার যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়া

প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বামনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর দুবেলা স্নান, জুটিলে আহার, পূর্ব্বমত চলিল। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া কখনও কিছু দিত, তাইতে আহার চলিত। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষে প্রফুল্লের মা শয্যাগত হইল। সেকালে সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন লোক নাই যে, কবিরাজ ডাকে। কবিরাজও দেশে না থাকারই মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচ জন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মার সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা এ সময় শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা। পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া বলিল, "তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল, "ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচ জন বলিল, "তোমায় কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল, এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

একজন প্রতিবাসী বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে। তোমার মার শ্রাদ্ধে তোমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রফুল্ল বলিল, "কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?"

দুই জন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজে তাহারাই আগু হয়—তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। হরবল্লভ বলিলেন, "কি ঠাকুর! তোমরাই বিহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে একঘ'রে ক'রেছিলে—আবার তোমাদেরই মুখে এই কথা?"

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "সে কি জানেন—অমন পাড়াপড়সীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।"

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন, "এ সব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগ্দী বেটীর কাছে টাকা খাইয়াছে। ভাল, বাগ্দী বেটী টাকা পাইল কোথা?" অতএব হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর এ সকল শুনিল। মনে করিল, "এক দিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।"

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্পন্ন করিল। ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী, যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, তাহাতে ভয়ও আছে, কলঙ্কও আছে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে এক জন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এ জন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণি বিধবা; তার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা দুই ব'নেই প্রফুল্লের মার অনুগত ছিল। এই জন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনুরোধ করে, আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যে দিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেই দিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কি চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশ-ভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা; চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই। গ্রামের জমীদার পরাণ চৌধুরী। তাঁহার একজন গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা—অথবা দুর্লভ তাহার অনুগৃহীত। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখনও শুনে নাই—তা নয়, কিন্তু কি করে—আর কেহ আপনার ঘর দ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, "সে মন্দ হোক, আমি না মন্দ হইলে আমায় কে মন্দ করিবে?"

অতএব ফুলমণি দুই চারি দিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পরদিন ফুলমণি একটু দেরি করিয়া আসিতেছিল। পথে একটা আমগাছের তলায়, একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে বনের ভিতর এক জন পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে সেই দুর্লভচন্দ্র।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাম্বূলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন, আজ ?"

ফুলমণি বলিলেন, "হাঁ, আজই বেস্। তুমি রাত্রি দুপরের সময় পাল্কী নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো। আমি দুয়ার খুলিয়া দিব। কিন্তু দেখো, গোল না হয়।"

দুর্লভ। তার ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল কর্‌বে না ?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরটি খুল্‌ব, তুমি আস্তে আস্তে, সে ঘুমিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তার পর চেঁচায় কার বাপের সাধ্য !

দুর্লভ। তা, অমন জোর করে নিয়ে গেলে কয় দিন থাকিবে ?

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পার্‌লেই হলো। যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙ্গাল, সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে—সে আবার থাক্‌বে না ? সে ভার আমার—আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে, দুর্লভ স্বস্থানে গেল—ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মার কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল। মার জন্য যেমন কাঁদে, তেমনি কাঁদিল ; কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্লভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্লভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণবাবু জমীদারের বিহারমন্দিরে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইহার অর্দ্ধ দণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্য গৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে। হায়! কোথাও কেহ নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল বলিয়াছি ; কেহ মনে না করেন—এটা ভ্রম-প্রমাদ ! বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা। কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি

নিষেধ ছিল। শব্দ করিলে গোলযোগ হইবে; তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে, বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তার পর আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্‌ বর্ক্‌ সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক্‌, দেবী সিংহের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার অনন্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর লোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্র-ভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে? গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।

অতএব দুর্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তার উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্কী দেখিয়া ডাকাতের আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোক জনও নাই, কেবল দুর্লভ নিজে আর ফুলমণি। এইরূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তার পর বড় ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুই জন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মত দুই মূর্ত্তি আসিতেছে। এক জন বেহারা অপরদিগকে বলিল, "মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়!" অপর আর এক জন বলিল, "রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভাল মানুষ?"

তৃতীয় বাহক বলিল, "মানুষ দুটো ভারি জোয়ান।"

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্‌ছি না?

১ম। চক্রবর্ত্তী মশাই কি বলেন? আর ত এগোনো যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাই ত, বড় বিপদ্ দেখি যে! যা ভেবেছিলেম, তাই হলো।

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল, "কোন্ হ্যায় রে?"

বেহারারা অমনি পাল্কী মাটিতে ফেলিয়া দিয়া "বাবা গো" শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি "আমায় ফেলে কোথা যাও?" বলিয়া তাঁর পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুই জন আসিতেছিল—যাহারা এই দশ জন মনুষ্যের ভয়ের কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুই জন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজসরকারে চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্রিপ্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারারা পলাইল দেখিয়া তাহারা একবার খুব হাসিল। তাহার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই; চীৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে! প্রথমে ভয়ে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কি নূতন বিপদ্। ধীরে ধীরে পাল্কীর কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দুই জন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল, তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল, মনুষ্য দুই জন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্কী হইতে বাহির হইল—দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তার পর, দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যে দিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ ভালুকে খায়, সেও ভাল, আর ডাকাইতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম। পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।"

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল-কলসী আছে, কলসীতে জল আছে; জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার কথামত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হয় ত সাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, "আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিও।"

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তার পর বুড়া বলিতে লাগিল, "আমার কিছু টাকা পোতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে, না লইয়া পালাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ত পলাইয়াছে। আর কোন্ মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে একখানা চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুরঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে ঘরের বায়ুকোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।"

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিল। বুড়া বলিল, "এই বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও, একটু আপনি খাও।"

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি সাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্ণে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়; সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট। প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রৌদ্রে

শুকাইল। তার পরে কোদালি সাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাঁকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্ব্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা, দীর্ঘে প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসান আছে। এখন সাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল। প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলা গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চকমকি দিয়াশলাই আছে কি না। বুড়া মানুষ—অবশ্য তামাকু খাইত। সর্ ওয়াল্টর রালের আবিক্রিয়ার পর, কোন্ বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস, এ দুর্ব্বিষহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে?—আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই—তার আর কিছু দিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি, সোলা, দিয়াশলাই, সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোহাল উচাইয়া বিচালি লইয়া আসিল। চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। সাবল কোদালি আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। বায়ুকোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যে সব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা বিচালির আগুনে জ্বালিল। উপরে মুক্ত পথ দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো হইল। সেইখানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে সাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিই।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও

খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব-গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া, তৎপাদপদ্মনিকর সেবন-পূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিল। দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরিব; বিষয়কর্ম্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকুরি যুটিল। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড় সুন্দরী, নবাবমহলে সে সংবাদ পৌঁছিল। এক জন হাব্‌সী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজি, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন্ দিন কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজি বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া, একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে রহিল। বাবাজি সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

এক দিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল,—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোর-কুঠরী বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের

চোর-কুঠরীতে গিয়া সন্ধান করিত। এক দিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চক্‌চক্‌ করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল, মোহর। ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল, "আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও।" বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজী বুঝিলেন, বৈষ্ণবী এক দিন ছুটি পাইয়াছে, শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্ব্বকালে উত্তর-বাঙ্গালায়, নীলধ্বজবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে, কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠান-সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তার পর আর তাঁহাকে মনুষ্য-লোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কি হইল, কেহ জানে না। তিনি আর কখনও দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাঁহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল। সুবর্ণ, হীরক, মুক্তা, অন্য রত্ন অসংখ্য—অগণ্য, কেহ স্থির করিতে পারে না কত। কৃষ্ণগোবিন্দ কুড়ি ঘড়া এইরূপ ধন পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে এক দিনের তরেও এ ধনের কথা কিছুই জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেস্ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সেই বিচালির বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এখন একটু ফুলমণির কথা বলি। ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাইতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পলাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে, "ও গো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো! ঐ এলো গো!" কাঁটা-বনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটা-বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, "ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিন্‌সে?" শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাইতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন। ফুলমণি ডাকিল, "ও অধঃপেতে—ও পোড়ারমুখো—ও আঁটকুড়ির পুত—ও হাবাতে—ও ড্যাক্‌রা—ও বিট্‌লে।" ততক্ষণ দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রোদনকালে দুর্লভের মাতাপিতার প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল।

এ দিকে ফুলমণি দেখিল, কই—ডাকাইতেরা ত কেহ আসিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল—কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডাকাইত আসে—না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌঁছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, "কি লা, তুই এখন এলি?"

ফুলমণি বলিল, "কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম ?"

অলকমণি। কোথায় আর যাবি ? বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

ফুল। তুই চোকের মাথা খেয়েছিস্ তার কি হবে ? ভোরের বেলা তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম—দেখিস্ নে ?

অলকমণি বলিল, "সে কি, বোন্ ? আমি তোর বেলা দেখে তিন বার বামুনদের বাড়ী গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম। তা তোকেও দেখ্‌লাম না—কাকেও দেখ্‌লাম না। হ্যাঁ লা ! প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে লা ?"

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ্ কর ! দিদি চুপ্ ! ও কথা মুখে আনিস্ না।

অল। (সভয়ে) কেন, কি হয়েছে ?

ফুল। সে কথা বল্‌তে নেই।

অল। কেন লা ?

ফুল। আমরা ছোট লোক—আমাদের দেবতা বামুনের কথায় কাজ কি, বোন্ ?

অল। সে কি ? প্রফুল্ল কি করেছে ?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে ?

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কি ? কি বলিস্ ?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কারও সাক্ষাতে বলিস্ নে—কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

ভগিনী। অ্যাঁ !

অলকমণির গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণপরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তার পর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিতা হইয়া, দাঁতকপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহারকালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, "এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস্, আমার মাথা খাস্।"

দিদি বলিলেন, "না গো ! এ কথা কি বলা যায় ?" কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনী হাতে পল্লী-পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ঘরে ঘরে

উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ, এ কথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া রূপান্তরে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী গেল। রূপান্তর কিরূপ? পরে বলিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, "এখন কি করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে? যাই বা কোথায়? বাড়ী ফিরিয়া যাইব? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি হবে, চোর ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এ ধনের রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে?"

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, "অদৃষ্টে যাহাই হৌক, দারিদ্র্য-দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।"

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘর দ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষ, রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, দাল, সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায়? প্রফুল্ল ভাবিল, "সন্ধান করিয়া লইব।" জঙ্গলে পথের রেখা আছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কোথা যাইবে, মা?"

প্র। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এদিকে হাটের পথ কোথা ?

প্র। তবে কোন্ দিকে ?

ব্রা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?

প্র। এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রা। এই জঙ্গলে তোমার বাস ?

প্র। হাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেন না ?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে ?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে ?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি ?" প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চাল দাল কিনিতে পার।"

প্রফুল্ল বলিল, "সেই হলে ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখিতেছি।"

ব্রা। ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা! তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই ? দেখিল, সেখানে একখানি কুটীর আছে—তালা চাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালা চাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল,—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি, কলসী, চাল, দাল, নুন, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, "তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও।"

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "দাম কত দিতে হইবে ?"

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে? দাও, ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল; বলিল, "মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।"

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর! তা হৌক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন "সবই মোহর" কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিষপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল, "আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড় চোপড়ের বরাৎ আছে।"

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ী চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?"

সর্ব্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না।—আমাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দ্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।"

প্রফুল্ল স্পন্দহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভবানী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।"

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া, তাহাতে গোটাকত ঘা দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান

লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আজ্ঞা হয়?"

ভবানী বলিল, "এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।" এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি; একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে আমার বাড়ী দেখাইতেছি।"

প্রফুল্ল দ্রব্য সামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া, ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখান ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক বলিল, "এই ভাঙ্গা বাড়ীতে তুমি মোহর পাইয়াছ?"

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

ভ। কত?

প্র। অনেক।

ভ। ঠিক বল কত। ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী খুঁড়িয়া দেখিবে।

প্র। কুড়ি ঘড়া।

ভ। এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। দেশে লইয়া যাইব।

ভ। রাখিতে পারিবে?

প্র। আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভ। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এ বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্র। তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব। আপনি রক্ষা করিবেন?

ভ। করিব। কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কি করিবে?

প্র। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করে?

ভ। ভোগ করে।

প্র। আমিও ভোগ করিব।

ভবানী ঠাকুর "হোঃ হো!" করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, "মা! বোকা মেয়ের মত কথাটা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার ত কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়?"

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, "শোন। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া, কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার যো নাই। কেন না, তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পার, না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোন্‌টা করিবে?"

প্রফুল্ল বড় সাহসী। বলিল, "এ সকল কথা ত ডাকাইতের সর্দ্দারের মত নহে।"

ব্রা। না; আমি কেবল ডাকাইতের সর্দ্দার নহি। তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দ্দার নহি, তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভাল যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ, তোমার হইতে পারে না—কেন না, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা, বিস্তর পাপ, অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার। কোন্ পথে যাইতে চাও?

প্র। যদি বলি, পাপই করিব?

ব্রা। আমি তাহা হইলে, লোক দিয়া, তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে, তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে। অতএব তোমার সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্র। লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি?

ভ। রাখিতে পারিবে কি? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। যতই কেন ধন থাক্ না, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তার পর, মা?

প্র। তার পর কি?

ভ। নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসাপরিতৃপ্তির উপায় নাই—সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

প্র। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব? আমি বড় কাঙ্গাল—আমার অন্ন বস্ত্র যুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে এক মুটো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, "ধন তোমার। আমি লইব না।"

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, "তুমি ভাবিতেছ, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এ রকম ভাণ করে কেন? সে কথা তোমায় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কি করিব।

ভ। শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণ পোষণের কোন কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে। কেমন, স্বীকৃত আছ?

প্র। বাস করিব কোথায়?

ভ। এইখানে। ভাঙ্গা চোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্র। এইখানে একা বাস করিব?

ভ। না, আমি দুই জন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব। তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোন ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্ত্তা। আমি থাকিতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্র। আপনি কিরূপে শিখাইবেন?

ভ। তুমি লিখিতে পড়িতে জান?

প্র। না।

ভ। তবে প্রথমে লেখা পড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঙ্গরাজ! এখানে কেন?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার সন্ধানে। আপনি এখানে কেন?"

ভ। যা এত দিন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

রঙ্গ। রাজা?

ভ। রাণী।

রঙ্গ। রাজা রাণী আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় না কি হষ্টিন * বলিয়া এক জন ইংরেজ ভাল রাজ্য ফাঁদিয়াছে।

ভ। আমি সে রকম রাজা খুঁজি না। আমি খুঁজি যা, তা ত তুমি জান।

রঙ্গ। এখন পাইয়াছেন কি?

ভ। সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে। দেখিও, এই বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষমানুষ না প্রবেশ করিতে পায়। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

রঙ্গ। যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

* Warren Hastings.

ভ। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে?

রঙ্গ। বোধ হয় করিতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী ঠাকুর অঙ্গীকার মত দুই জন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। একজন হাটে ঘাটে যাইবে, আর একজন প্রফুল্লের কাছে অনুক্ষণ থাকিবে। দুই জন দুই রকমের। যে হাটে ঘাটে যাইবে, তাহার নাম গোব্‌রার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কাণে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোন মতে ইসারা ইঙ্গিতে চলিত; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এ রকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাঁধে।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—বর্ষাকালের কচি পাতার মত রঙ। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

দুই জনে একত্র আসিল—যেন পূর্ণিমা অমাবস্যার হাত ধরিয়াছে। গোব্‌রার মা প্রফুল্লকে প্রণাম করিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি গা?"

গোব্‌রার মা শুনিতে পাইল না; অপরা বলিল, "ও একটু কালা—ওকে সবাই গোব্‌রার মা বলে।"

প্র। গোব্‌রার মা! তোমার কয়টি ছেলে গা?

গোব্‌রার মা। আমি ছিলেম আর কোথায়? বাড়ীতে ছিলেম।

প্র। তুমি কি জেতের মেয়ে?

গোব্‌রার মা। যেতে আস্‌তে খুব পার্‌ব। যেখানে বলিবে, সেইখানেই যাব।

প্র। বলি, তুমি কি লোক?

গোব্‌রার মা। আর তোমার লোকে কাজ কি মা! আমি একাই তোমার সব কাজ ক'রে দেব্। কেবল দুই একটা কাজ পার্‌ব না।

প্র। পার্‌বে না, কি?

গোব্‌রার মার কাণ ফুটিল। বলিল, "পার্‌ব না, কি? এই জল তুল্‌তে পার্‌ব না। আমার কাঁকালে জোর নাই। আর কাপড় চোপড় কাচা—তা না হয় মা, তুমিই ক'রো।"

প্র। আর সব পার্‌বে ত?

গো-মা। বাসন টাসনগুলো মাজা—তাও না হয় তুমি আপনিই কর্‌লে।

প্র। তাও পার্‌বে না; তবে পার্‌বে কি?

গো-মা। আর এমন কিছু না—এই ঘর ঝেঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।

প্র। পার্‌বে কি?

গো-মা। আর যা বল। সল্‌তে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো পাতা ফেল্‌বো,—আর আসল কাজ যা যা, তা কর্‌ব—হাট কর্‌ব।

প্র। বেসাতির হিসাবটা দিতে পার্‌বে?

গো-মা। তা মা, আমি বুড়ো মানুষ, হালা কালা, আমি কি অত পারি! তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ করে আস্‌ব—তুমি বল্‌তে পাবে না যে, আমার এই খরচটা হলো না।

প্র। বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

গো-মা। তা মা, যা বল, তোমার আপনার গুণে বল।

প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, "তোমার নাম কি গা?"

নবাগতা সুন্দরী বলিল, "তা ভাই, জানি না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "সে কি; বাপ মায় কি নাম রাখে নাই?"

সুন্দরী বলিল, "রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নহি।"

প্র। সে কি গো?

সুন্দরী। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ মার কাছছাড়া। ছেলেবেলায় আমায় ছেলেধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্র। বটে। তা তারাও ত একটা নাম রেখেছিল?

সুন্দরী। নানা রকম।

প্র। কি কি?

সুন্দরী। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী, চুলোমুখী।

এতক্ষণ গোব্‌রার মা আবার কাণ হারাইয়াছিল। এই কয়টা সদাশ্রুত গুণবাচক শব্দে শ্রুতি জাগরিত হইল। সে বলিল, "যে আমায় পোড়ারমুখী বলে, সেই পোড়ারমুখী, যে আমায় চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী, যে আমায় আঁটকুড়ী বলে, সেই আঁটকুড়ী"—

সুন্দরী। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলি নাই, বাছা।

গো-মা। তুই আঁটকুড়ী বলিলেও বলেছিস্, না বলিলেও বলেছিস্—কেন বল্‌বি না?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বল্‌চে না গো—ও আমাকে বল্‌চে।"

তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোব্‌রার মা বলিল, "ও কপাল! আমাকে না? তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ ক'রো না। ও বামনীর মুখটা বড় কদুয্যি। তা বাছা! রাগ কর্‌তে নেই।" গোব্‌রার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন। প্রফুল্ল অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামনী? তা আমাকে এতক্ষণ বল নাই? আমার প্রণাম করা হয় নাই।" প্রফুল্ল প্রণাম করিল।

বয়স্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "আমি বামনের মেয়ে বটে—এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামনী নই।"

প্র। সে কি?

বয়স্যা। বামন যোটে নাই।

প্র। বিবাহ হয় নাই? সে কি?

বয়স্যা। ছেলেধরায় কি বিয়ে দেয়?

প্র। চিরকাল তুমি ছেলেধরার ঘরে?

বয়স্যা। না, ছেলেধরায় এক রাজার বাড়ী বেচে এয়েছিল।

প্র। রাজারা বিয়ে দিল না?

বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন,—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্ব্বমত।

প্র। নিজে পাত্র বুঝি?

বয়স্যা। তাও কয়দিনের জন্য বলিতে পারি না।

প্র। তার পর?

বয়স্যা। রকম দেখিয়া পলায়ন করিলাম।

প্র। তার পর?

বয়স্যা। রাজমহিষী কিছু গহনা দিয়াছিলেন, গহনা সমেত পলাইয়াছিলাম। সুতরাং ডাকাইতের হাতে পড়িলাম। সে ডাকাইতের দলপতি ভবানী ঠাকুর, তিনি

আমার কাহিনী শুনিয়া আমার গহনা লইলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন। আপনার গৃহে আমায় আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। এক প্রকার কি ?

বয়স্যা। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম ?

বয়স্যা। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী ?

বয়স্যা। হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না।

বয়স্যা বলিল, "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে ; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।"

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ! স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, "আমি অত কথা ভাই, বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত বলিলে না ?"

বয়স্যা বলিল, "ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি, আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই ? দুই ঈশ্বর ? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কত থাকে ?"

প্র। দূর্! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে ?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।

প্র। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।" তখন নিশি প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল। বলিল, "এত জানিতাম না।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে দুর্লভ চক্রবর্ত্তী প্রফুল্লকে তাহার মাতার বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া যায়, দৈবগতিকে ব্রজেশ্বর সেই রাত্রেই প্রফুল্লের বাসস্থানে দুর্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরের একটি ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর খুব মজবুত। যখন বাড়ীর সকলে ঘুমাইল, ব্রজেশ্বর গোপনে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্ধকারে দুর্গাপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি প্রফুল্লের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সে ভবন জনশূন্য, অন্ধকারময়। প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে ব্রজেশ্বর পাড়াপড়শী কাহাকেও পাইলেন না যে, জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে না দেখিতে পাইয়া মনে করিল যে, প্রফুল্ল একা থাকিতে না পারিয়া কোন কুটুম্ববাড়ী গিয়াছে। ব্রজেশ্বর অপেক্ষা করিতে পারিল না। বাপের ভয়, রাত্রিমধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তার পর কিছু দিন গেল। হরবল্লভের সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। সকলে খায় দায় বেড়ায়—সংসারের কাজ করে। ব্রজেশ্বরের দিন কেবল ঠিক সে রকম যায় না। হঠাৎ কেহ কিছু বুঝিল না—জানিল না। প্রথমে মা জানিল। গৃহিণী দেখিল, ছেলের পাতে দুধের বাটিতে দুধ পড়িয়া থাকে, মাছের মুড়ার কেবল কণ্ঠার মাছটাই ভুক্ত হয়, "রান্না ভাল হয় নাই" বলিয়া, ব্রজ ব্যঞ্জন ঠেলিয়া রাখে। মা মনে করিলেন, "ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।" প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোট্‌কার ব্যবস্থা করিলেন, তার পর কবিরাজ ডাকিবার কথা হইল। ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মাকে ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কিন্তু ব্রহ্মঠাকুরাণীকে পারিল না। বুড়ী ব্রজেশ্বরকে এক দিন একা পাইয়া চাপিয়া ধরিল।

"হ্যাঁ রে ব্রজ, তুই আর নয়ানবৌয়ের মুখ দেখিস্ না কেন?"

ব্রজ হাসিয়া বলিল, "মুখখানি একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে মেঘ ঝড় ছাড়া নেই—দেখিতে বড় সাধ নেই।"

ব্রহ্ম। তা মরুক্ গে, সে নয়ানবৌ বুঝ্বে—তুই খাস্ নে কেন?

ব্রজ। তুমি যে রাঁধ!

ব্রহ্ম। আমি ত চিরকালই এমনি রাঁধি।

ব্রজ। আজ কাল হাত পেকেছে।

ব্রহ্ম। দুধও বুঝি আমি রাঁধি? সেটাও কি রান্নার দোষ?

ব্রজ। গরুগুলোর দুধ বিগ্‌ড়ে গিয়াছে।

ব্রহ্ম। তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস্ কি?

ব্রজ। কবে তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম। আর তোর বড়াইয়ে কাজ নাই! মুখে অমন অনেকে বলে! শেষে এই নিমগাছের তলায় আমায় গঙ্গায় দিবি—তুলসী গাছটাও দেখতে পাব না! তা তুই ভাব না যা হয়—কিন্তু তুই আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হ'য়ে গেলি কেন?

ব্রজ। ওটা কি কম ভাবনা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়ে রাণায় ব'সে কি, ভাই, ভাব্‌ছিলি? চোখ দিয়ে জল পড়ছিল কেন?

ব্রজ। ভাব্‌ছিলাম যে, স্নান করেই তোমার রান্না খেতে হবে। সেই দুঃখে চোখে জল এসেছিল।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দিবে? তা হলে খেতে পার্‌বি ত?

ব্রজ। কেন, সাগর ত রোজ রাঁধিত? খেলা-ঘরে যাওনি কোনও দিন? ধূলা-চড়চড়ী, কাদার সূক্ত, ইটের ঘণ্ট—এক দিন আপনি খেয়ে দেখ না? তার পর আমায় খেতে ব'লো।

ব্রহ্ম। প্রফুল্ল এসে রেঁধে দিবে?

যেমন পথে কেহ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের উপর সেই আলো পড়িলে, ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনই হইল। ব্রজ উত্তর করিল, "বাগ্দী যে।"

ব্রহ্ম। বাগ্দী না। সবাই জানে, সে মিছে কথা। তোমার বাপের কেবল সমাজের ভয়। ছেলের চেয়ে কিছু সমাজ বড় নয়। কথাটা কি আবার পাড়্‌ব?

ব্রজ। না, আমার জন্য সমাজে আমার বাপের অপমান হবে—তাও কি হয়?

সে দিন আর বেশী কথা হইল না। ব্রহ্মঠাকুরাণীও সবটুকু বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা বড় সোজা নয়। প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়,—একে ত রূপেই সে ব্রজেশ্বরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আবার সেই এক দিনেই ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিলেন, প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর। যদি প্রফুল্ল—বিবাহিতা স্ত্রী—স্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত, তবে এই উন্মাদকর মোহ সুস্নিগ্ধ স্নেহে পরিণত হইত। রূপের মোহ কাটিয়া যাইত, গুণের মোহ থাকিয়া যাইত। কিন্তু তা হইল না। প্রফুল্ল-বিদ্যুৎ একবার চমকাইয়া, চিরকালের জন্য অন্ধকারে মিশিল, সেই জন্য সেই মোহ সহস্র গুণে বল পাইল। কিন্তু এ ত গেল সোজা কথা। কঠিন এই যে, ইহার উপর দারুণ করুণা। সেই সোণার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকাল জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল। বুঝি না খাইয়া মরিয়া যাইবে! যখন সেই প্রগাঢ় অনুরাগের উপর এই গভীর করুণা—তখন মাত্রা পূর্ণ। ব্রজেশ্বরের হৃদয় প্রফুল্লময়—আর কিছুরই স্থান নাই। বুড়ী এত কথাও বুঝিল না।

কিছু দিন পরে ফুলমণি নাপিতানীর প্রচারিত প্রফুল্লের তিরোধান-বৃত্তান্ত হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিল। গল্প মুখে মুখে বদল হইতে হইতে চলে। সংবাদটা এখানে এরূপ আকারে পৌঁছিল যে, প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল। ব্রজেশ্বরও শুনিল।

হরবল্লভ শৌচ স্নান করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "বাগ্দীর শ্রাদ্ধ বামণে করিবে?" নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, "একটা পাপ গেল—আর একটার জন্য নাওয়াটা নাইতে পার্‌লেই শরীর জুড়ায়।" কিছু দিন গেল। ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া, ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু জ্বর হয় মাত্র, কিন্তু ব্রজ নির্জ্জীব, শয্যাগত। বৈদ্য দেখিল। ঔষধপত্রে কিছু হইল না—রোগ বৃদ্ধি পাইল। শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।

আসল কথা আর বড় লুকান রহিল না। প্রথমে বুড়ী বুঝিয়াছিল, তার পর গিন্নী বুঝিলেন। এ সকল কথা মেয়েরাই আগে বুঝে। গিন্নী বুঝিলেই, কাজেই কর্ত্তা বুঝিলেন। তখন হরবল্লভের বুকে শেল বিঁধিল। হরবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছি! ছি! কি করিয়াছি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি।" গিন্নী

প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।" হরবল্লভ প্রাতজ্ঞা কারলেন, "এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।"

ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল—ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিল। এক দিন হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত। হরবল্লভ শ্রাদ্ধ করিতেছেন, ব্রজেশ্বর সেখানে কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত আছেন। তিনি শুনিলেন, শ্রাদ্ধান্তে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

কথাটি ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।"

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া দুই চারি দিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইল। প্রফুল্লের রন্ধন, ভোজন, শয়ন সব নামমাত্র, কেবল "সু ঔ জস্, অম্ ঔ শস্" ইত্যাদিতে মন। নিশি বুঝিল যে, প্রফুল্ল সেই "দুই নূতন"কে ভুলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া

বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার পর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্নপ্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোব্‌রার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে—সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লের কষ্ট নাই—মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে সকল দিন এত যুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোব্‌রার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত; সুতরাং গোব্‌রার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বমত রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের নুন লঙ্কা ভাত। দুই জনে একত্র বসিয়া খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি দুই জনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভাল সামগ্রী বড় খাইত না—গোব্‌রার মাকে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাট কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে। প্রফুল্ল সে সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বাহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত।

কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল; ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, "কেশ গন্ধ-তৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্ব্বদা রঞ্জিত করিবে।" পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না।

প্রথম বৎসরে তূলার তোষকে তূলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালীর বালিশ, বিচালীর বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমি-শয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।

প্রথম বৎসরে ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুই দিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফু.. রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।" প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, শেষ বলিল, "ঠাকুর, আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।"

ভ। এটি নইলে নয়।

প্র। সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না।* তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল। আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায়, অবনত মুখে তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে কোন বিধি নিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, নিষ্প্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল্ল পুরুষ মানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর দিনে মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে মাত্র প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছু দিল না। ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া, ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন, "পাঁচ বৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন,

* এ কথা Warren Hastings নিজে লিখিয়াছেন।

তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব,—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও। আহার আমি আর যোগাইব না,—তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই। কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি,—আর একবার বলি। এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।"

ভবানী বলিল, "ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম, অসক্ত হইয়া করিতে হইবে। মনে আছে ত, ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়-সংযম। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোমাকে তাহা শিখাইয়াছি, এখন আর বেশী বলিতে হইবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনও তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

এখন বল দেখি মা, তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভ। সব?

প্র। সব।

ভ। ঠিক তাহা হইলে কর্ম্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহ রক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও

আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহ রক্ষা করিবে। আর সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কি প্রকারে?

প্র। শিখিয়াছি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত। অতএব সর্ব্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব।

ভ। ভাল ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥" *

কিন্তু এই সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তঃ[illegible]মি পারিবে?

প্র। এত দিন কি শিখিলাম?

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখন কখন কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশ-বিন্যাস, কিছু ভোগ-বিলাসের ঠাট প্রয়োজন হইবে। সে বড় [illegible]। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। সে কি রকম?

ভ। শোন। আমি ত ডাকাইতি করি। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভ। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি?

ভ। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ, ৩০—৩২।

ভ। এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইঙ্গরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া ?

ভ। শুন, বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুই দিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে ?"

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল। সে ভবানী ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিল। বলিল, "আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।"

ভ। এই কাজে দোকানদারি চাই, বলিতেছিলাম। যদি আমার সঙ্গে যাও, কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনীবেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।

প্র। কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম্ম তাঁহার, আমার নহে। কর্ম্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কর্ম্মের জন্য যাহা করিতে হয়, করিব।

ভবানী ঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে সদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক, তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাণ দিয়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার। তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত। যাহা হৌক, এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবনতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই। প্রফুল্লের অন্য শিক্ষা হইয়াছে। কর্ম্মশিক্ষা হয় নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া কর্ম্মশিক্ষা হৌক।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। যে দিন প্রফুল্লকে বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভাল গেল না। দেশের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুঠিয়া লইল। সে বার দেবী সিংহের খাজানা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেষ্টিংস্ সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্ম্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ; বেচা কেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকার মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকি খাজানা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবী সিংহের পীড়াপীড়িতে, কয়েদের আশঙ্কায়, হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল। কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না—বুনিয়াদি চাল খাটো করা যায় না। সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন এক দিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন, "মা! তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।" হরবল্লভ তাহারই একজন। দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়া কর্ম্ম, দান ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্ব্বমতই হইতে লাগিল—বরং ডাকাইতে চালান লুঠিয়া লওয়া অবধি লাঠিয়ালের খরচটা কিছু বাড়িয়াছিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারি খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয় আশয় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে আসল ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না—শেষ হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় ধুম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ী, তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ী। তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী সচরাচর আসে না। পুকুরে পুকুরে, মাছমহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্ম্যে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে-মাগীদের হাঁটাহাঁটিতে পুকুরের জল কালী হইয়া যাইতে লাগিল। মাছ চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া দিল। দই, দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইসের জ্বালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক্ হইয়া উঠিল; সে কখনও এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারীর কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল; কাহারও পছন্দ হয় না, কোন্ ধুতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়ে মহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহার গহনা আছে, তারা সে সকল সারাইতে, মাজিতে, ঘষিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁকা কিনিয়া, সোণা রূপা চাহিয়া চিন্তিয়া এক রকম বেশ-ভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল—নহিলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পশার আছে—তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাসা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন; যাহাদের পশার নাই, তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল। কথার তামাসা পরে হবে—খাবার তামাসা আগে। আহার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল। বহুতর কৃত্রিম আহার্য্য, পানীয়, ফল-মূল প্রস্তুত হইতে লাগিল। মধুর অধরগুলি মধুর হাসিতে ও সাধের মিশিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু যার জন্য এত উদ্যোগ, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ আহ্লাদের জন্য শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। বাপের গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে—রক্ষার

উপায় নাই। কেহ টাকা ধার দেয় না। শ্বশুরের টাকা আছে—শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারে, তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছেন।

শ্বশুর বলিলেন, "বাপু হে, আমার যে টাকা, সে তোমারই জন্য আছে—আমার আর কে আছে, বল? কিন্তু টাকাগুলি যত দিন আমার হাতে আছে, তত দিন আছে,—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাক্‌বে? মহাজনে খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "হৌক—আমি ধনের প্রত্যাশী নই—আমার বাপকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।"

শ্বশুর রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "তবে আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।"

তখন সাগরের পিতা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর কড়া কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর তল্পী তল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া, সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তার পর সাগরের পালা।

বধূ শ্বশুরবাড়ী আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া সেকালে যতটা দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা নয়। সাগরের সঙ্গে নিভৃতে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। সাগর ব্রজেশ্বরের পায় পড়িল, বলিল, "আর এক দিন থাক—আমি ত কোন অপরাধ করি নাই?"

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। রাগের সময় শারীরিক ক্রিয়াসকল বড় জোরে জোরে হয়, আর হাতপায়ের গতিও ঠিক অভিমত রূপ হয় না। একটা করিতে বিকৃতি জন্য আর একটা হইয়া পড়ে। সেই কারণে, আর কতকটা সাগরের ব্যস্ততার কারণ, পা সরাইয়া লইতে প্রমাদ ঘটিল। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "কি? আমায় লাথি মারিলে?"

বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না,—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোখ মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল,—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, "যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড়মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়মানুষ বাপও এ পা এক দিন পূজা করিয়াছিলেন।"

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল। বলিল, "ঝক্‌মারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

ব্র। পাল্‌টে লাথি মারবে না কি?

সা। আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানেলা হইতে কে বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া, চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া, রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

ব্রজেশ্বরও রাগে সপ্তমে চড়িয়া কোন দিকে না চাহিয়া বলিল, "আমারও সেই কথা। যত দিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, তত দিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।"

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। এমন সময়ে সাগর যে ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘরে একজন পরিচারিকা, ব্রজেশ্বর গেলে পর সাগরের কি অবস্থা হইয়াছে, ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ভিতরে প্রবেশ করিল, ছুতানতা করিয়া দুই একটা কাজ করিতে লাগিল। তখন সাগরের মনে পড়িল যে, জানালা হইতে কে কথা কহিয়াছিল। সাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই জানেলা হইতে কথা কহিয়াছিলি?"

সে বলিল, "কই না?"

সাগর বলিল, "তবে কে জানেলায় দেখ্‌ত।"

তখন সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপবতী ও তেজস্বিনী এক জন স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে বলিল, "জানালায় আমি ছিলাম।"

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"

তখন সে স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা কি কেউ আমায় চেন না?"

সাগর বলিল, "না—কে তুমি?" তখন সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "আমি দেবী চৌধুরাণী।"

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁপিতে কাঁপিতে আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। কাঁকালের কাপড় খসিয়া পড়িল।

দেবী চৌধুরাণী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চুপ রহো, হারামজাদি! খাড়া রহো।"

পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিতেছিল। সাগরের মুখেও কথা ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে বুড়ো কে না শুনিয়াছিল? সে নাম অতি ভয়ানক।

কিন্তু সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল। তখন দেবী চৌধুরাণীও হাসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে, সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে, কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে, একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানাবর্ণে চিত্রিত; তাহাতে

কত রকম মূরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল ডাণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিল্‌টি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিল্‌টি করা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা এক্ পাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—এক জন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যূঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা-বাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর-সকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গৰ্জ্জিয়া উঠে,—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদী-কল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তার পর দুই একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া, সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কাণের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল।

এ ব্যক্তি পুরুষ। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন; ভারি রকমের এক যোড়া চৌগোপ্পা আছে। গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল, "দেখিতে পাইতেছ না?"

পুরুষ বলিল, "কিছু না। আসিতেছে কি?"

গালিচার উপর একটা ছোট দূরবীণ পড়িয়াছিল। দূরবীণ তখন ভারতবর্ষে নূতন আমদানী হইতেছিল। দূরবীণ লইয়া সুন্দরী ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দূরবীণ চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিল। শেষ এক স্থানে আর একখানি বজরা দেখিতে পাইয়া বলিল, "দেখিয়াছি—টেঁকের মাথায়—ঐ কি?"

উ। এ নদীতে আজকাল আর কোন বজরা আসিবার কথা নাই।

পুরুষ পুনর্ব্বার দূরবীণ দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

যুবতী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "রঙ্গরাজ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "আজ্ঞা?"

"দেখ কি?"

"কয় জন লোক আছে, তাই দেখি।"

"কয় জন?"

"ঠিক ঠাওর পাই না। বেশী নয়। খুলিব?"

"খোল—ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও।" তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, "ছিপ খোল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বজরার কাছে তেঁতুলগাছের ছায়ায় আর একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিপ—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশী চৌড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশ জন একেবারে উঠিয়া বসিল। বাঁশের চেলা তুলিয়া সকলেই এক এক গাছা সড়্কি ও এক এক খানা ছোট ঢাল বাহির করিল। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না—সবাই আপনার নিকট চেলার উপরে সাজাইয়া রাখিল। রাখিয়া সকলেই এক এক খানা "বোটে" হাতে করিয়া বসিল।

নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগাইল। রঙ্গরাজ তখন নিজে পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময়ে যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন।"

"মনে আছে" বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এ দিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীণে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খর-স্রোতে তীব্রবেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশী উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইলে, ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশখানা বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, সেই বজরার ছাদের উপরে আট জন হিন্দুস্থানী রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে কেহ রাত্রিকালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত না। আট জনের মধ্যে, দুই জন হাতিয়ারবন্ধ হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয় জন মধুর দক্ষিণ বাতাসে চাঁদের আলোতে কাল দাড়ি ছড়াইয়া,

সুনিদ্রায় অভিভূত ছিল। যাহারা পাহারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমত হাঁকিল, "ছিপ তফাৎ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "তোর দরকার হয়, তুই তফাৎ যা।"

প্রহরী দেখিল, বেগোছ। ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। রঙ্গরাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, "কি পাঁড়ে ঠাকুর! একটা ছর্‌রাও নাই? ধার দিব?"

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তার পর বন্দুক নামাইয়া বলিল, "তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।" এই কথা বলিতে বলিতে রঙ্গরাজ বন্দুক রাখিয়া, তীর ধনু লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ি উড়িয়া গেল। প্রহরী "রাম রাম!" শব্দ করিতে লাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশ বার জন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার সমেত বজরার উপর উঠিয়া পড়িল। যে ছয় জন হিন্দুস্থানী নিদ্রিত ছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজে জাগরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। যে দুই জন আগে হইতে জাগ্রত ছিল, তাহারা লড়াই করিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুরবাড়ী হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ্। এ কেবল তাঁহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! দ্বার খুলুন।"

ভিতর হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল, "কে? এত গোল কিসের?"

রঙ্গরাজ বলিল, "গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাইত পড়িয়াছে।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া, পরে ডাকিতে লাগিল, "পাঁড়ে! তেওয়ারি! রামসিং!"

রামসিং ছাদের উপর্ হইতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! শালা লোক্ সব্ কোইকো বাঁধ্‌কে রাক্‌খা।"

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীরপুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া, বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এ বড় ভ্রম। ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।”

শুনিয়া রঙ্গরাজও ঈষৎ হাসিল। বলিল, “আমারও সেই মত; এখন দ্বার খুলিবেন বোধ হয়।”

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?”

রঙ্গরাজ। আমি একজন ডাকাইত মাত্র। দ্বার খোলেন এই ভিক্ষা।

“কেন দ্বার খুলিব?”

রঙ্গরাজ। আপনার সর্ব্বস্ব লুটপাট করিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, “কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালা পাইলে? আমার হাতে দোনলা বন্দুক আছে—তৈয়ার, যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রাণ লইব।”

রঙ্গরাজ। এক জন প্রবেশ করিব না—কয় জনকে মারিবেন? আপনিও ব্রাহ্মণ—আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে। মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কি?

ব্রজেশ্বর বলিল, “সে পাপটা না হয় আমিই স্বীকার করিব।”

এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়্ মড়্ শব্দ হইল। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া, একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুই বার পদাঘাত করিল। কবাট ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া, রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে রঙ্গরাজ তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুই জনেই তুল্য বলশালী, তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। ব্রজেশ্বর ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতে, রঙ্গরাজ বন্দুক কাড়িয়া লইল। ব্রজেশ্বর তখন দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমুদায় বলের সহিত রঙ্গরাজের মাথায় এক ঘুষি তুলিল। রঙ্গরাজ ঘুষিটা হাতে ধরিয়া ফেলিল। বজরার এক দিকে অনেক অস্ত্র ঝুলান ছিল। এই সময়ে ব্রজেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্য হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া, হাসিয়া বলিল, “দেখ ঠাকুর, ব্রহ্মহত্যায় আমার ভয় নাই।” এই বলিয়া রঙ্গরাজকে কাটিতে ব্রজেশ্বর তরবারি উঠাইল। সেই সময়ে আর চারি পাঁচ জন দস্যু মুক্তদ্বারে কামরার ভিতর প্রবেশ

করিয়া, তাহার উপর পড়িল। উত্থিত তরবারি হাত হইতে কাড়িয়া লইল। দুই জনে দুই হাত চাপিয়া ধরিল—একজন দড়ি লইয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "বাঁধিতে হইবে কি?" তখন ব্রজেশ্বর বলিল, "বাঁধিও না। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। কি চাও বল—আমি দিতেছি।"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার যাহা কিছু আছে, সব লইয়া যাইব। কিছু ছাড়িয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু যে কিল তুলিয়াছিলেন—আমার মাথায় লাগিলে মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত—এক পয়সাও ছাড়িব না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।"

ব্রজেশ্বর এ কথা বলিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা জিনিষ পত্র বজরা হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন প্রায় পঁচিশ জন লোক বজরায় উঠিয়াছিল। জিনিষ পত্র বজরায় বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ মাত্র। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা সেই সকল দ্রব্য ছিপে তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী রঙ্গরাজকে বলিল, "সব জিনিষ লইয়াছ—আর কেন দিক্ কর, এখন স্বস্থানে যাও।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "যাইতেছি। কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ব্র। সে কি? আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গ। আমাদের রাণীর কাছে।

ব্র। তোমাদের আবার রাণী কে?

রঙ্গ। আমাদের রাজরাণী।

ব্র। তিনি আবার কে? ডাকাইতের রাজরাণী ত কখন শুনি নাই।

রঙ্গ। দেবী রাণীর নাম কখনও শুনেন নাই?

ব্র। ও হো! তোমরা দেবী চৌধুরাণীর দল?

রঙ্গ। দলাদলি আবার কি? আমরা রাণীজির কার্‌পর্‌দাজ।

ব্র। যেমন রাণী, তেমন কার্‌পর্‌দাজ। তা, আমাকে রাণী দর্শনে যাইতে হইবে কেন? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় ত কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।

ব্র। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজরাণী একটা দেখবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি না কি যুবতী?

রঙ্গ। তিনি আমাদের মা—সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্র। চল, তবে ভগবতী-দর্শনে যাই।

এই বলিয়া, ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, বজরার মাঝিমাল্লা সকলে ভয়ে জলে পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান ও মান ও দৌলৎ ও ইজ্জৎ সব বজায় আছে। তোমরা বড় হুঁসিয়ার!"

মাঝিরা তখন একে একে বজরায় উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার দ্বারবান্দের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া, আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখনই আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।"

ব্রজেশ্বর দ্বারবান্দিগকে সেইরূপ বুঝাইয়া দিলেন। আর ভরসা দিলেন যে, তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহাদের ডালরুটির বরাদ্দ বাড়িবে। তখন ব্রজেশ্বর ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাক। কোথাও যাইও না বা কিছু করিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন। ছিপের নাবিকেরা "দেবী রাণী-কি জয়" হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কত দূর লইয়া যাইবে—তোমার রাণীজি কোথায় থাকেন?"

রঙ্গ। ঐ বজরা দেখিতেছ না? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা? আমি মনে করিয়াছিলাম, ওখানা ইঙ্গরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুটিতে আসিয়াছে। তা অত বড় বজরা কেন?

রঙ্গ। রাণীকে রাণীর মত থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্র। এত কামরায় কে থাকে?

রঙ্গ। একটায় দরবার। একটায় রাণীর শয়নঘর। একটায় চাকরাণীরা থাকে। একটায় স্নান হয়। একটায় পাক হয়। একটা ফাটক। বোধ হয়, আপনাকে আজ সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এই কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। দেবী রাণী ওর্‌ফে দেবী চৌধুরাণী তখন আর ছাদের উপর নাই। যতক্ষণ তাহার লোকে ডাকাইতি করিতেছিল, দেবী ততক্ষণ ছাদের উপর বসিয়া, জ্যোৎস্নালোকে বীণা বাজাইতেছিল। তখন বাজনাটা বড় ভাল হইতেছিল না—বেসুর, বেতাল, কি বাজিতে কি বাজে—দেবী অন্যমনা হইতেছিল। তার পরে যাই ছিপ ফিরিল, দেবী অমনি নামিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল।

এ দিকে রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া, "রাণীজি-কি জয়" বলিল। দ্বারে রেসমী পরদা ফেলা আছে—ভিতর দেখা যায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ?"

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। তোমাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না।

দেবী। তাহাদের কেহ খুন হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না—আপনার আজ্ঞামত কাজ হইয়াছে।

দেবী। তাহাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। দুইটা হিন্দুস্থানী দুই একটা আঁচড় খেয়েছে। কাঁটা ফোটার মত।

দেবী। মাল?

রঙ্গ। সব আনিয়াছি। মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল। ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়।

ব্রজেশ্বর যেরূপ লোক, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন বোধ হয়। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি বালককাল হইতে জানেন না। যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর-বাঙ্গালা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, "মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।" হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথায় উত্তর দিলেন, "পরিচয় লইয়া কি হইবে? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না।"

দেবী। হইবে বৈ কি? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে। (তবু গলাটা ধরা ধরা।)

ব্রজ। সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

দেবী পরদার আড়ালে; কেহ দেখিল না যে, দেবী এই কথা বলিবার সময় চোখ মুছিল।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুঃখিরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কি না, দেখিবার জন্য।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।

দেবী। তাও না।

ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে আর একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, "গলাটা ধ'রে গেছে যে?"

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না—বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল ছড়্ ছড়্ করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন ঐ স্ত্রীলোককে কাণে কাণে বলিল, "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা ক'। সব জানিস্ ত ?"

এই বলিয়া দেবী সে কামরা হইতে উঠিয়া অন্য কামরায় গেল। ঐ স্ত্রীলোকটি দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া, ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই বামনশূন্য বামনী—নিশি ঠাকুরাণী।

নিশি বলিল, "এইবার ঠিক্ বলেছ—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাঁধিল। পরদার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল, এ সে বুঝি নয়। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল—এ বুঝি তত মিঠে নয়। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন—আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কি দরে আমাকে ছাড়িবেন ?"

নিশি। এক কড়া কাণা কড়ি। সঙ্গে আছে কি ? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।

ব্রজ। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা হইতে আনিয়া দিন।

ব্রজ। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কাণা কড়িও নাই।

নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করিয়া আনুন।

ব্রজ। মাঝিরাও কাণা কড়ি রাখে না।

নিশি। তবে যত দিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া দিতে পারেন, তত দিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তার পর শুনিলেন, কামরার ভিতরে আর একজন কে—কণ্ঠে সেও বোধ হয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে, "রাণীজি ! যদি এক কড়া কাণা কড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কাণা কড়ি দিতেছি। আমার কাছে উহাকে বিক্রী করুন।"

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রাণী উত্তর করিল, "ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা নিয়ে তুমি কি করিবে? ব্রাহ্মণ, জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।"

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন,—রমণী বলিল, "আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই। আমাকে রাঁধিয়া দিবে।"

তখন নিশি ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুনিলেন,—আপনি বিক্রী হইলেন—আমি কাণা কড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কই তিনি?"

নিশি। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর অনুমতি পাইয়া, পরদা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল। কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারু চিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্ত জনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ; মহিষাসুরের যুদ্ধ; দশ অবতার; অষ্ট নায়িকা; সপ্ত মাতৃকা; দশ মহাবিদ্যা; কৈলাস; বৃন্দাবন; লঙ্কা; ইন্দ্রালয়; নবনারী-কুঞ্জর; বস্ত্রহরণ; সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিন দিকে সেইরূপ বালিশ; সোণার আতরদান, তারই গোলাব-পাশ, সোণার বাটা, সোণার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশীকৃত সুগন্ধি ফুল; সোণার আলবোলা; পোরজরের সটকা—সোণার মুখনলে মতির থোপ দুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুই পাশে দুই রূপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোণার শিকলে লট্‌কান আছে। চারি কোণে চারিটি রূপার পুতুল, চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে।—মসনদের উপর এক জন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু

তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ—আর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ অনুভূত হইতেছে; কাণের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে—তার অপেক্ষা বিস্তৃত চক্ষের তীব্র কটাক্ষ আরও ঝলসিতেছে। স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার-কামরায় প্রবেশ করিয়া, শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীজিকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?"

সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি রাণীজি নই।"

ব্রজেশ্বর দেখিল, এতক্ষণ ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, এ তাহার গলার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতে পারে; কেন না, বেস্ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এ স্ত্রীলোক কণ্ঠ বিকৃত করিয়া কথা কহিতেছে। মনে করিল, বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা, মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়েমানুষ হইয়া ডাকাইতি করে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায়?"

সুন্দরী বলিল, "তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া, তিনি শুইতে গিয়াছেন। রাণীতে তোমার কি প্রয়োজন?"

ব্র। তুমি কে?

সুন্দরী। তোমার মুনিব।

ব্র। আমার মুনিব?

সুন্দরী। জান না, এই মাত্র তোমাকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়াছি?

ব্র। সত্য বটে। তা তোমাকেই কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?

সুন্দরী। আশীর্ব্বাদের রকম আছে না কি?

ব্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করিতে হয়,—বিধবাকে অন্য রূপ। পুত্রবতীকে—

সুন্দরী। আমাকে "শিগ্‌গির মর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

ব্র। সে আশীর্ব্বাদ আমি কাহাকেও করি না—তোমার একশ তিন বছর পরমায়ু হৌক।

সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে?

ব্র। আগে এক দিন্ ত রাঁধি। খেতে পার ত, না হয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।

সুন্দরী। তবে বসো—কেমন রাঁধিতে জান, পরিচয় দাও।

ব্রজেশ্বর তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি ?”

ব্র। তা ত তোমরা সকলেই জান, দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার াাম কি ? গলা অত মোটা করিয়া কথা কহিতেছ কেন ? তুমি কি চেনা মানুষ ?

সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে ‘আপনি’ ‘মশাই’ আর ‘আজ্ঞে’ বলিবে।

ব্র। আজ্ঞে, তাই হইবে। আপনার নাম ?

সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরিতে াারিবে না। বরং বল ত আমিও তোমার নাম ধরিব না।

ব্র। তবে কি বলিয়া ডাকিলে আমি ‘আজ্ঞা’ বলিব ?

পাঁচকড়ি। আমি ‘রামধন’ বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি আমাকে ‘মুনিব াকুরুণ’ বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ী কোথায় ?

ব্র। এক কড়ায় কিনিয়াছ—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি ?

পাঁচ। ভাল, সে কথা নাই বলিলে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে াারিব। রাঢ়ী, না বারেন্দ্র, না বৈদিক ?

ব্র। হাতের ভাত ত খাইবেন—যাই হই না।

পাঁচ। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও—তাহা হইলে তোমাকে অন্য কাজে দিব।

ব্র। অন্য কি কাজ ?

পাঁচ। জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে—কাজের অভাব কি !

ব্র। আমি রাঢ়ী।

পাঁচ। তবে তোমায় জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে হইবে—আমি বারেন্দ্র।—তুমি রাঢ়ী—কুলীন, না বংশজ ?

ব্র। এ কথা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ যুটিবে কি ? আমি কৃতদার।

পাঁচ। কৃতদার ? কয় সংসার করিয়াছেন ?

ব্র। জল তুলিতে হয়—জল তুলিব—অত পরিচয় দিব না।

তখন পাঁচকড়ি দেবী রাণীকে ডাকিয়া বলিল, “রাণীজি ! বামুন ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।”

নিশি অপর কক্ষ হইতে উত্তর করিল, “বেত লাগাও।”

তখন দেবীর একজন পরিচারিকা শপাৎ করিয়া একগাছা লিক্‌লিকে সরু বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া ঢাকাই রুমালের ভিতর মধুর অধর চারু দন্তে টিপিয়া বিছানায় বার দুই বেতগাছা আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, "দেখিয়াছ ?"

ব্রজেশ্বর হাসিল। বলিল, "আপনারা সব পারেন। কি বলিতে হইবে বলিতেছি।"

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কি হইবে ? তোমার রান্না ত খাইব না। তুমি আর কি কাজ করিতে পার, বল ?

ব্র। হুকুম করুন।

পাঁচ। জল তুলিতে জান ?

ব্র। না।

পাঁচ। কাঠ কাটিতে জান ?

ব্র। না।

পাঁচ। বাজার করিতে জান ?

ব্র। মোটামুটি রকম।

পাঁচ। মোটামুটিতে চলিবে না। বাতাস করিতে জান ?

ব্র। পারি।

পাঁচ। আচ্ছা, এই চামর নাও, বাতাস কর।

ব্রজেশ্বর চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। পাঁচকড়ি বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ জান ? পা টিপিতে জান ?"

ব্রজেশ্বরের দুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া, একটি ছোট রকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যুনেত্রীদিগের কোন রকমে খুসি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সে অভিপ্রায়ও ছিল। অতএব পাঁচকড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব, সে ত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপ না" বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আল্‌তাপরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন, কি করেন। ব্রজেশ্বর কাজেই দুই হাতে 'পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, "এ কাজটা ভাল হইতেছে না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি।"

তখন দুষ্টা পাঁচকড়ি ডাকিল, "রাণীজি! একবার এ দিকে আসুন।"

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইল। পা নামাইয়া দিল। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, "সে কি? পিছাও কেন?" পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইলেন,—"সে কি? এ গলা ত চেনা গলাই বটে।" সাহস করিয়া ব্রজেশ্বর পাঁচকড়ির মুখঢাকা রুমালখানা খুলিয়া লইলেন। পাঁচকড়ি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি? এ কি? তুমি—তুমি সাগর?"

পাঁচকড়ি বলিল, "আমি সাগর। গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য—না? যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গর্‌গর্ করিয়া চলিয়া গেলে। যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ। এখন আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিতে পার, আমায় ত্যাগ কর, আর পায়ে রাখ—এখন জানিলে, আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি এখানে কেন?" সাগর বলিল, "সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন?"

ব্র। তাই কি? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রাণীর সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া আমার পা টিপাইব বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশি আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারের জাঁকজমক দেখিয়া মনে করিল, "এই দেবী চৌধুরাণী।" ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশি বলিল, "স্ত্রীলোক ডাকাইত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই—আপনি বসুন। এখন শুনিলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাইতি করিয়াছি? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে; এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার নৌকায়

ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিয পত্র এক কপর্দ্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দ্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কি হইবে? এ কি বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন কি? মনে করুন, আপনি উহার এক কড়ার কেনা গোলাম।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! ব্রজেশ্বর বিহ্বল হইল। তবে ডাকাইতি সব মিথ্যা, এরা ডাকাইত নয়! ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিল, ভাবিয়া শেষে বলিল, "তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম, দেবী চৌধুরাণীর দলে আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।"

তখন নিশি বলিল, "সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন,"—কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেশ্বর বলিল, "'দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন'—তবে আপনি কি দেবী রাণী নন?"

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজিকে দেখিতে চান, তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাইতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাইতি করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হইল।

ব্র। আসিল কি প্রকারে?

নিশি। রাণীজির সঙ্গে।

ব্র। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—সেখান হইতেই আসিতেছি। কই, সেখানে ত রাণীজিকে দেখি নাই?

নিশি। রাণীজি আপনার পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্র। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কি প্রকারে?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন ত? পঞ্চাশ বোটে।

ব্র। তবে আপনারাই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না?

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাহাকে না বলিয়া রাণীর সঙ্গে আসিয়াছে—এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে? আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্র। ভাল, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন।

"দিতেছি" বলিয়া নিশি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন সাগরকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর! তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ?"

মুখে অঞ্চল দিয়া—এবার ঢাকাই রুমাল নহে—কাপড়ের যেখানটা হাতে উঠিল, সেইখানটা মুখে ঢাকা দিয়া সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি ভারি কান্না কাঁদিল। চুপি চুপি—পাছে দেবী শোনে।

কান্না থামিলে ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি আমায় ডাকিলে না কেন? ডাকিলেই সব মিটিয়া যাইত।"

সাগর কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কপালের ভোগ, কিন্তু আমি নাই ডাকিয়াছি—তুমিই বা আসিলে না কেন ?"

ব্র। তুমি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলে—না ডাকিলে যাই কি বলিয়া ?

এই সকল কথা-বার্ত্তা যথাশাস্ত্র সমাপন হইলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর! তুমি ডাকাইতের সঙ্গে কেন আসিলে ?"

সাগর বলিল, "দেবী—সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়, পূর্ব্বে জানা শুনা ছিল। তুমি চলিয়া আসিলে, সে গিয়া আমার বাপের বাড়ী উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে বলিল, 'কাঁদ কেন ভাই—তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দিব। আমার সঙ্গে দুই দিনের তরে এসো।' তাই আমি আসিলাম। দেবীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোমার সঙ্গে আমি পলাইয়া চলিলাম, এই কথা আমি চাকরাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। তোমার জন্য এই সব আল-বোলা, শট্‌কা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছি—একবার তামাক টামাক খাও, তার পর যেও।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "কই, যে মালিক, সে ত কিছু বলে না।"

তখন সাগর দেবীকে ডাকিল। দেবী আসিল না—নিশি আসিল।

নিশিকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এখন আপনি ছিপ হুকুম করিলেই যাই।"

নিশি। ছিপ তোমারই। কিন্তু দেখ, তুমি রাণীর বোনাই—কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না—কেবল অপমানই করিলাম, এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাইত বলিয়া আমাদের কি হিন্দুয়ানি নাই ?

ব্র। কি করিতে বলেন ?

নিশি। প্রথমে উঠিয়া ভাল হইয়া বসো।

নিশি মসনদ দেখাইয়া দিল। ব্রজেশ্বর শুধু গালিচায় বসিয়াছিল। বলিল, "কেন, আমি বেস্ বসিয়া আছি।"

তখন নিশি সাগরকে বলিল, "ভাই, তোমার সামগ্রী তুমি তুলিয়া বসাও। জান, আমরা পরের দ্রব্য ছুঁই না।" হাসিয়া বলিল, "সোণা রূপা ছাড়া।"

ব্র। তবে আমি কি পিতল কাঁসার দলে পড়িলাম?

নিশি। আমি ত তা মনে করি—পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর সংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সকৃড়ি হয়—মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া, ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটি বাটি তফাৎ কর—কি জানি, যদি সকৃড়ি হয়।

ব্র। একে ত পিতল কাঁসা—তার মধ্যে আবার ঘটি বাটি! ঘড়াটা গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হইবারও যোগ্য নই?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারি না—আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষমানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পূরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।

নিশি বলিল, "ঠিক বলিয়াছিস্—তাই মেয়েমানুষে এ জিনিষ গলায় বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে।—নে ভাই, তোর কলসী, কলসী-পীড়ির উপর তুলিয়া রাখ্।"

ব্র। কলসী মানে মানে আপনি পীড়ির উপর উঠিতেছে।

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনি মসনদের উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ দুই দিক্ হইতে দুই জন পরিচারিকা—সুন্দরী যুবতী, বহুমূল্য বসন-ভূষণ-ভূষিতা—দুইটা সোণা-বাঁধা চামর হাতে করিয়া, ব্রজেশ্বরের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞা না পাইয়াও তাহারা ব্যজন করিতে লাগিল। নিশি তখন সাগরকে বলিল, "যা, এখন তোর স্বামীর জন্য আপন হাতে তামাকু সাজিয়া লইয়া আয়।"

সাগর ক্ষিপ্রহস্তে সোণার আলবোলার উপর হইতে কলিকা লইয়া গিয়া, শীঘ্র মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া আনিল। আলবোলায় চড়াইয়া দিল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "আমাকে একটা হুঁকায় নল করিয়া তামাকু দাও।"

নিশি বলিল, "কোন শঙ্কা নাই—ঐ আলবোলা উৎসৃষ্ট নয়। কেহ কখন উহাতে তামাকু খায় নাই। আমরা কেহ তামাকু খাই না।"

ব্র। সে কি? তবে এ আলবোলা কেন?

নিশি। দেবীর রাণীগিরির দোকানদারি—

ব্র। তা হৌক—আমি যখন আসিলাম, তখন যে তামাকু সাজা ছিল—কে খাইতেছিল?

নিশি। কেহ না—সাজাও দোকানদারি।

ঐ আলবোলা সেই দিন বাহির হইয়াছে—ঐ তামাকু সেই দিন কেনা হইয়া আসিয়াছে—সাগরের স্বামী আসিবে বলিয়া। ব্রজেশ্বর মুখনলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন —অভুক্ত বোধ হয়। তখন ব্রজেশ্বর ধূমপানের অনির্ব্বচনীয় সুখে মগ্ন হইলেন। নিশি তখন সাগরকে বলিল, "তুই পোড়ারমুখী, আর দাঁড়াইয়া কি করিস্—পুরুষমানুষে হুঁকার নল মুখে করিলে আর কি স্ত্রী পরিবারকে মনে ঠাঁই দেয়? যা, তুই গোটাকত পান সাজিয়া আন। দেখিস্—আপন হাতে পান সাজিয়া আনিস্—পরের সাজা আনিস্ না—পারিস্ যদি একটু ওষুধ করিস্।"

সাগর বলিল, "আপন হাতেই সাজা আছে—ওষুধ জানিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?"

এই বলিয়া সাগর চন্দন কর্পূর চুয়া গোলাবে সুগন্ধি পানের রাশি সোণার বাটা পুরিয়া আনিল। তখন নিশি বলিল, "তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস্—কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।"

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল, "সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাপ করিও।"

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না—সাগর বড় তাড়াতাড়ি আর এক কামরায় ঝাঁট দিয়া, জলের হাতে মুছিয়া, একখানা বড় ভারী পুরু আসন পাতিয়া চারি পাঁচখানা রূপার থালে সামগ্রী সাজাইয়া ফেলিল। স্বর্ণ-পাত্রে উত্তম সুগন্ধি শীতল জল রাখিয়া দিল। জানিতে পারিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে বলিল, "ঠাঁই হইয়াছে—উঠ।" ব্রজেশ্বর উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিশির কাছে যোড় হাত করিল। বলিল, "ডাকাইতি করিয়া ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়াছ—সে অত্যাচার সহিয়াছে—কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সহিবে না—দোহাই।"

স্ত্রীলোকেরা মার্জ্জনা করিল না। ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইল। সাগর তখন নিশিকে বলিল, "ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।" নিশি বলিল, "দক্ষিণা রাণী স্বয়ং দিবেন। এসো ভাই, রাণী দেখিবে এসো।" এই বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে আর এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবারের কামরার মত অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশীর ভাগ, একখানা সুবর্ণমণ্ডিত মুক্তার ঝালরযুক্ত ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে সকল দিকে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রথিতনাম্নী দেবীকে দেখিবেন। দেখিলেন, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও সাগরে, ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এ স্থিরা, ধীরা—নিম্নদৃষ্টি, লজ্জাবনতমুখী। নিশি ও সাগর, বিশেষতঃ নিশি সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারমণ্ডিতা, বহুমূল্য বসনে আবৃতা,—কিন্তু ইহার তা কিছুই নাই। দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসায় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে, দেবী সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া, হাতে কেবল একখানি মাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল; শেষে বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি তিরস্কার করিয়াছিল; "ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!" তাই এ বেশ পরিবর্ত্তন।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে, দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল—কই, আর কেহ ত প্রণাম করে নাই? দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিল, যথার্থ দেবীমূর্ত্তি! এমন আর কখন দেখিয়াছে কি? হাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরও মধুর,—কেন না, দেবীমূর্ত্তি তখন বালিকার মূর্ত্তি—ব্রজেশ্বরের তখন প্রথম যৌবন। হায়! এ যদি সেই হইত! এ মুখ দেখিয়া, ব্রজেশ্বরের সে মুখ মনে পড়িল, কিন্তু দেখিলেন, এ মুখ সে মুখ নহে। তার কি কিছুই এতে নাই? আছে বৈ কি—কিছু আছে। ব্রজেশ্বর তাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। সে ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে—তবে মানুষে মানুষে কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে যে, এক জনকে দেখিলে আর এক জনকে মনে পড়ে। এ তাই না ব্রজ?

ব্রজ তাই মনে করিল। কিন্তু সেই সাদৃশ্যেই হৃদয় ভরিয়া গেল—ব্রজের চক্ষে জল আসিল, পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে আজ একটা কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইত। দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা।

প্রণাম করিয়া, নিম্ননয়নে দেবী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "আমার উপকারই করিয়াছেন।" বেশী কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই।

দেবী আরও বলিল, "আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্য্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

ব্র। স্ত্রীর মত কোন্ ধন? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন। ইহার বেশী আর কি দিবেন?

ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে? স্ত্রীর মত ধন আর নাই? তবে বাপ বেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন?

পালঙ্কের পাশে একটি রূপার কলসী ছিল—তাহা টানিয়া বাহির করিয়া, দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, "ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্রজ। আপনার বজরায় এত সোণা রূপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসীটা নিতে আপত্তি করিলে, সাগর আমায় বকিবে। কিন্তু একটা কথা আছে—

কথাটা কি—দেবী বুঝিল, বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।"

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের "বিদায়" বা "মর্য্যাদা" গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধ হয় নাই। কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এ কি এ? কলসীটা নিরেট না কি?"

দেবী। টানিবার সময়ে উহার ভিতর শব্দ হইয়াছিল—নিরেট সম্ভবে না।

ব্র। তাই ত? এতে কি আছে?

কলসীতে ব্রজেশ্বর হাত পূরিয়া তুলিল—মোহর। কলসী মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব?

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কি?

দেবী। কেন?

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্র। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয়, চুরি ডাকাতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম্ম হয় না; কেন না, এ টাকা নহিলে আমার বাপের জাতি রক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে পর ঐ টাকার আসল আর এক মোহর সুদ দেবসেবায় ব্যয় করিবেন।

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা যুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতেও পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি এক স্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশী করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, মোহরের ঘড়া ছিপে উঠাইয়া দিয়া আইসে। পরিচারিকারা ঘড়া ছিপে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিলেন। তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা বাকি আছে। এ ত কর্জ্জ দিলাম—মর্য্যাদা দিলাম কই?"

ব্র। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটা আঙ্গটি খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্যবদনে হাত পাতিলেন। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোলমাল হইয়া গেল, জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। শরীরে কাঁটা দিল—ভিতরে যেন অমৃতস্রোত ছুটিল। জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর, হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল। বিধাতা এক এক সময়ে এমনই বাদ সাধেন যে, সময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়।

তা, দেবী সেই মানসিক গোলযোগের সময় ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে ধীরে ধীরে আঙ্গটি পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে ফোঁটাদুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কি রকমে কি হইল, বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর ত জিতেন্দ্রিয়—কিন্তু মনের ভিতব কি একটা গোল বাঁধিযাছিল। সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল—বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা [illegible]য়াছিল—সে চোখের জল মোছানটাও বুঝি মনে পড়িল; এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাঁধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া—কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মত দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিলাম! এ কি প্রফুল্ল? সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে! ব্রজেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া, একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল। সাগরকে সঙ্গে লইয়াও গেল না। সাগর "ধর! ধর! আসামী পলায়!" বলিয়া, পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। ছিপ খুলিয়া ব্রজেশ্বরকে ও ব্রজেশ্বরের দুই রত্নাধার—একটি সাগর, আর একটি কলসী—ব্রজেশ্বরের নৌকায় পৌছাইয়া দিল।

এদিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল। তখন নিশি বলিল, "এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন?"

দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশি বলিল, "ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।"

দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তুমি যমের বাড়ী যাও।"

নিশি। আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার উপর যমেব অধিকার নাই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।

দেবী। সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না। এখন বজরা খুলিয়া দিতে বল। চার পাল উঠাও।

তখন সেই জাহাজের মত বজরা চারিখানা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সাগরের সঙ্গে কথা কহে না। দেখিল, দেবীর বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল, "বজরা কোথায় গেল?"

সাগর বলিল, "তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাহাকেও বলে না।"

ব্র। দেবী কে?

সা। দেবী দেবী।

ব্র। তোমার কে হয়?

সা। ভগিনী।

ব্র। কি রকম ভগিনী?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল্। মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা বড় বজরার সঙ্গে যাইতে পার?" মাঝিরা বলিল, "সাধ্য কি! ও নক্ষত্রের মত ছুটিয়াছে।" ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বর বজরা খুলিয়া চলিল।

সূর্য্যোদয় হইলে, সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী কি ডাকাতি করে?"

সা। তোমার কি বোধ হয়?

ব্র। ডাকাতির সমান ত সব দেখিলাম—ডাকাতি করিলে করিতে পারে, তাও দেখিলাম। তবু বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাতি করে।

সা। তবু কেন বিশ্বাস হয় না?

ব্র। কে জানে। ডাকাতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল?

সা। কেহ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে; কেহ বলে, মাটির ভিতর পোঁতা টাকা পাইয়াছে; কেহ বলে, দেবী সোণা করিতে জানে।

ব্র। দেবী কি বলে?

সা। দেবী বলে, এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্র। পরের ধন এত পাইল কোথায়?

সা। তা কি জানি।

ব্র। পরের ধন হ'লে অত আমিরি করে? পরে কিছু বলে না?

সা। দেবী কিছু আমিরি করে না। খুদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখ্লে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র,—কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ও কি?

সাগর ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে নূতন আঙ্গটি দেখিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া, দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্য্যাদা দিয়াছে।"

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিল। সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল, "ইহাতে দেবী চৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।"

ব্র। কই?

সা। ভিতরে—ফারসীতে।

ব্র। (পড়িয়া) এ কি এ? এ যে আমার নাম—আমার আঙ্গটি? সাগর। তোমাকে আমার দিব্য, যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা না কও। আমায় বল, দেবী কে?

সা। তুমি চিনিতে পার নাই, সে কি আমার দোষ? আমি ত এক দণ্ডে চিনিয়াছিলাম।

ব্র। কে! কে! দেবী কে?

সা। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। সাগর দেখিল, প্রথমে ব্রজেশ্বরের শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, তার পর একটা অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন—উচ্ছলিত সুখের তরঙ্গ, শরীরে দেখা দিল। মুখ প্রভাময়, নয়ন উজ্জ্বল অথচ জলপ্লাবিত, দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্ত্তিময়ী। তার পরই আবার সাগর দেখিল, সব যেন নিবিয়া গেল। বড় ঘোরতর বিষাদ আসিয়া যেন সেই প্রভাময় কান্তি অধিকার করিল। ব্রজেশ্বর বাক্যশূন্য, স্পন্দহীন, নিমেষশূন্য। ক্রমে সাগরের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজেশ্বর চক্ষু মুদিল। দেহ অবসন্ন হইল; ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। সাগর কাতর হইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কিছুই উত্তর পাইল না; একবার ব্রজেশ্বর বলিল, "প্রফুল্ল ডাকাত! ছি!"

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া, দেবী চৌধুরাণী—হায়! কোথায় গেল দেবী? কই সে বেশভূষা, ঢাকাই শাড়ী, সোণাদানা, হীরা মুক্তা পান্না—সব কোথায় গেল? দেবী সব ছাড়িয়াছে—সব একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে। দেবী কেবল একখানা গড়া পরিয়াছে

—হাতে কেবল একগাছা কড়। দেবী নৌকার এক পাশে বজরার শুধু তক্তার উপর একখানা চট পাতিয়া শয়ন করিল। ঘুমাইল কি না, জানি না।

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া, দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মত মোটা শাড়ী। কপাল ও বুক গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চ্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল—তখন দেবীর যে সৌন্দর্য্য বাহির হইল, গত রাত্রির বেশভূষা, জাঁকজমক, হীরা মতি চাঁদনি বা রাণী-গিরিতে তাহা দেখা যায় নাই। কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরাণীর মত দেখাইয়াছিল—আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মত দেখাইতেছে। যে সুন্দর, সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন?

দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন যে, ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্‌কে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্ব্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্ব্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই "ভাল মানুষ" হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।

দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল, "দিবা, তুই এখানে ব'স্। আমি আসিতেছি। এ বনে বাঘ ভালুক বড় অল্প। আসিলেও তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।" এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুরঙ্গ। পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্ব্বকালে বোধ হয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কাল সহকারে চারি পাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মিট্ মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাহার পূজা করিতেছিল। দেবী শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্ব্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা! কাল রাত্রে তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ না কি?"

দেবী বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "কি জানি?"

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে; আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবানী ঠাকুর।

দেবী বলিল, "কি জানি কি, ঠাকুর? আপনি কি আমায় জানেন না? দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাইতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি এক দিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলিলেন, "কি জানি?"

ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে, এক দিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেন না, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এত দিন ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কি? যা এত দিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে? যদি আমি এ সকল ডাকাইতির ধনের এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমি ত জান যে, কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাইতি করি। যে ধাম্মিক, যে সৎপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করে, যাহার ধনহানি হইলে ভরণপোষণের কষ্ট হইবে, রঙ্গরাজ কি আমি কখন তাহাদের এক পয়সাও লই নাই। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সাও লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজশাসন

চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি এ কি অধর্ম্ম ?

দেবী। রাজা রাণী, যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন্—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপ করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে তোমার বশ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী—গুণে যথার্থ রাজরাণী। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে—কেন না, তুমি সন্ন্যাসিনী, মার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মত রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত ?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে—এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কি ? এ বরেন্দ্রভূমে আজি কালি কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত ? কিন্তু সে কথা যাক্—ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি ? খ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়,—আমার স্ত্রীবুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাই বলিতেছি—আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর হইতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।

ভবানী। যদি ভাল লাগে না—তবে কালি রঙ্গরাজকে ডাকাইতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন ? কথা যে আমার অবিদিত নাই, তাহা বলা বেশীর ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাইতি করে নাই—ডাকাইতির ভাণ করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন ? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য।

ভ। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলেও নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল, "তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ভ। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দিবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভাল কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। খানখা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, "সে কি রকম?"

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরিবের বাগ্দী অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউটার মা মরিয়া গেল।

দে। আর বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সে সব কথায় কাজ কি? আমরা পরহিত-ব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই, তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র এক দিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি। সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবে না—করিলে মারা পড়িবে। ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া, আজি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ দিল, "আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল—সেইখানেই চল—বরকন্দাজদিগের সংবাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাও—টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বজরার মাস্তুলের উপর তিন চারিখানা ছোট বড় শাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল; ছিপখানা বজরার সাম্‌নে আসিয়া বজরার সঙ্গে বাঁধা হইল। তাহাতে ষাট জন জোয়ান বোটে লইয়া বসিয়া, 'রাণীজি-কি জয়' বলিয়া বাহিতে আরম্ভ করিল—সেই জাহাজের মত বজরা তখন তীরবেগে ছুটিল। এ দিকে দেখা গেল, বহু-সংখ্যক পথিক বা হাটুরিয়া লোকের মত লোক, নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বজরার সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের হাতে কেবল এক এক লাঠি মাত্র—কিন্তু বজরার ভিতর বিস্তর ঢাল, সড়কি, বন্দুক আছে। ইহারা দেবীর "বরকন্দাজ" সৈন্য।

সব ঠিক দেখিয়া, দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালায় গেল। হায়! দেবী!—তোমার এ কিরূপ সন্ন্যাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোমবারে প্রাতঃসূর্য্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর "দরবার" বা "এজ্‌লাস্"। সে এজ্‌লাসে কোন মোকর্দ্দমা মামলা হইত না। রাজকার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমী সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজ্‌লাস্। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের

উপর মসনদ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ী পরা। শাড়ীখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালের প্রকৃত দেবীপ্রতিমা মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারি জন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড-চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবর্দার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া, বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক, বর্কন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচ শত বর্কন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগ্ড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল সড়কি। চারি দিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার "দেবী রাণী-কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তার পর দশ জন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তার পর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক এক জন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসনসমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেন না, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেই জন্য কেহ কখনও তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেই-রূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্য্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

কিছু দিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুড্ল্যাড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট

দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচ পত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রজেশ্বর তাঁর পদবন্দনা করিলেন।

হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল সংবাদ কি? টাকার কি হইয়াছে?"

ব্রজেশ্বর বলিলেন যে, "তাঁহার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই।" হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে টাকা পাও নাই?"

"আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পাইয়াছি—"

হরবল্লভ। পেয়েছ? তা আমায় এতক্ষণ বল নাই? দুর্গা, বাঁচলেম্!

ব্র। টাকাটা যে স্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "তার নামটা মনে আস্‌চে না—সেই যে মেয়ে ডাকাইত একজন আছে?"

হর। কে, দেবী চৌধুরাণী?

ব্র। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পাইলে কি প্রকারে?

ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে লেখে যে, এখানে বাপের কাছে ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। ব্রজ বলিল, "ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।"

হর। বদ্ লোকের টাকা! লেখাপড়া কি রকম হইয়াছে?

ব্র। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখাপড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশী খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।"

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "টাকা নেব না ত ফাটকে যাব না কি? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা পুণ্যের টাকা কি? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব? সে আপত্তি ক'রে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাইতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া করে নাই—ভয় হয়, পাছে দেরি হ'লে বাড়ী ঘর লুঠপাট করিয়া লইয়া যায়।"

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

হর। তা টাকার মিয়াদ কত দিন?

ব্র। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা সে হোলো ডাকাইত। দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, টাকা পাঠাইয়া দিব?

ব্র। ঐ দিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, "তা সেই দিন সেইখানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

ব্রজেশ্বর বিদায় হইলেন। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, "হাঁঃ, সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে! বেটীকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টন শুদ্ধ তার বজরায় না উঠে—ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না।"

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন—ব্রজেশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এ দিকে সাগর আসিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে গিয়া গল্প করিল যে, ব্রজেশ্বর একটা রাজরাণীর বজরায় গিয়া, তাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে,—সাগর অনেক মানা করিয়াছিল, তাহা শুনে নাই। মাগী জেতে কৈবর্ত্ত—আর তার দুইটা বিবাহ আছে—সুতরাং ব্রজেশ্বরের জাতি গিয়াছে, সুতরাং সাগর আর ব্রজেশ্বরের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিবে না, ইহা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী এ সকল কথা ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা

করায় ব্রজেশ্বর অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, "রাণীজি জাত্যংশে ভাল—আমার পিতৃঠাকুরের—পিশী হয়। আর বিয়ে,—তা আমারও তিনটা, তারও তিনটা।"

ব্রহ্মঠাকুরাণী বুঝিল, কথাটা মিথ্যা; কিন্তু সাগরের মতলব যে, ব্রহ্মঠাকুরাণী এ গল্পটা নয়নতারার কাছে করে। সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। নয়নতারা একে সাগরকে দেখিয়া জ্বলিয়াছিল, আবার শুনিল যে, স্বামী একটা বুড়া কন্যে বিবাহ করিয়াছে। নয়নতারা একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং কিছু দিন ব্রজেশ্বর নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না—সাগরের ইজারা-মহল হইয়া রহিলেন।

সাগরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু নয়নতারা বড় গোল বাঁধাইল—শেষে গিন্নীর কাছে গিয়া নালিস করিল। গিন্নী বলিলেন, "তুমি বাছা, পাগল মেয়ে। বামনের ছেলে কি কৈবর্ত্ত বিয়ে করে গা? তোমাকে সবাই ক্ষেপায়, তুমিও ক্ষেপ।"

নয়ান্ বৌ তবু বুঝিল না। বলিল, "যদি সত্য সত্যই বিয়ে হয়ে থাকে?" গিন্নী বলিলেন, "যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ করে ঘরে তুল্ব। বেটার বৌ ত আর ফেল্‌তে পার্‌ব না।"

এই সময়ে ব্রজেশ্বর আসিল, নয়ান বৌ অবশ্য পলাইয়া গেল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি বল্‌ছিলে গা?"

গিন্নী বলিলেন, "এই বল্‌ছিলাম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস্, তবে আবার বৌ বরণ করে ঘরে তুলি।"

ব্রজেশ্বর অন্যমনা হইল, কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রদোষকালে গিন্নী ঠাকুরাণী কর্ত্তা মহাশয়কে বাতাস করিতে করিতে, ভর্ত্তৃচরণে এই কথা নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনটা কি?"

গিন্নী। আমি ভাবি কি যে, সাগর বৌ ঘর করে না। নয়ান বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়। তা যদি একটি ভাল দেখে ব্রজ বিয়ে ক'রে সংসার ধর্ম্ম করে, আমার সুখ হয়।

কর্ত্তা। তা ছেলের যদি সে রকম বোঝ, তা আমায় বলিও। আমি ঘটক ডেকে ভাল দেখে সম্বন্ধ কর্‌ব।

গিন্নী। আচ্ছা, আমি মন বুঝিয়া দেখিব।

মন বুঝিবার ভার ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপর পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী অনেক বিরহসন্তপ্ত এবং বিবাহ-প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শুনাইলেন, কিন্তু ব্রজের মন তাহাতে কিছু

বোঝা গেল না। তখন ব্রহ্মঠাকুরাণী স্পষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। কিছুই খবর পাইলেন না। ব্রজেশ্বর কেবল বলিল, "বাপ মা যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাই পালন করিব।"

কথাটার আর বড় উচ্চবাচ্য হইল না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবী রাণীর ঋণ পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থসংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই চারি বার এ কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এ দিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই চারি দিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।" হরবল্লভ শিবিকারোহণে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুই জন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর এক রকম। তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টরই শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন, আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন, বলুন।"

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেবী চৌধুরাণী দস্যুদিগের নেত্রী। তাহাকে ধরিতে পারিলে আর আর সকলে ধরা পড়িবে। তিনি দেবীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন মতে সফল হইতে পারেন নাই। অতএব হরবল্লভ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধরাইয়া দিবে শুনিয়া, সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "আমার সঙ্গে পাঁচ শত সিপাহী পাঠাইতে হুকুম হউক।" সাহেব সিপাহীর হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনান্ সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফটেনাণ্ট ব্রেনান সেই জন্য কতক

ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এ দিকে লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেব আর কতক সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িত ভাবে, বন দিয়া বন দিয়া তটপন্থে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল; সেইখানে তীরবর্ত্তী বনমধ্যে ফৌজ তিনি লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন। আরও এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে, অতএব লেফ্‌টেনাণ্ট্ ব্রেনান্ অবশিষ্ট সিপাহীগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন, তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহীরা সেখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর নাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবেরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম "বর্‌কন্দাজ"। অনেক সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে এই বর্‌কন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্‌দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি, লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র! ছড়িত্ব

প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সে কালে তুমি না কি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু" "বাছা"—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই তুনিয়াতে জাজ্বল্যমান। ইস্তক আড়া বাঁকারি খুঁটি খোঁটা লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে; তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-বৃক্ষ-শাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায় কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক আধটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার লাঠির ভয়ে এত সিপাহীর সমাগম, তার কাছে একখানি লাঠিও ছিল না। নিকটে একটি লাঠিয়ালও ছিল না। দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান—সব ঠিক্ সে রকম নয়। সে ছিপখানি সেখানে নাই—তাহাতে যে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল ছিল, তাহারা নাই। তার পর বজরার উপরেও একটি পুরুষমানুষ নাই—মাঝি মাল্লা, রঙ্গরাজ প্রভৃতি কেহ নাই। কিন্তু বজরার মাস্তুল উঠান—চারিখানা পাল তোলা আছে—বাতাসের অভাবে পাল মাস্তুলে জড়ান পড়িয়া আছে। বজরার নোঙ্গরও ফেলা নহে, কেবল তুগাছা কাছিতে তীরে খোঁটায় বাঁধা আছে।

তৃতীয়, দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহার্ঘবস্ত্রপরিহিতা নয়, কিন্তু আর এক প্রকারে শোভা আছে। ললাট, গণ্ড, বাহু, হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত; চন্দনচর্চ্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরণে সেই মোটা শাড়ী।

আর, আজ দেবী একা ছাদের উপর বসিয়া নহে, কাছে আর দুই জন স্ত্রীলোক বসিয়া। একজন নিশি, অপর দিবা। এই তিন জনে যে কথাটা হইতেছিল, তাহার মাঝখান হইতে বলিলেও ক্ষতি নাই।

দিবা বলিতেছিল—দিবা অশিক্ষিতা, ইহা পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত—বলিতেছিল, "হাঁঃ, পরমেশ্বরকে না কি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?"

প্রফুল্ল বলিল, "না, প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিতেছিলাম। প্রত্যক্ষ ছয় রকম। তুমি যে প্রত্যক্ষ দেখার কথা কহিতেছিলে, সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—চক্ষের প্রত্যক্ষ। আমার গলার আওয়াজ তুমি শুনিতে পাইতেছ—আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ কানের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেছে। আমার হাতের ফুলের গন্ধ তোমার নাকে যাইতেছে কি?"

দিবা। যাইতেছে।

দেবী। ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর আমি যদি তোমার গালে এক চড় মারি, তাহা হইলে তুমি আমার হাতকে প্রত্যক্ষ করিবে—সেটা ত্বাচ প্রত্যক্ষ। আর এখনি নিশি যদি তোমার মাথা খায়, তাহা হইলে, তোমার মগজটা তার রাসন প্রত্যক্ষ হইবে।

দিবা। মন্দ প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, শোঁকাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, খাওয়াও যায় না। তাঁকে প্রত্যক্ষ করিব কি প্রকারে?

নিশি। এ ত গেল পাঁচ রকম প্রত্যক্ষ। ছয় রকম প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছি; কেন না, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ ছাড়া আর একটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, জান না?

দিবা। কি, দাঁত?

নিশি। দূর্ হ পোড়ারমুখী! ইচ্ছা করে, কিল মেরে তোর সে ইন্দ্রিয়ের পাটিকে পাটি ভেঙ্গে দিই।

দেবী। (হাসিতে হাসিতে) চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

নিশি। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রমাণাভাবাৎ।"

যিনি সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও ভাষ্য পড়িয়াছেন, তিনি নিশির এই ব্যঙ্গোক্তির মর্ম্ম বুঝিবেন। নিশি প্রফুল্লের এক প্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।

প্রফুল্ল উত্তর করিল, "সূত্রকারস্তোভয়েন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ।"

দিবা। রেখে দাও তোমার হাবাৎ মাবাৎ—আমি ত পরমেশ্বরকে কখন মনের ভিতর দেখিতে পাই নাই।

প্রফুল্ল। আবার দেখা? চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই দেখা—অন্য কোন প্রত্যক্ষ দেখা নয়,—মানস প্রত্যক্ষও দেখা নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ, বহির্ব্বিষয়; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্ব্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। ঈশ্বরকে দেখা যায় না।

দিবা। কই? আমি ত ঈশ্বরকে কখনও মনের ভিতর কোন রকম প্রত্যক্ষ করি নাই?

প্রফুল্ল। মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষশক্তি অল্প—সাহায্য বা অবলম্বন ব্যতীত সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

দিবা। প্রত্যক্ষের জন্য আবার সাহায্য কি রকম? দেখ, এই নদী, জল, গাছ, পালা, নক্ষত্র, সকলই আমি বিনা সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি।

"সকলই নয়। ইহার একটি উদাহরণ দিব?" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিল।

হাসির রকমটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "ইংরেজের সিপাহী আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে জান?"

দিবা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা ত জানি।"

প্রফুল্ল। সিপাহী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

দিবা। না। কিন্তু আসিলে প্রত্যক্ষ করিব।

প্র। আমি বলিতেছি, আসিয়াছে, কিন্তু বিনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ না। এই সাহায্য গ্রহণ কর।

এই বলিয়া প্রফুল্ল দিবার হাতে দূরবীক্ষণ দিল। ঠিক্ যে দিকে দেখিতে হইবে, দেখাইয়া দিল। দিবা দেখিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলে?"

দিবা। একখানা ছিপ। উহাতে অনেক মানুষ দেখিতেছি বটে।

দেবী। উহাতে সিপাহী আছে। আর একখানা দেখ।

এরূপে দেবী দিবাকে পাঁচখানা ছিপ নানা স্থানে দেখাইল। নিশিও দেখিল। নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপগুলি চরে লাগাইয়া আছে, দেখিতেছি। আমাদের ধরিতে আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের কাছে না আসিয়া ছিপ তীরে লাগাইয়া আছে কেন?"

দেবী। বোধ হয়, ডাঙ্গা-পথে যে সকল সিপাহী আসিবে, তাহারা আসিয়া পৌঁছে নাই। ছিপের সিপাহী তাহাদের অপেক্ষায় আছে। ডাঙ্গার সিপাহী আসিবার আগে, ছিপের সিপাহী আগু হইলে, আমি ডাঙ্গা-পথে পলাইতে পারি, এই শঙ্কায় উহারা আগু হইতেছে না।

দিবা। কিন্তু আমরা ত উহাদের দেখিতে পাইতেছি; মনে করিলেই ত পলাইতে পারি।

দেবী। ওরা তা জানে না। ওরা জানে না যে, আমরা দূরবীণ রাখি।

নিশি। ভগিনি! প্রাণে বাঁচিলে এক দিন না এক দিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক। আজ ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিবে চল। এখনও যদি ডাঙ্গায় সিপাহী আসে নাই, তবে ডাঙ্গা-পথে এখন প্রাণরক্ষার উপায় আছে।

দেবী। যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন? আসিলাম যদি, তবে লোক জন সবাইকে বিদায় দিলাম কেন? আমার হাজার বর্‌কন্দাজ আছে—তাহাদের সকলকে অন্য স্থানে পাঠাইলাম কেন?

দিবা। আমরা আগে যদি জানিতাম, তাহা হইলে তোমায় এমন কর্ম্ম করিতে দিতাম না।

দেবী। তোমার সাধ্য কি, দিবা! যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য কারব। আজ স্বামিদর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। তোমরা আমাব কথা শুনিও, দিবা নিশি! আমার স্বামী যখন ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার নৌকায় উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইও। আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব। সেই জন্যই বজরা হইতে আর সকলকে বিদায় দিয়াছি। তোমরা তখন গেলে না। কিন্তু আমায় এই ভিক্ষা দাও—আমার স্বামীর নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিও।

নিশি। ধড়ে প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়িব না। মরিতে হয়, একত্র মরিব।

প্র। ও সকল কথা এখন থাক্—যাহা বলিতেছিলাম, তা বলিয়া শেষ করি। যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিলে না, তা যেমন দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে, তেমন ঈশ্বরকে মানস প্রত্যক্ষ করিতে দূরবীণ চাই।

দিবা। মনের আবার দূরবীণ কি ?

প্র। যোগ।

দিবা। কি—সেই ন্যাস, প্রাণায়াম, কুম্ভক, বুজরুকী, ভেল্কী—

প্র। তাকে আমি যোগ বলি না। যোগ অভ্যাস মাত্র। কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। তুমি যদি দুধ ঘি খাইতে অভ্যাস কর, তাকে যোগ বলিব না। তিনটি অভ্যাসকেই যোগ বলি।

দিবা। কি কি তিনটি ?

প্র। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ।

ততক্ষণ নিশি দূরবীণ লইয়া এ দিক্ ও দিক্ দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বলিল, "সম্প্রতি উপস্থিত গোলযোগ।"

প্র। সে আবার কি ? আবার গোলযোগ কি ?

নিশি। একখানা পান্সী আসিতেছে। বুঝি ইংরাজের চর।

প্রফুল্ল নিশির হাত হইতে দূরবীণ লইয়া পান্সী দেখিল। বলিল, "এই আমার সুযোগ। তিনিই আসিতেছেন। তোমরা নীচে যাও।"

দিবা ও নিশি ছাদ হইতে নামিয়া কামরার ভিতর গেল। পান্সী ক্রমে বাহিয়া আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। সেই পান্সীতে—ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর, লাফাইয়া বজরায় উঠিয়া, পান্সী তফাতে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। পান্সীওয়ালা তাহাই করিল।

ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে, প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই চারি দিনে দিতে পারিব বোধ হয়। দুই চারি দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।"

ও ছি! ছি! ব্রজেশ্বর! দশ বছরের পর প্রফুল্লের সঙ্গে এই কি কথা!

দেবী উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না—" বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল—দেবী একবার চোখ মুছিল—"আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না,

কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে, ঐ টাকা গরিব দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি পাইব।

ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল, "প্রফুল্ল! তোমার টাকা—"

ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথা মুখে রহিল। যেমন ব্রজেশ্বর "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া, চোখের জলের স্রোত ছুটিল। ব্রজেশ্বরের ছাই টাকার কথা সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। তেজস্বিনী দেবী রাণী ছেলেমানুষের মত বড় কান্নাটা কাঁদিল। ব্রজেশ্বর ততক্ষণ বড় বিপন্ন হইলেন। তাঁর মনে মনে বোধ আছে যে, এ পাপীয়সী ডাকাইতি করিয়া খায়, এর জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলা হবে না। কিন্তু চোখের জল, অত বিধি ব্যবস্থা অবগত নয়, তারা অনাহূত আসায় ব্রজেশ্বরের চোখ ভরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিলেন, হাত উঠাইয়া চোখ মুছিলেই ধরা পড়িব। কাজেই চোখ মোছা হইল না। চোখ যখন মোছা হইল না, তখন পুকুর ছাপাইল—গাল বাহিয়া ধারা চলিল—প্রফুল্লের হাতে পড়িল।

তখন বালির বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে, প্রফুল্লকে ডাকাইতি করার জন্য ভারী রকম তিরস্কার করিবেন, পাপীয়সী বলিবেন—আরও দুই চারিটা লম্বা চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কেঁদে যার হাত ভিজিয়ে দিলেন, তার উপর কি আর লম্বা চৌড়া কথা হয়?

তখন চক্ষু মুছিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখ প্রফুল্ল, তোমার টাকা আমার টাকা—তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব? কিন্তু আমি বড় কাতরই হইয়াছি। আমি আজ দশ বৎসর কেবল তোমাকেই ভাবিয়াছি। আমার আর দুই স্ত্রী আছে—আমি তাহাদিগকে এ দশ বৎসর স্ত্রী মনে করি নাই; তোমাকেই স্ত্রী জানি। কেন, তা বুঝি তোমায় আমি বুঝাইতে পারিব না। শুনিয়াছিলাম, তুমি নাই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তার পরও মনে জানিতাম, তুমিই আমার স্ত্রী—মনে আর কাহারও স্থান ছিল না। বল্‌ব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলাতেও ক্ষতি নাই—তুমি মরিয়াছ শুনিয়া, আমিও মরিতে বসিয়াছিলাম। এখন মনে হয়, মরিলেই ভাল হইত; তুমি মরিলে ভাল হইত—না মরিয়াছিলে ত আমি মরিলেই ভাল হইত। এখন যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, তা শুনিতে হইত না, বুঝিতে হইত না। আজ দশ বৎসরের হারান ধন তোমায় পাইয়াছি, আমার স্বর্গসুখের অপেক্ষা অধিক সুখ হইত। তা না হয়ে প্রফুল্ল, আজ

তোমায় পাইয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা।" তার পর একবার থামিয়া একটু ঢোক গিলিয়া, মাথা টিপিয়া ধরিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "মনের মন্দিরের ভিতর সোণার প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্ল—মুখে আসে না—সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি।"

প্রফুল্ল বলিল, "কি? ডাকাইতি করি?"

ব্র। কর না কি?

ইহার উত্তরে প্রফুল্ল একটা কথা বলিতে পারিত। যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি অন্নের কাঙ্গাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে—আমি কি করিয়া খাইব?" তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, "চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও।" প্রফুল্ল মেধাবিনী—সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া, এই ভর্ৎসনা করিল; আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল। প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, "আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন? তোমরাই ত চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতেছি।" এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল,—সে কথা মুখেও আনিল না। প্রফুল্ল স্বামীর কাছে হাত যোড় করিয়া এই উত্তর দিল। বলিল, "আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই। তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি। সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে। সেই কথা শুনাইব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। আজ না শুনিলে, আর শুনা হইবে না। শোন, আমি বলি।"

তখন যে দিন প্রফুল্ল শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার কাহিনী সকলই অকপটে বলিল। শুনিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত, লজ্জিত, অতিশয় আহ্লাদিত, আর মহামহিমময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইলেন। প্রফুল্ল সমাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার এ কথাগুলিতে বিশ্বাস করিলে কি?"

অবিশ্বাসের জায়গা ছিল না—প্রফুল্লের প্রতি কথা ব্রজেশ্বরের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছিল। ব্রজেশ্বর উত্তর করিতে পারিল না—কিন্তু তাহার আনন্দপূর্ণ কান্তি দেখিয়া,

প্রফুল্ল বুঝিল, বিশ্বাস হইয়াছে। তখন প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "এখন পায়ের ধূলা দিয়া এ জন্মের মত আমায় বিদায় দাও। আর এখানে বিলম্ব করিও না—সম্মুখে কোন বিঘ্ন আছে। তোমায় এই দশ বৎসরের পর পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি; ইহাতেই বুঝিবে যে, বিঘ্ন বড় সামান্য নহে। আমার দুইটি সখী এই নৌকায় আছে। তারা বড় গুণবতী, আমিও তাহাদের বড় ভালবাসি। তোমার নৌকায় তাহাদের লইয়া যাও। বাড়ী পৌঁছিয়া, তারা যেখানে যাইতে চায়, সেইখানে পাঠাইয়া দিও। আমায় যেমন মনে রাখিয়াছিলে, তেমনি মনে রাখিও। সাগর যেন আমায় না ভুলে।"

ব্রজেশ্বর ক্ষণেক কাল নীরবে ভাবিল। পরে বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রফুল্ল! আমায় বুঝাইয়া দাও। তোমার এত লোক—কেহ নাই! বজরায় মাঝিরা পর্য্যন্ত নাই! কেবল দুইটি স্ত্রীলোক আছে, তাদেরও বিদায় করিতে চাহিতেছ। সম্মুখে বিঘ্ন বলিতেছ—আমাকে থাকিতে নিষেধ করিতেছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হইবে না বলিতেছ। এ সব কি? সম্মুখে কি বিঘ্ন আমাকে না বলিলে, আমি যাইব না। বিঘ্ন কি, শুনিলেও যাইব কি না, তাও বলিতে পারি না।"

প্রফুল্ল। সে সব কথা তোমার শুনিবার নয়।

ব্র। তবে আমি কি তোমার কেহ নই?

এমন সময় দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল—ব্রজেশ্বরের মুখের কথা মুখে রহিল, দুই জনে চমকিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, দূরে পাঁচখানা ছিপ আসিতেছে, বটিয়ার তাড়নে জল চাঁদের আলোয় জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল, পাঁচখানা ছিপ সিপাহী-ভরা। ডাঙ্গা-পথের সিপাহীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তারই সঙ্কেত বন্দুকের শব্দ। শুনিয়াই পাঁচখানা ছিপ খুলিয়াছিল। দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, "আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আপনার পান্সীতে উঠিয়া চলিয়া যাও।"

ব্র। কেন? এ ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

প্র। না শুনিলে যাইবে না?

ব্র। কোন মতেই না।

প্র। এ ছিপে কোম্পানীর সিপাহী আছে। এ বন্দুক ডাঙ্গা হইতে কোম্পানীর সিপাহী আওয়াজ করিল।

ব্র। কেন এত সিপাহী এ দিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে।"

প্র। জানিতাম—আমার চর সর্ব্বত্র আছে।

ব্র। এ ঘাটে আসিয়া জানিয়াছ, না আগে জানিয়াছ?

প্র। আগে জানিয়াছিলাম।

ব্র। তবে, জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

প্র। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্র। তোমার লোক জন কোথায়?

প্র। বিদায় দিয়াছি। তারা কেন আমার জন্য মরিবে?

ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব বা কোন্ সাধ মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?

ব্র। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন?

ব্র। কাল শুনিলে কি হইত?

প্র। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?

ব্র। এখন?

প্র। এখন আর উপায় নাই। তোমার পান্সী ডাক—নিশি ও দিবাকে লইয়া শীঘ্র যাও।

ব্রজেশ্বর আপনার পান্সী ডাকিল। পান্সীওয়ালা নিকটে আসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "তোরা শীঘ্র পলা, ঐ কোম্পানির সিপাহীর ছিপ আসিতেছে; তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। শীঘ্র পলা, আমি যাইব না, এইখানে থাকিব।"

পান্সীর মাঝি মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ পান্সী খুলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর চেনা লোক, টাকার ভাবনা নাই।

পান্সী চলিয়া গেল দেখিয়া, প্রফুল্ল বলিল, "তুমি গেলে না?"

ব্র। কেন, তুমি মরিতে জান, আমি জানি না? তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমায় শত বার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

"তবে কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণ রক্ষার যদি কোন উপায় হয়, তা আমি করিব।" এই বলিতে বলিতে প্রফুল্ল আকাশপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যেন কিছু ভরসা হইল। আবার তখনই নির্ভরসা হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার প্রাণ-রক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।"

ব্র। কি?

প্র। এ কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ্ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, "তিনিই কি গোইন্দা?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরের বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। এখানে আজিকার রাত্রে যে দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এ কথা হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আর কাহারও কাছে এ কথা বলেন নাই; দেবীরও যে গূঢ় মন্ত্রণা, আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ দেবী এ ঘাটে আসিবার আগেই কোম্পানির সিপাহী রঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; নহিলে ইহারই মধ্যে পৌঁছিত না। আর ইতিপূর্ব্বেই হরবল্লভ কোথায় যাইতেছেন, কাহারও কাছে প্রকাশ না করিয়া দূরযাত্রা করিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। কথাটা বুঝিতে দেরি হইল

না। তাই হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোন উদ্যোগ করেন নাই। তথাপি ব্রজেশ্বর ভুলিলেন না যে,

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, "আমি মরি কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

প্র। সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।

এই কথা দেবী আন্তরিক বলিয়াছিল। হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।

কিন্তু এ সময়ে তীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্য্যধ্বনি হইল। দুই জনেই চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবী ডাকিল, "নিশি!"

নিশি ছাদের উপর আসিল।

দেবী। কার ভেরী ঐ?

নিশি। যেন দাড়ি বাবাজীর বলিয়া বোধ হয়।

দেবী। রঙ্গরাজের?

নিশি। সেই রকম।

দেবী। সে কি? আমি রঙ্গরাজকে প্রাতে দেবীগড় পাঠাইয়াছি।

নিশি। বোধ হয়, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাক।

ব্রজেশ্বর বলিল, "ভেরীর আওয়াজ অনেক দূর হইতে হইয়াছে। এখান হইতে ডাকিলে, ডাক শুনিতে পাইবে না। আমি নামিয়া গিয়া ভেরীওয়ালাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।"

দেবী বলিল, "কিছু করিতে হইবে না। তুমি একটু নীচে গিয়া নিশির কৌশল দেখ।"

নিশি ও ব্রজ নীচে আসিল। নিশি নীচে গিয়া, এক বাঁশী বাহির করিল। নিশি গীত বাদ্যে বড় পটু, সে শিক্ষাটা রাজবাড়ীতে হইয়াছিল। নিশিই দেবীর বীণার ওস্তাদ। নিশি বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল। অনতিবিলম্বে রঙ্গরাজ বজরায় আসিয়া উঠিয়া, দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

এই সময়ে ব্রজেশ্বর নিশিকে বলিল, "তুমি ছাদে যাও। তোমার কাছে কেহ বোধ হয়, কথা লুকাইবে না। কি কথা হয়, শুনিয়া আসিয়া আমাকে সব বলিও।"

নিশি স্বীকৃত হইয়া, কামরার বাহির হইল—বাহির হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "আপনি একটু বাহিরে আসিয়া দেখুন।"

ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইয়া দেখিল। দেখিতে পাইল, জঙ্গলের ভিতর হইতে অগণিত মনুষ্য বাহির হইতেছে। নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা কারা? সিপাই?"

নিশি বলিল, "বোধ হয় উহারা বর্‌কন্দাজ। রঙ্গরাজ আনিয়া থাকিবে।"

দেবীও সেই মনুষ্যশ্রেণী দেখিতেছিল, এমন সময়ে রঙ্গরাজ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন, রঙ্গরাজ?"

রঙ্গরাজ প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দেবী পুনরপি বলিল, "আমি সকালে তোমাকে দেবীগড় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে যাও নাই কেন? আমার কথা অমান্য করিয়াছ কেন?"

রঙ্গ। আমি দেবীগড় যাইতেছিলাম—পথে ঠাকুরজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

দেবী। ভবানী ঠাকুর?

রঙ্গ। তাঁরই কাছে, শুনিলাম, কোম্পানির সিপাহী আপনাকে ধরিতে আসিতেছে। তাই আমরা দুই জনে বর্‌কন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। বর্‌কন্দাজ জঙ্গলে

লুকাইয়া রাখিয়া আমি তীরে বসিয়াছিলাম। ছিপ আসিতেছে দেখিয়া, আমি ভেরী বাজাইয়া সঙ্কেত করিয়াছি।

দেবী। ও জঙ্গলেও সিপাহী আছে?

রঙ্গ। তাহাদের আমরা ঘেরিয়া ফেলিয়াছি।

দেবী। ঠাকুরজি কোথায়?

রঙ্গ। ঐ বর্কন্দাজ লইয়া বাহির হইতেছেন।

দেবী। তোমরা কত বর্কন্দাজ আনিয়াছ?

রঙ্গ। প্রায় হাজার হইবে।

দেবী। সিপাহী কত?

রঙ্গ। শুনিয়াছি পাঁচ শ।

দেবী। এই পনের শ লোকের লড়াই হইলে, মরিবে কত?

রঙ্গ। তা দুই চারি শ মরিলেও মরিতে পারে।

দেবী। ঠাকুরজিকে গিয়া বল—তুমিও শোন যে, তোমাদের এই আচরণে আমি আজ মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া পাইলাম।

রঙ্গ। কেন, মা?

দেবী। একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্ম্মজ্ঞান নাই? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শ লোক কেন মরিবে? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?

রঙ্গ। আপনি বাঁচিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে।

দেবী রাগে, ঘৃণায়, অধীর হইয়া বলিল, "ছি!" সেই ধিক্কারে রঙ্গরাজ অধোবদন হইল—মনে করিল, "পৃথিবী দ্বিধা হউক, আমি প্রবেশ করি।"

দেবী তখন বিস্ফারিত নয়নে, ঘৃণাস্ফুরিত কম্পিতাধরে বলিতে লাগিল, "শোন, রঙ্গরাজ! ঠাকুরজিকে গিয়া বল, এই মুহূর্ত্তে বর্কন্দাজ সকল ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইলে, আমি এই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, তোমরা কেহ রাখিতে পারিবে না।"

রঙ্গরাজ এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "আমি চলিলাম। ঠাকুরজিকে এই সকল কথা জানাইব। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহা করিবেন। আমি উভয়েরই আজ্ঞাকারী।"

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি ছাদে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। রঙ্গরাজ গেলে, সে দেবীকে বলিল, "ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না?"

দেবী। ভাবিয়াছি ভগিনি! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার, হইবে। কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?

নিশি মনে মনে দেবীকে ধন্য ধন্য বলিল। ভাবিল, "এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়াছিল। ইহার সঙ্গে মরিয়াও সুখ।"

নিশি গিয়া, সকল কথা ব্রজেশ্বরকে শুনাইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে আর আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিল না; মনে মনে বলিল, "যথার্থ দেবীই বটে। আমি নরাধম! আমি আবার ইহাকে ডাকাইত বলিয়া ভৎর্সনা করিতে গিয়াছিলাম।"

এ দিকে পাঁচ দিক্ হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্ত্তী হইল। প্রফুল্ল সে দিকে দৃক্পাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না—বর্কন্দাজ দেখিতেছিল না। দূর আকাশ-প্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ, অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন সেখানা একটু বাড়িল; তখন "জয় জগদীশ্বর!" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া, নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার স্বামীকে বাঁচাইব।"

নিশি। আর তুমি?

দেবী। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমি যাহা বলি, যাহা করি, এখন তাহাতে বড় সাবধানে মনোযোগ দাও। তোমার আমার অদৃষ্টে যাই হৌক, আমার স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে, দিবাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্বশুরকে বাঁচাইতে হইবে।

এই বলিয়া দেবী একটা শাঁক লইয়া ফুঁ দিল। নিশি বলিল, "তবু ভাল।"

দেবী বলিল, "ভাল কি মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখ। যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার উপর সব নির্ভর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বরকন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। মাথায় লাল পাগড়ী, মালকোঁচা মারা, খালি পা—জলে লড়াই করিতে হইবে বলিয়া কেহ জুতা আনে নাই। সবার হাতে ঢাল সড়্‌কি—কাহারও কাহারও বন্দুক আছে—কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প। সকলেরই পিঠে লাঠি বাঁধা—এই বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার। বাঙ্গালী ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানিত; লাঠি ছাড়িয়াই বাঙ্গালী নির্জ্জীব হইয়াছে।

বরকন্দাজেরা দেখিল, ছিপগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে—বজরা ঘেরিবে। বরকন্দাজ দৌড়াইল—"রাণীজি-কি জয়" বলিয়া, তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা আসিয়া আগে বজরা ঘেরিল—ছিপ তাহাদের ঘেরিল। আর যে সময়ে শাঁক বাজিল, ঠিক সেই সময়ে জন কত বরকন্দাজ আসিয়া বজরার উপর উঠিল। তাহারা বজরার মাঝি মাল্লা—নৌকার কাজ করে, আবশ্যকমত লাঠি সড়্‌কিও চালায়। তাহারা আপাততঃ লড়ায়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে হালে, পালের রসি ধরিয়া, লগি ধরিয়া, যাহার যে স্থান, সেইখানে বসিল। আরও অনেক বরকন্দাজ বজরায় উঠিল। তিন চারি শ বরকন্দাজ তীরে রহিল—সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়্‌কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহী ছিপ হইতে নামিয়া, বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। যে বরকন্দাজেরা বজরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীরা তাহাদের উপর পড়িল। সর্ব্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। তখন মারামারি, কাটাকাটি, চেঁচাচেঁচি, বন্দুকের হুড়মুড়, লাঠির ঠক্‌ঠকি, ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল; কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না—কেহ কোন স্থানে স্থির হইতে পারে না।

দূর হইতে লড়াই হইলে সিপাহীর কাছে লাঠিয়ালেরা অধিকক্ষণ টিকিত না—কেন না, দূরে লাঠি চলে না। কিন্তু ছিপের উপর থাকিতে হওয়ায় সিপাহীদের বড় অসুবিধা হইল। যাহারা তীরে উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সে সিপাহীরা লাঠিয়ালদিগকে সঙ্গীনের মুখে হটাইতে লাগিল, কিন্তু যাহারা জলে লড়াই করিতেছিল, তাহারা বরকন্দাজদিগের লাঠি সড়্‌কিতে হাত পা বা মাথা ভাঙ্গিয়া কাবু হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিবার অল্পমাত্র পরেই এই ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রফুল্ল মনে করিল, "হয় ভবানী ঠাকুরের কাছে আমার কথা পৌঁছে নাই—নয় তিনি আমার কথা

রাখিলেন না; মনে করিয়াছেন, আমি মরিতে পারিব না। ভাল, আমার কাজটাই তিনি দেখুন।"

দেবীর রাণীগিরিতে গুটিকত চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল। তার একটি এই যে, যে সামগ্রীর কোন প্রকার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আগে গুছাইয়া হাতের কাছে রাখিতেন। এ গুণের পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। দেবী এখন হাতের কাছেই পাইলেন—একটি শাদা নিশান। শাদা নিশানটি বাহিরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে উঁচু করিয়া ধরিলেন।

সেই নিশান দেখাইবামাত্র লড়াই একেবারে বন্ধ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই হাতিয়ার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড় তুফান যেন হঠাৎ থামিয়া গেল, প্রমত্ত সাগর যেন অকস্মাৎ প্রশান্ত হ্রদে পরিণত হইল।

দেবী দেখিল, পাশে ব্রজেশ্বর। এই যুদ্ধের সময়ে দেবীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া, ব্রজেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। দেবী তাঁহাকে বলিল, "তুমি এই নিশান এইরূপ ধরিয়া থাক। আমি ভিতরে গিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে একটা পরামর্শ আঁটিব। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাহাকে বলিও, সে দরওয়াজা হইতে আমার হুকুম লয়।"

এই বলিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে নিশান দিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশান তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেখানে রঙ্গরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরের হাতে শাদা নিশান দেখিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি কার হুকুমে শাদা নিশান দেখাইলে?"

ব্রজ। রাণীজির হুকুম।

রঙ্গ। রাণীজির হুকুম? তুমি কে?

ব্রজ। চিনিতে পার না?

রঙ্গরাজ একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "চিনিয়াছি। তুমি ব্রজেশ্বরবাবু? এখানে কি মনে করে? বাপ বেটায় এক কাজে না কি? কেহ একে বাঁধ।"

রঙ্গরাজের ধারণা হইল যে, হরবল্লভের ন্যায় দেবীকে ধরাইয়া দিবার জন্যই ব্রজেশ্বর কোন ছলে বজরায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুই জন ব্রজেশ্বরকে বাঁধিতে আসিল। ব্রজেশ্বর কোন আপত্তি করিলেন না, বলিলেন, "আমায় বাঁধ, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কথা বুঝাইয়া দাও। শাদা নিশান দেখিয়াই দুই দলে যুদ্ধ বন্ধ করিল কেন?"

রঙ্গরাজ বলিল, "কচি খোঁকা আর কি? জান না, শাদা নিশান দেখাইলে ইংরেজের আর যুদ্ধ করিতে নাই?"

ব্র। তা আমি জানিতাম না। তা আমি জানিয়াই করি, আর না জানিয়াই করি, রাণীজির হুকুম মত শাদা নিশান দেখাইয়াছি কি না, তুমি না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আর তোমায়ও আজ্ঞা আছে যে, তুমি দরওয়াজা হইতে রাণীজির হুকুম লইবে।

রঙ্গরাজ বরাবর কামরার দরজায় গেল। কামরার দরওয়াজা বন্ধ আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাকিল, "রাণী মা!"

ভিতর হইতে উত্তর, "কে, রঙ্গরাজ?"

রঙ্গ। আজ্ঞা হাঁ—একটা শাদা নিশান আমাদের বজরা হইতে দেখান হইয়াছে—লড়াই সেই জন্য বন্ধ আছে।

ভিতর হইতে—"সে আমারই হুকুম মত হইয়াছে। এখন তুমি ঐ শাদা নিশান লইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেবের কাছে যাও। গিয়া বল যে, লড়ায়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দিব।"

রঙ্গ। আমার শরীর থাকিতে তাহা কিছুতেই হইবে না।

দেবী। শরীরপাত করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করিব।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল করিও না। তোমরা প্রাণ দিয়া আমায় বাঁচাইতে পারিবে না—এ সিপাহীর বন্দুকের কাছে লাঠি সোঁটা কি করিবে?

রঙ্গ। কি না করিবে?

দেবী। যাই করুক—আর এক বিন্দু রক্তপাত হইবার আগে আমি প্রাণ দিব,—বাহিরে গিয়া গুলির মুখে দাঁড়াইব—রাখিতে পারিবে না। বরং এখন আমি ধরা দিলে, পলাইবার ভরসা রহিল। বরং এক্ষণে আপন আপন প্রাণ রাখিয়া সুবিধা মত যাহাতে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সে চেষ্টা করিও। আমার অনেক টাকা আছে। কাম্পানির লোক সকল অর্থের বশ—আমার পলাইবার ভাবনা কি?

দেবী মুহূর্ত্ত জন্যও মনে করেন নাই যে, ঘুষ দিয়া তিনি পলাইবেন। সে রকম পলাইবার ইচ্ছাও ছিল না। এ কেবল রঙ্গরাজকে ভুলাইতেছিলেন। তাঁর মনের ভিতর যে গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, রঙ্গরাজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না—সুতরাং রঙ্গরাজকে তাহা বুঝাইলেন না। সরলভাবে ইংরেজকে ধরা দিবেন, ইহা স্থির

করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আপনার বুদ্ধিতে সব খোয়াইবে। ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, শত্রুর কোন অনিষ্ট করিবেন না, বরং শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তবে স্বামী, শ্বশুর, সখীদিগের উদ্ধারের জন্য যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও করিবেন ; যাহা যাহা হইবে, দেবী যেন দর্পণের ভিতর সকল দেখিতে পাইতেছিলেন।

রঙ্গরাজ বলিল, "যাহা দিয়া কোম্পানির লোক বশ করিবেন, তাহা ত বজরাতেই আছে। আপনি ধরা দিলে, ইংরেজ বজরাও লইবে।"

দেবী। সেইটি নিষেধ করিও। বলিও যে, আমি ধরা দিব, কিন্তু বজরা দিব না ; বজরায় যাহা আছে, তাহার কিছুই দিব না ; বজরায় যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। ইংরেজ যদি না শুনে, যদি বজরা লুঠিতে আসে ?

দেবী। বারণ করিও—বজরায় না আসে, বজরা না স্পর্শ করে। বলিও যে, তাহা করিলে ইংরেজের বিপদ্ ঘটিবে। বজরায় আসিলে আমি ধরা দিব না। যে মুহূর্ত্তে ইংরেজ বজরায় উঠিবে, সেই দণ্ডে আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানিবেন। আমার কথায় তিনি স্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের কাহাকে এখানে আসিতে হইবে না। আমি নিজে তাঁহার ছিপে যাইব।

রঙ্গরাজ বুঝিল, ভিতরে একটা কি গভীর কৌশল আছে। দৌত্যে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানী ঠাকুর কোথায় ?"

রঙ্গ। তিনি তীরে বরকন্দাজ লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আমার কথা শোনেন নাই। বোধ করি, এখনও সেইখানে আছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বরকন্দাজ লইয়া নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যাইতে বল। বলিও যে, আমার বজরার লোকগুলি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। আর বলিও যে, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—আমার রক্ষার জন্য ভগবান্ উপায় করিয়াছেন। ইহাতে যদি তিনি আপত্তি করেন, আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে বলিও—তিনি বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গরাজ তখন স্বয়ং আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, বৈশাখী নবীন নীরদ-মালায় গগন অন্ধকার হইয়াছে।

রঙ্গরাজ বলিল, "মা! আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজিকার গোইন্দা ; তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখিলাম। অভিপ্রায়টা মন্দ, সন্দেহ নাই। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি।"

শুনিয়া নিশি ও দিবা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবী বলিল, "বাঁধিও না। এখন গোপনে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে বল। পরে যখন দিবা নামিতে হুকুম দিবে, তখন নামিবেন।"

আজ্ঞামত রঙ্গরাজ আগে ব্রজেশ্বরকে ছাদে বসাইল। তার পর ভবানী ঠাকুরের কাছে গেল, এবং দেবী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল। রঙ্গরাজ মেঘ দেখাইল—ভবানী দেখিল। ভবানী আর আপত্তি না করিয়া, তীরের ও জলের বরকন্দাজ সকল জমা করিয়া লইয়া, ত্রিস্রোতার তীরে তীরে স্বস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিল।

এ দিকে দিবা ও নিশি, এই অবসরে বাহিরে আসিয়া, বরকন্দাজবেশী দাঁড়ী মাঝিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ দিকে ভবানী ঠাকুরকে বিদায় দিয়া, রঙ্গরাজ শাদা নিশান হাতে করিয়া, জলে নামিয়া লেফ্টেনাণ্ট্ সাহেবের ছিপে গিয়া উঠিল। শাদা নিশান হাতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে ছিপে উঠিলে, সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তোমরা শাদা নিশান দেখাইয়াছ, ধরা দিবে?"

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কি? যাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছেন, তিনিই ধরা দিবেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন?

রঙ্গ। দিবেন। তাই বলিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সা। আর তোমরা?

রঙ্গ। আমরা কারা?

সা। দেবী চৌধুরাণীর দল।

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব না।

সা। আমি দল শুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গ। এই দল কারা? কি প্রকারে এই হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল বেদল চিনিবেন?

যখন রঙ্গরাজ এই কথা বলিল, তখন ভবানী ঠাকুর বর্‌কন্দাজ সৈন্য লইয়া চলিয়া যান নাই। যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সাহেব বলিল, "এই হাজার বর্‌কন্দাজ সবাই ডাকাইত; কেন না, উহারা ডাকাইতের হইয়া সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।"

রঙ্গরাজ। উহারা যুদ্ধ করিবে না, চলিয়া যাইতেছে দেখুন।

সাহেব দেখিলেন, বর্‌কন্দাজ সৈন্য পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! তোমরা শাদা নিশানের ভাণ করিয়া পলাইতেছ?"

রঙ্গরাজ। সাহেব, ধরিলে কবে যে পলাইলাম? এখনও কেহ পলায় নাই। পার, ধর। শাদা নিশান ফেলিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া রঙ্গরাজ শাদা নিশান ফেলিয়া দিল। কিন্তু সিপাহীরা সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

সাহেব ভাবিতেছিলেন, "উহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া বৃথা। পিছু ছুটিতে ছুটিতে উহারা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিবে। একে রাত্রিকাল, তাহাতে মেঘাড়ম্বর, জঙ্গলে ঘোর অন্ধকার সন্দেহ নাই। আমার সিপাহীরা পথ চেনে না, বর্‌কন্দাজেরা পথ চেনে। সুতরাং তাহাদের ধরা সিপাহীর সাধ্য নহে।" কাজেই সাহেব সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "যাক্, উহাদের চাই না। যে কথা হইতেছিল, তাই হৌক, তোমরা সকলে ধরা দিবে?"

রঙ্গ। এক জনও না। কেবল দেবী রাণী।

সাহেব। পীষ্! এখন আর লড়াই করিবে কে? এই যে কয় জন, তাহারা কি আর পাঁচ শ সিপাহীর সঙ্গে লড়াই করিতে পারিবে? তোমার বর্‌কন্দাজ সেনা ও জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল, দেখিতেছি।

রঙ্গরাজ দেখিল, বাস্তবিক ভবানী ঠাকুরের সেনা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

রঙ্গরাজ বলিল, "আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। বজরা পাইবেন না, বজরায় যে ধন, তাহা পাইবেন না, আমাদের কাহাকেও পাইবেন না। কেবল দেবী রাণীকে পাইবেন।

সা। কেন?

রঙ্গ। তা জানি না।

সা। জান আর নাই জান, বজরা এখন আমার, আমি উহা দখল করিব।

রঙ্গ। সাহেব, বজরাতে উঠিও না, বজরা ছুঁইও না, বিপদ্ ঘটিবে।

সা। পুঃ! পাঁচ শ সিপাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারি লোকের কাছে বিপদ্!

এই বলিয়া সাহেব শাদা নিশান ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদের হুকুম দিলেন, "বজরা ঘেরাও কর।"

সিপাহীরা পাঁচখানা ছিপ সমেত বজরা ঘেরিয়া ফেলিল। তখন সাহেব বলিলেন, "বজরার উপর উঠিয়া বর্‌কন্দাজদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লও।"

এ হুকুম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে দিলেন। কথা দেবীর কাণে গেল। দেবীও বজরার ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিলেন, "বজরায় যাহার যাহার হাতে হাতিয়ার আছে, সব জলে ফেলিয়া দাও।"

শুনিবামাত্র, বজরায় যাহার যাহার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলিয়া দিল। রঙ্গরাজও আপনার অস্ত্র সকল জলে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "চল, এখন বজরায় গিয়া দেখি, কি আছে?"

রঙ্গ। সাহেব, আপনি জোর করিয়া বজরায় যাইতেছেন, আমার দোষ নাই।

সা। তোমার আবার দোষ কি?

এই বলিয়া সাহেব একজন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন। এটা বিশেষ সাহসের কাজ নহে; কেন না, বজরার উপর যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। সাহেব বুঝেন নাই যে, দেবীর স্থিরবুদ্ধিই শাণিত মহাস্ত্র; তার অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার দরজায় আসিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুই জনেই বিস্মিত হইলেন।

দেখিলেন, যে দিন প্রথম ব্রজেশ্বর বন্দী হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিন যেমন ইহার মনোহর সজ্জা, আজিও সেইরূপ; দেয়ালে তেমনি চারু চিত্র। তেমনি সুন্দর গালিচা পাতা। তেমনি আতরদান, গোলাবপাশ, তেমনি সোণার পুষ্পপাত্রে ফুল ভরা, সোণার আলবোলায় তেমনি মৃগনাভিগন্ধি তামাকু সাজা। তেমনি রূপার পুতুল, রূপার ঝাড়, সোণার শিকলে দোলান সোণার প্রদীপ। কিন্তু আজ একটা মসনদ নয়—দুইটা। দুইটা মসনদের উপর সুবর্ণমণ্ডিত উপাধানে দেহ রক্ষা করিয়া, দুইটি সুন্দরী রহিয়াছে। তাহাদের পরিধানে মহার্ঘ বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা। সাহেব তাদের চেনে না—রঙ্গরাজ চিনিল। চিনিল যে, একজন নিশি—আর একজন দিবা।

সাহেবের জন্য একখানা রূপার চৌকি রাখা হইয়াছিল, সাহেব তাহাতে বসিলেন। রঙ্গরাজ খুঁজিতে লাগিলেন, দেবী কোথা ? দেখিলেন, কামরার এক ধারে দেবীর সহজ বেশে দেবী দাঁড়াইয়া আছে, গড়া পরা, কেবল কড় হাতে, এলোচুল, কোন বেশভূষা নাই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেবী চৌধুরাণী ? কাহার সঙ্গে কথা কহিব ?"

নিশি বলিল, "আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। আমি দেবী।"

দিবা হাসিল, বলিল, "ইংরেজ দেখিয়া রঙ্গ করিতেছিস্ ? এ কি রঙ্গের সময় ? লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেব! আমার এ ভগিনী কিছু রঙ্গ তামাসা ভাল বাসে, কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিবেন—আমি দেবী চৌধুরাণী।"

নিশি বলিল, "আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসি যেতে চাস্ না কি ?" সাহেবের দিকে ফিরিয়া নিশি বলিল, "সাহেব, ও আমার ভগিনী—বোধ হয়, স্নেহবশতঃ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। কিন্তু কেমন করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, বহিনের প্রাণদণ্ড করিয়া, আপনার প্রাণ রক্ষা করিব ? প্রাণ অতি তুচ্ছ, আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, অক্লেশে ত্যাগ করিতে পারি। চলুন, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রাণী।"

দিবা বলিল, "সাহেব! তোমার যিশু খ্রীষ্টের দিব্য, তুমি যদি নিরপরাধিনীকে ধরিয়া লইয়া যাও। আমি দেবী।"

সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি তামাসা ? কে দেবী চৌধুরাণী, তুমি যথার্থ বলিবে ?"

রঙ্গরাজ কিছু বুঝিল না, কেবল অনুভব করিল যে, ভিতরে একটা কি কৌশল আছে। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া সে নিশিকে দেখাইয়া, হাত যোড় করিয়া বলিল, "হুজুর ! এই যথার্থ দেবী রাণী।"

তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। কিন্তু কি জানি, এর পর মিছা কথা ধরা পড়িলে, যদি সকলে মারা যায়, তাই বলিতেছি, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য নহে।" পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল, "এ দেবী নহে। যে উহাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে রাণীজিকে মা বলে, রাণীজিকে মার মত ভক্তি করে, এই জন্য সে রাণীজিকে বাঁচাইবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।"

তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী তবে কে ?"

দেবী বলিল, "আমি দেবী।"

দেবী এই কথা বলিলে নিশিতে, দিবাতে, রঙ্গরাজে ও দেবীতে বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। নিশি বলে, "আমি দেবী," দিবা বলে, "আমি দেবী," রঙ্গরাজ নিশিকে বলে, "এই দেবী," দেবী বলে, "আমি দেবী।" বড় গোলমাল।

তখন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব মনে করিলেন, এ ফেরেব্‌বাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত। বলিলেন, "তোমাদের দুই জনের মধ্যে এক জন দেবী চৌধুরাণী বটে। ওটা চাকরাণী, ওটা দেবী নহে। এই দুই জনের মধ্যে কে সে পাপিষ্ঠা, তাহা তোমরা চাতুরী করিয়া আমাকে জানিতে দিতেছ না। কিন্তু তাহাতে তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমি এখন দুই জনকেই ধরিয়া লইয়া যাইব। ইহার পর প্রমাণের দ্বারা যে দেবী চৌধুরাণী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, সেই ফাঁসি যাইবে। যদি প্রমাণের দ্বারা এ কথা পরিষ্কার না হয়, তবে দুই জনেই ফাঁসি যাইবে।"

তখন নিশি ও দিবা দুই জনেই বলিল, "এত গোলযোগে কাজ কি? আপনার সঙ্গে কি গোইন্দা নাই? যদি গোইন্দা থাকে, তবে তাহাকে ডাকাইলেই ত সে বলিয়া দিতে পারিবে,—কে যথার্থ দেবী চৌধুরাণী।"

হরবল্লভকে বজরায় আনিবে, দেবীর এই প্রধান উদ্দেশ্য। হরবল্লভের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, দেবী আত্মরক্ষার উপায় করিবে না, ইহা স্থির। তাঁহাকে বজরায় না আনিতে পারিলে হরবল্লভের রক্ষার নিশ্চয়তা হয় না।

সাহেব মনে করিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" তখন তাঁহার সঙ্গে যে সিপাহী আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "গোইন্দাকে ডাক।" সিপাহী এক ছিপের এক জন জমাদ্দার সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, "গোইন্দাকে ডাক।" তখন গোইন্দাকে ডাকাডাকির গোল পড়িয়া গেল। গোইন্দা কোথায়, গোইন্দা কে, তাহা কেহই জানে না, কেবল চারি দিকে ডাকাডাকি করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বস্তুতঃ হরবল্লভ রায় মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, ঘটনাধীন। প্রথমে বড় ঘেঁসেন নাই। "শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণীনাং" ইত্যাদি চাণক্য-প্রদত্ত সদুপদেশ স্মরণ করিয়া, তিনি সিপাহীদিগের ছিপে উঠেন নাই। একখানা পৃথক্ ডিঙ্গীতে থাকিয়া, লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেবকে বজরা দেখাইয়া দিয়া, অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পলাইয়া

গিয়া ডিঙ্গী ও প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তার পর দেখিলেন, আকাশে বড় ঘনঘটা। মনে করিলেন, ঝড় উঠিবে ও এখনই আমার ডিঙ্গী ডুবিয়া যাইবে, টাকার লোভে আসিয়া আমি প্রাণ হারাইব—আমার সৎকারও হইবে না। তখন রায় মহাশয় ডিঙ্গী হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তীরে সেখানে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া বড় ভয় হইল। সাপের ভয়, বাঘের ভয়, চোর ডাকাইতের ভয়, ভূতেরও ভয়। হরবল্লভের মনে হইল, কেন এমন ঝক্‌মারি করিতে আসিয়াছিলাম। হরবল্লভের কান্না আসিল।

এমন সময়ে হঠাৎ বন্দুকের হুড়মুড়ি, সিপাহী বর্‌কন্দাজের হৈ হৈ শব্দ সব বন্ধ হইয়া গেল। হরবল্লভের বোধ হইল, অবশ্য সিপাহীর জয় হইয়াছে, ডাকাইত মাগী ধরা পড়িয়াছে, নহিলে লড়াই বন্ধ হইবে কেন? তখন হরবল্লভ ভরসা পাইয়া যুদ্ধস্থানে যাইতে অগ্রসর হইলেন। তবে এ রাত্রিকালে, এ অন্ধকারে, এ বন জঙ্গলের মাঝে অগ্রসর হন কিরূপে? ডিঙ্গীর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু মাঝি,—বলি, ও দিকে যাওয়া যায় কিরূপে বল্‌তে পার?"

মাঝি বলিল, "যাওয়ার ভাবনা কি? ডিঙ্গীতে উঠুন না, নিয়ে যাচ্ছি। সিপাহীরা মার্‌বে ধর্‌বে না ত? আবার যদি লড়াই বাঁধে?"

হর। সিপাহীরা আমাদের কিছু বলিবে না। লড়াই আর বাঁধিবে না—ডাকাইত ধরা পড়েছে। কিন্তু যে রকম মেঘ করেছে, এখনই ঝড় উঠ্‌বে—ডিঙ্গীতে উঠি কিরূপে?

মাঝি বলিল, "ঝড়ে ডিঙ্গী কখন ডুবে না।"

হরবল্লভ প্রথমে সে সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন না—শেষ অগত্যা ডিঙ্গীতে উঠিলেন। মাঝিকে উপদেশ দিলেন, কেনারায় কেনারায় ডিঙ্গী লইয়া যাইবে। মাঝি তাহাই করিল। শীঘ্র আসিয়া ডিঙ্গী বজরায় লাগিল। হরবল্লভ সিপাহীদের সঙ্কেত-বাক্য জানিতেন, সুতরাং সিপাহীরা আপত্তি করিল না। সেই সময়ে "গোইন্দা! গোইন্দা!" করিয়া ডাকাডাকি হইতেছিল। হরবল্লভ বজরায় উঠিয়া সম্মুখস্থ আরদালির সিপাহীকে বলিল, "গোইন্দাকে খুঁজিতেছ? আমি গোইন্দা।"

সিপাহী বলিল, "তোমাকে কাপ্তেন সাহেব তলব করিয়াছেন।"

হর। কোথায় তিনি?

সিপা। কামরার ভিতর। তুমি কামরার ভিতর যাও।

হরবল্লভ আসিতেছে জানিতে পারিয়া, দেবী প্রস্থানের উদ্যোগ দেখিল। "কাপ্তেন সাহেবের জন্য কিছু জলযোগের উদ্যোগ দেখি" বলিয়া ভিতরের কামরায় চলিয়া গেল।

এ দিকে হরবল্লভ কামরার দিকে গেলেন। কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া কামরার সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য, দিবা ও নিশির রূপ ও সজ্জা দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে সেলাম্ করিতে গিয়া, ভুলিয়া নিশিকে সেলাম্ করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! মেজাজ সরিফ্?"

শুনিয়া দিবা বলিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুর্ণিস হলো না—আমি হলেম এদের রাণী।"

সাহেব হরবল্লভকে বলিলেন, "ইহারা ফেরেব্ করিয়া দুই জনেই বলিতেছে, 'আমি দেবী চৌধুরাণী।' কে দেবী চৌধুরাণী, তাহার ঠিকানা না হওয়ায়, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কে দেবী?"

হরবল্লভ বড় প্রমাদে পড়িলেন। ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিতর কখনও দেবীকে দেখেন নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া, 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ন মনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইল। সাহেব তখন গরম হইয়া উঠিয়া, হরবল্লভকে বলিলেন, "টোম্ বড়্জাট্—শূওর! তোম্ পছান্‌টে নেহি?"

তখন দিবা বলিল, "সাহেব, রাগ করিবেন না। উনি চেনেন না। উঁহার ছেলে চেনে। উঁহার ছেলে বজরার ছাদে বসিয়া আছে, তাহাকে আনুন—সে চিনিবে।"

হরবল্লভ আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "আমার ছেলে!"

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই।

হর। কোথা?

দিবা। ছাদে।

হর। ব্রজ এখানে কেন?

দিবা। তিনি বলিবেন।

সাহেব হুকুম দিলেন, "তাহাকে আন।"

দিবা রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত করিল। তখন রঙ্গরাজ ছাদে গিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, 'চল, দিবা ঠাকুরাণীর হুকুম।"

ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর আসিল। দেবীর হুকুম আগেই প্রচার হইয়াছিল, দিবার হুকুম পাইলেই ব্রজেশ্বর ছাদ হইতে নামিবে। এমনই দেবীর বন্দোবস্ত।

সাহেব ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দেবী চৌধুরাণীকে চেন?"

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে দেবী আছে?

ব্র। না।

সাহেব তখন রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কি, ইহারা দুই জনের এক জনও দেবী চৌধুরাণী নয়?"

ব্র। এরা তার দাসী।

সা। এঃ। তুমি দেবীকে চেন?

ব্র। বিলক্ষণ চিনি।

সা। যদি এরা কেহ দেবী না হয়, তবে দেবী অবশ্য এ বজরার কোথাও লুকাইয়া আছে। বোধ হয়, দেবী সেই চাকরাণীটা। আমি বজরা তল্লাশী করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে, আইস।

ব্র। সাহেব, তোমার বজরা তল্লাশ করিতে হয়, কর—আমি নিশানদিহি করিব কেন?

সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "কেঁও বদ্‌জাত্? তোম্ গোইন্দা নেহি?"

"নেহি।" বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত করিল।

"করিলে কি? করিলে কি? সর্ব্বনাশ করিলে?" বলিয়া, হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

"হুজুর। তুফান উঠা।" বলিয়া বাহির হইতে জমাদ্দার হাঁকিল।

সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল—ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আবার শাঁক বাজিল। এবার দুই ফুঁ।

বজরার নোঙ্গর ফেলা ছিল না—পূর্ব্বে বলিয়াছি, খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুই জন নাবিক বসিয়াছিল। যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপরে যে সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল,

তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল—কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল, পলক ফেলিতে না ফেলিতে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। দেবীর কৌশলে এক পলক মধ্যে সেই পাঁচ শত কোম্পানীর সিপাহী পরাস্ত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমাবধিই বজরায় চারিখানা পাল খাটান ছিল। বলিয়াছি যে, মধ্যে নিশি ও দিবা আসিয়া, নাবিকদিগকে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছিল। সেই উপদেশ অনুসারেই খোঁটার কাছে লোক বসিয়াছিল। আর সেই উপদেশ অনুসারে পালের কাছির কাছে চারি জন নাবিক বসিয়াছিল। শাঁকের শব্দ শুনিবা মাত্র তাহারা পালের কাছি সকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—যে দুই জন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গীন উঁচু হইয়া রহিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তার পর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে। লিখিতে এতক্ষণ লাগিল—কিন্তু এতখানা ঘটিল এক নিমেষ মধ্যে। সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুষি উঠাইয়াছেন মাত্র, ইহারই মধ্যে এতখানা সব হইয়া গেল। তাঁহারও হাতের ঘুষি হাতে রহিল, যেমন বজরা কাত হইল, অমনি সাহেব টলিয়া মুষ্টি-বদ্ধ-হস্তে দিবা সুন্দরীর পাদমূলে পতিত হইলেন। ব্রজেশ্বর খোদ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল,—এবং রঙ্গরাজ তাহার উপর পড়িয়া গেল। হরবল্লভ প্রথমে নিশি ঠাকুরাণীর ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে পদচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঙ্গরাজের নাগরা জুতায় আটকাইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, "নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে!"

কিন্তু নৌকা ডুবিল না—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। যাহারা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল—সাহেব আবার ঘুষি তুলিলেন। কিন্তু সাহেবের ফৌজ, যাহারা জলে দাঁড়াইয়াছিল, বজরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অনেকে জলে ডুবিয়া প্রাণরক্ষা করিল; কেহ দূর হইতে বজরা ঘুরিতেছে দেখিতে পাইয়া, পলাইয়া বাঁচিল; কেহ বা আহত হইল; কেহ মরিল না। ছিপগুলি বজরার নীচে পড়িয়া ডুবিয়া গেল—জল সেখানে এমন বেশী নহে—স্রোত বড় নাই—সুতরাং সকলেই বাঁচিল। কিন্তু বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না। নক্ষত্রবেগে উড়িয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে

পাইল না। সিপাহী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া, পাল উড়াইয়া চলিল, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর নিকট বন্দী হইল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধ জয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আমার রক্ষার উপায় ভগবান্‌ করিতেছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বজরা জলের রাশি ভাঙ্গিয়া, দুলিতে দুলিতে নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। শব্দ ভয়ানক। বজরার মুখে কৃত্ত তরঙ্গরাশির গর্জ্জন ভয়ানক—ঝড়ের শব্দ ভয়ানক। কিন্তু নৌকার গঠন অনুপম, নাবিকদিগের দক্ষতা ও শিক্ষা প্রসিদ্ধ। নৌকা এই ঝড়ের মুখে চারিখানা পাল দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। আরোহিবর্গ যাঁহারা প্রথমে কুষ্মাণ্ডাকারে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্বপদস্থ হইলেন। হরবল্লভ রায় মহাশয়, অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িত করিয়া, দুর্গানাম জপিতে আরম্ভ করিলেন, আবার না ডুবি। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব সেই মুলতবী ঘুষিটা আবার পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিলেন, অমনি ব্রজেশ্বর তাঁর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। হরবল্লভ ছেলেকে ভৎর্সনা করিলেন। বলিলেন, "ও কি কর, ইংরেজের গায়ে হাত তোল ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতেছি, না ইংরেজ আমার গায়ে তুলিতেছে ?"

হরবল্লভ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, আপনি ওর অপরাধ লইবেন না। মাফ করুন।"

সাহেব বলিলেন, "ও বড় বদ্‌মাস। তবে যদি আমার কাছে ও যোড়হাত করিয়া মাফ চায়, তবে আমি মাফ করিতে পারি।"

হরবল্লভ। ব্রজ, তাই কর। যোড়হাত করিয়া সাহেবকে বল, "আমায় মাফ করুন।"

ব্রজেশ্বর। সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে যোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া ব্রজেশ্বরকে ক্ষমা করিলেন; আর ব্রজেশ্বরের হাত লইয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিলেন। ব্রজেশ্বরের চতুর্দ্দশ পুরুষের

মধ্যে কখন জানে না, সেক্‌হ্যাণ্ড কাকে বলে—সুতরাং ব্রজেশ্বর একটু ভেকা হইয়া রহিল। মনে করিল, "কি জানি, যদি আবার বাঁধে।" এই ভাবিয়া ব্রজেশ্বর বাহিরে গিয়া বসিল। কেবল ঝড়,—বৃষ্টি বড় নাই,—ভিজিতে হইল না।

রঙ্গরাজও বাহিরে আসিয়া, কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল—দুই দিকের পাহারায়। বিশেষ এ সময় বাহিরে একটু সতর্ক থাকা ভাল, বজরা বড় তীব্র বেগে যাইতেছে, হঠাৎ বিপদ্ ঘটাও বিচিত্র নহে।

দিবা উঠিয়া দেবীর কাছে গেল—পুরুষ-মহলে এখন আর প্রয়োজন নাই। নিশি উঠিল না—তার কিছু মৎলব ছিল। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—সুতরাং অগাধ সাহস।

সাহেব ঝাঁকিয়া আবার রূপার চৌকিতে বসিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, "ডাকাইতের হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কাছে ধরা পড়িলাম—স্ত্রীলোকের কাছে পরাজিত হইলাম, ইংরেজ-মহলে আর কি বলিয়া মুখ দেখাইব? আমার না ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।"

হরবল্লভ আর বসিবার স্থান না পাইয়া নিশি সুন্দরীর মসনদের কাছে বসিলেন। দেখিয়া নিশি বলিল, "আপনি একটু নিদ্রা যাবেন?"

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয়?

নিশি। আজ না হইল ত আর হইল না।

হর। সে কি?

নিশি। আবার ঘুমাইবার দিন কবে পাইবেন?

হর। কেন?

নিশি। আপনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন?

হর। তা—তা—কি জান—

নিশি। ধরা পড়িলে দেবীর কি হইত, জান?

হর। আ—এমন কি—

নিশি। এমন কিছু নয়, ফাঁসি!

হর। তা—না—এই—তা কি জান—

নিশি। দেবী তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং ভারী উপকার করিয়াছিল—যখন তোমার জাতি যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়া, তোমায়

রক্ষা করিয়াছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাহাকে ফাঁসি দিবার চেষ্টায় ছিলে। তোমার যোগ্য কি দণ্ড বল দেখি?

হরবল্লভ চুপ করিয়া রহিল।

নিশি বলিতে লাগিল, "তাই বলিতেছিলাম, এই বেলা ঘুমাইয়া লও—আর রাত্রের মুখ দেখিবে না। নৌকা কোথা যাইতেছে বল দেখি?"

হরবল্লভের কথা কহিবার শক্তি নাই।

নিশি বলিতে লাগিল, "ডাকিনীর শ্মশান বলিয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানে লইয়া গিয়া মারি। বজরা এখন সেইখানে যাইতেছে। সেইখানে পৌঁছিলে সাহেব ফাঁসি যাইবে, রাণীজির হুকুম হইয়া গিয়াছে। আর তোমায় কি হুকুম হইয়াছে, জান?"

হরবল্লভ কাঁদিতে লাগিল—যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর।"

নিশি বলিল, "তোমায় রক্ষা করিবে, এমন পাষণ্ড পামর কে আছে? তোমায় শূলে দিবার হুকুম হইয়াছে।"

হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝড়ের শব্দ বড় প্রবল; সে কান্নার শব্দ ব্রজেশ্বর শুনিতে পাইল না—দেবীও না। সাহেব শুনিল। সাহেব কথাগুলা শুনিতে পায় নাই—কান্না শুনিতে পাইল। সাহেব ধমকাইল, "রোও মৎ—উল্লুক। মর্‌না এক রোজ আল্‌বৎ হ্যায়।"

সে কথা কাণে না তুলিয়া, নিশির কাছে যোড়হাত করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "হাঁ গা! আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা?"

নিশি। তোমার মত নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? আমাদের রাণী দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেহই তাঁর কাছে দয়ার ভিক্ষা করিব না।

হর। আমি লক্ষ টাকা দিব।

নিশি। মুখে আনিতে লজ্জা করে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করিয়াছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক?

হর। আমাকে যা বলিবে, তাই করিব।

নিশি। তোমার মত লোকের দ্বারা কোন্ কাজ হয় যে, তুমি, যা বলিব, তাই করিবে?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়—ওগো, কি করিতে হইবে বল, আমি প্রাণপণ করিয়া করিব—আমায় বাঁচাও।

নিশি। (ভাবিতে ভাবিতে) তোমার দ্বারাও আমার একটা উপকার হইলে হইতে পারে—তা তোমার মত লোকের দ্বারা সে উপকার না হওয়াই ভাল।

হর। তোমার কাছে যোড়হাত করিতেছি—তোমার হাতে ধরিতেছি—

হরবল্লভ বিহ্বল—নিশি ঠাকুরাণীর বাঁউড়ী-পরা গোলগাল হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! চতুরা নিশি আগে হাত সরাইয়া লইল—বলিল, "সাবধান! ও হাত শ্রীকৃষ্ণের গৃহীত। কিন্তু তোমার হাতে পায়ে ধরিয়া কাজ নাই—তুমি যদি এতই কাতর হইয়াছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা করিতে রাজি হইতেছি। কিন্তু তোমায় যা বলিব, তা যে তুমি করিরে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোইন্দাগিরি কর—তোমার কথায় বিশ্বাস কি?"

হর। যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিতেছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্য? কি দিব্য করিবে?

হর। গঙ্গাজল তামা তুলসী দাও—আমি স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেছি।

নিশি। ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার?

হরবল্লভ গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি তা পারিব না।"

কিন্তু এ তেজ ক্ষণিকমাত্র। হরবল্লভ আবার তখনই হাত কচ্‌লাইতে লাগিল—বলিল, "আর যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিব, রক্ষা কর।"

নিশি। আচ্ছা, দিব্য করিতে হইবে না—তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র যোটা ভার। আমার একটি পাত্র যুটিয়াছিল, (পাঠক জানেন, সব মিথ্যা) কিন্তু আমার ছোট বহিনের যুটিল না। আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।

হর। বয়স কত হইয়াছে?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে, এমন গতিক হইয়াছে। তুমি আমার বাপের পালটি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রাণীজির কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। আর একটা বিবাহ বৈ ত নয়—সেটা কুলীনের পক্ষে শক্ত কাজ নয়—তা যত বড় মেয়েই হৌক্ না কেন! নিশি যে উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল, হরবল্লভ ঠিক্ সেই উত্তর দিল, বলিল, "এ আর বড় কথা কি? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে একটা কথা এই, আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আর বিবাহের বয়স নাই। আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না?"

নিশি। তিনি রাজি হবেন?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে, আমি পাল্কী বেহারা আনিয়া আপনাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। আপনি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করিবেন। আমরা বরের বিবাহ দিয়া বৌ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।

হরবল্লভ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল—কোথায় শূলে যায়—কোথায় বৌভাতের ঘটা। হরবল্লভের আর দেরি সয় না। বলিল, "তবে তুমি গিয়া রাণীজিকে এ সকল কথা জানাও।"

নিশি বলিল, "চলিলাম।" নিশি দ্বিতীয় কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

নিশি গেলে, সাহেব হরবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীলোকটা তোমাকে কি বলিতেছিল?"

হর। এমন কিছুই না।

সাহেব। কাঁদিতেছিলে কেন?

হর। কই? কাঁদি নাই।

সাহেব। বাঙ্গালী এমনই মিথ্যাবাদী বটে।

নিশি ভিতরে আসিলে, দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শ্বশুরের সঙ্গে এত কি কথা কহিতেছিলে?"

নিশি। দেখিলাম, যদি তোমার শাশুড়ীগিরিতে বাহাল হইতে পারি।

দেবী। নিশি ঠাকুরাণি! তোমার মন প্রাণ, জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—কেবল জুয়াচুরিটুকু নয়। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছ।

নিশি। দেবতাকে ভাল সামগ্রীই দিতে হয়। মন্দ সামগ্রী কি দিতে আছে?

দেবী। তুমি নরকে পচিয়া মরিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিল ; নৌকাও থামিল। দেবী বজরার জানেলা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে। বলিলেন, "নিশি! আজ সুপ্রভাত!"

নিশি বলিল, "আমি আজ সুপ্রভাত!"

দিবা। তুমি অবসান, আমি সুপ্রভাত।

নিশি। যে দিন আমার অবসান হইবে, সেই দিনই আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই। আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত—কেন না, আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।

দিবা। ও কি কথা লো পোড়ারমুখী?

নিশি। কথা ভাল। দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল।

দেবী। তার এখনও দেরী ঢের। যা বলি, কর দেখি। বজরা বাঁধিতে বল দেখি।

নিশি হুকুম জারি করিল—মাঝিরা তীরে লাগাইয়া বজরা বাঁধিল। তার পর দেবী বলিল, "রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় আসিয়াছি? রঙ্গপুর কত দূর? ভূতনাথ কত দূর?"

রঙ্গরাজ জিজ্ঞাসায় বলিল, "এক রাত্রে চারি দিনের পথ আসিয়াছি। রঙ্গপুর এখান হইতে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গা-পথে ভূতনাথে এক দিনে যাওয়া যাইতে পারে।"

"পাল্কী বেহারা পাওয়া যাইবে?"

"আমি চেষ্টা করিলে সব পাওয়া যাইবে।"

দেবী নিশিকে বলিল, "তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।"

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কেন?

নিশি। শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া আছে, মনে নাই? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিতেছে না, দেখিতেছ না?

এই বলিয়া নিশি রঙ্গরাজকে ডাকিয়া, হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল, "সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণটাকে এখন শূলে দিয়া কাজ নাই। উহাকে পাহারাবন্দী করিয়া স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও।"

হরবল্লভ বলিলেন, "আমার উপর হুকুম কিছু হইয়াছে?"

নিশি চোক টিপিয়া বলিল, "আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। তুমি স্নানাহ্নিক করিয়া আইস।"

নিশি রঙ্গরাজের কাণে কাণে বলিল, "পাহারা মানে জল-আচরণী ভৃত্য।" রঙ্গরাজ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হরবল্লভকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দিল।

তখন দেবী নিশিকে বলিল, "সাহেবটাকে ছাড়িয়া দিতে বল। সাহেবকে রঙ্গপুর ফিরিয়া যাইতে বল। রঙ্গপুর অনেক দূর, এক শত মোহর উহাকে পথখরচ দাও, নহিলে এত পথ যাইবে কি প্রকারে?"

নিশি শত স্বর্ণ লইয়া গিয়া রঙ্গরাজকে দিল, আর কাণে কাণে উপদেশ দিল। উপদেশে দেবী যাহা বলিয়াছিল, তাহা ছাড়া আরও কিছু ছিল।

রঙ্গরাজ তখন দুই জন বর্কন্দাজ লইয়া আসিয়া সাহেবকে ধরিল। বলিল, "উঠ।"

সাহেব। কোথা যাইতে হইবে?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী—জিজ্ঞাসা করিবার কে?

সাহেব বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গরাজের পিছু পিছু দুই জন বর্কন্দাজের মাঝে চলিল। যে ঘাটে হরবল্লভ স্নান করিতেছিলেন, সেই ঘাট দিয়া তাহারা যায়।

হরবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "এই জঙ্গলে।"

হর। কেন?

রঙ্গ। জঙ্গলের ভিতর গিয়া উহাকে ফাঁসি দিব।

হরবল্লভের গা কাঁপিল। সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সব মন্ত্র ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যাহ্নিক ভাল হইল না।

রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল, "আমরা কাহাকে ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পিছনে আর লেগো না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।"

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তার পর ভাবিল, "ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙ্গালীর এত কি ভরসা?"

তার পর রঙ্গরাজ বলিল, "সাহেব! রঙ্গপুর অনেক পথ, যাবে কি প্রাকরে?"

সাহেব। যে প্রকারে পারি।

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া ঘোড়া কেন—নয় পাল্কী কর। তোমাকে আমাদের রাণী এক শত মোহর পথখরচ দিয়াছেন।

রঙ্গরাজ মোহর গণিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচ থান মোহর লইয়া আর লইল না। বলিল, "ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ্জ লইলাম।"

রঙ্গরাজ। আচ্ছা, আমরা যদি তোমার কাছে আদায় কর্‌তে যাই ত শোধ দিও। আর তোমার সিপাহী যদি কেহ জখম হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দিও। যদি কেহ মরিয়া থাকে, তবে তাদের ওয়ারেশকে পাঠাইয়া দিও।

সাহেব। কেন?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রাণী কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

সাহেব বিশ্বাস করিল না। ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গরাজ তখন পাল্কী বেহারার সন্ধানে গেল। তার প্রতি সে আদেশও ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এ দিকে পথ সাফ দেখিয়া, ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

দেবী বলিল, "ভাল হইল, দেখা দিলে। তোমার কথা ভিন্ন আজিকার কাজ হয় না। তুমি প্রাণ রাখিতে হুকুম দিয়াছিলে, তাই প্রাণ রাখিয়াছি। দেবী মরিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী আর নাই। কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে?"

ব্রজেশ্বর আদর করিয়া প্রফুল্লের মুখচুম্বন করিল। বলিল, "তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও—আমি যাইব না।"

প্রফুল্ল। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করিয়া তাঁকে আগে পাঠাইয়া দাও। আমরা পশ্চাৎ যাইব।

প্র। পাল্কী বেহারা আনিতে গিয়াছে।

পাল্কী বেহারা শীঘ্রই আসিল। হরবল্লভও সন্ধ্যাহ্নিক সংক্ষেপে সারিয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, নিশি ঠাকুরাণী ক্ষীর, ছানা, মাখন ও উত্তম সুপক্ক আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল তাঁহার জলযোগের জন্য সাজাইতেছে। নিশি অনুনয় বিনয় করিয়া,

তাঁহাকে জলযোগে বসাইল। বলিল, "এখন আপনি আমার কুটুম্ব হইলেন; জলযোগ না করিয়া যাইতে পারিবেন না।"

হরবল্লভ জলযোগে না বসিয়া বলিল, "ব্রজেশ্বর কোথায়? কাল রাত্রে বাহিরে উঠিয়া গেল—আর তাকে দেখি নাই।"

নিশি। তিনি আমার ভগিনীপতি হইবেন—তাঁর জন্য ভাবিবেন না। তিনি এইখানেই আছেন—আপনি জলযোগে বসুন; আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সেই কথাটা তাঁকে বলিয়া যাউন।

হরবল্লভ জলযোগে বসিল। নিশি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ভিতরের কামরা হইতে ব্রজেশ্বর বাহির হইল দেখিয়া উভয়ে কিছু অপ্রতিভ হইলেন। হরবল্লভ ভাবিলেন, আমার চাঁদপানা ছেলে দেখে, ডাকিনী বেটীরা ভুলে গিয়েছে। ভালই।

ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে এখানে কি প্রকারে আসিলে, আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক্—সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরাণীটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ আমাদেরই পালটি—তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—পাত্র পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ—মুটে মজুরের ত কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্ব্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড় বউমাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি। তাই বল্‌ছিলাম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্ত্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।"

ব্রজেশ্বর মোটের উপর বলিল, "যে আজ্ঞা।"

নিশির বড় হাসি পাইল, কিন্তু হাসিল না। হরবল্লভ বলিতে লাগিলেন, "তা আমার পাল্কী বেহারা এসেছে, আমি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করি। তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করে বৌ নিয়ে বাড়ী যেও।"

ব্র। যে আজ্ঞা।

হর। তা তোমায় আর বলিব কি, তুমি ছেলেমানুষ নও—কুল, শীল, জাতি, মর্য্যাদা, সব আপনি দেখে শুনে বিবাহ কর্‌বে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা গণ্ডা, তাও ত জান?

ব্রজ। যে আজ্ঞা।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় হইলেন। ব্রজ ও নিশি তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি পাল্কীতে চড়িয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুর্গানাম করিয়া প্রাণ পাইলেন। ভাবিলেন, "ছেলেটি ডাকিনী বেটীদের হাতে রহিল—তা ভয় নাই। ছেলে আপনার পথ চিনিয়াছে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়।"

হরবল্লভ চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বর নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ছল? তোমার ছোট বোন্ কে?"

নিশি। চেন না? তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজ। ও হো! বুঝিয়াছি। কি রকমে এ সম্বন্ধে কর্ত্তাকে রাজি করিলে?

নিশি। মেয়েমানুষের অনেক রকম আছে। ছোট বোনের শাশুড়ী হইতে নাই, নহিলে আরও একটা সম্বন্ধে তাঁকে রাজি করিতে পারিতাম।

দিবা রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি শীগ্‌গির মর। লজ্জা সরম কিছুই নাই? পুরুষমানুষের সঙ্গে কি অমন করে কথা কহিতে হয়?"

নিশি। কে আবার পুরুষমানুষ? ব্রজেশ্বর? কাল দেখা গিয়াছে—কে পুরুষ, কে মেয়ে।

ব্র। আজিও দেখিবে। তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত মোটা বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। কাজটা ভাল হয় নাই।

নিশি। সে আবার কি?

ব্র। বাপের সঙ্গে কি প্রবঞ্চনা চলে? বাপের চোখে ধূলা দিয়া, মিছে কথা বহাল রাখিয়া, আমি স্ত্রী লইয়া সংসার করিব? যদি বাপকে ঠকাইলাম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জুয়াচুরি করিতে আমার আটকাইবে?

নিশি অপ্রতিভ হইল, মনে মনে স্বীকার করিল, ব্রজেশ্বর পুরুষ বটে। কেবল লাঠিবাজিতে পুরুষ হয় না, নিশি তা বুঝিল। বলিল, "এখন উপায়?"

ব্র। উপায় আছে। চল, প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে যাই। সেখানে গিয়া বাপকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। লুকাচুরি হইবে না।

নিশি। তা হইলে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরাণীকে বাড়ীতে উঠিতে দিবেন?

দেবী বলিল, "দেবী চৌধুরাণী কে? দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না। প্রফুল্লের কথা বল।"

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দিবেন?
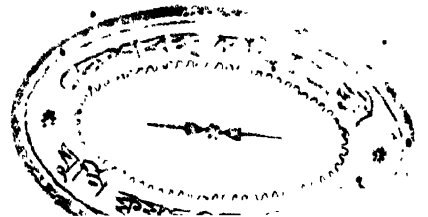
ব্র। আমি ত বলিয়াছি যে, সে ভার আমার।

প্রফুল্ল সন্তুষ্ট হইল। বুঝিয়াছিল যে, ব্রজেশ্বরের ভার বহিবার ক্ষমতা না থাকিলে, সে ভার লইবার লোক নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তখন ভূতনাথে যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রঙ্গরাজকে সেইখান হইতে বিদায় দিবার কথা স্থির হইল। কেন না, ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা এক দিন তাহার লাঠি খাইয়াছিল, যদি দেখিতে পায়, তবে চিনিবে। রঙ্গরাজকে ডাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, কতক নিশি বুঝাইল, কতক প্রফুল্ল নিজে বুঝাইল। রঙ্গরাজ কাঁদিল;— বলিল, "মা, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন, তা ত কখনও জানিতাম না।" সকলে মিলিয়া রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা করিল। দেবীগড়ে প্রফুল্লের ঘর বাড়ী, দেবসেবা, দেবত্র সম্পত্তি ছিল। সে সকল প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে দিলেন, বলিলেন, "সেইখানে গিয়া বাস কর। দেবতার ভোগ হয়, প্রসাদ খাইয়া দিনপাত করিও। আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও— কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও। এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ হইতে ভবানী ঠাকুরকেও বলিও; তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও।"

রঙ্গরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল। দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। সেই বজরায় ফিরিয়া তাহারা দেবীগড়ে গিয়া বাস করিবে, প্রসাদ খাইবে আর হরিনাম করিবে। বজরায় দেবীর রাণীগিরির আসবাব সব ছিল, পাঠক দেখিয়াছেন। তাহার মূল্য অনেক টাকা। প্রফুল্ল সব দিবা ও নিশিকে দিলেন। বলিলেন, "এ সকল বেচিয়া যাহা হইবে, তাহার মধ্যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন, ব্যয় করিবে। বাকী দরিদ্রকে দিবে। এ সকল আমার কিছুই নয়—আমি ইহার কিছুই লইব না।" এই বলিয়া প্রফুল্ল আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারগুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন।

নিশি বলিল, "মা! নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ী উঠিবে?"

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি, মা?"

নিশি বলিল, "আজ তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছ; আমি আজ তোমাকে কিছু যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। তুমি মানা করিও না, এই আমার শেষের সাধ—সাধ মিটাইতে দাও।"

এই বলিয়া নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নিশি যখন এক রাজমহিষীর কাছে থাকিত, রাজমহিষী তাহাকে অনেক অলঙ্কার দিয়াছিলেন। এ সেই গহনা। দেবী তাহাকে নূতন গহনা দিয়াছিলেন বলিয়া সেগুলি নিশি পরিত না। এক্ষণে দেবীকে নিরাভরণা দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তার পর আর কোন কাজ নাই, কাজেই তিন জনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহনা পরাইবার সময়েই সুর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন। তার পর পোঁ সানাই ছাপাইয়া উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল—না কাঁদিবার কথা কি? তিন জনের আন্তরিক ভালবাসা ছিল; কিন্তু প্রফুল্লের মন আহ্লাদে ভরা, কাজেই প্রফুল্ল অনেক নরম গেল। নিশিও দেখিল যে, প্রফুল্লের মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, কান্নায় সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে যাহার যে ত্রুটি হইল, দিবা ঠাকুরাণী তাহা সারিয়া লইলেন।

যথাকালে বজরা ভূতনাথের ঘাটে পেঁছিল। সেইখানে দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বজরায় ফিরিয়া যথাকালে দেবীগড়ে পেঁছিল। দাঁড়ি মাঝি বরকন্দাজের বেতন হিসাব করিয়া দিয়া, তাহাদের জবাব দিল। বজরাখানি রাখা অকর্ত্তব্য—চেনা বজরা। প্রফুল্ল বলিয়া দিয়াছিল, "উহা রাখিও না।" নিশি বজরাখানাকে চেলা করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া পোড়াইল।

এই চেলা কাঠের উপঢৌকন দিয়া পাঠক মহাশয় নিশি ঠাকুরাণীর কাছে বিদায় লউন। অনুপযুক্ত হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লের বজরা ভিড়িবামাত্র, কে জানে কোথা দিয়া, গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, ব্রজেশ্বর আবার একটা বিয়ে করে এনেছে; বড় না কি ধেড়ে বৌ। সুতরাং ছেলে বুড়ো, কাণা খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল। যে রাঁধিতেছিল, সে

হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল; যে মাছ কুটিতেছিল, সে মাছে চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল; যে স্নান করিতেছিল, সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল। যে খাইতে বসিয়াছিল, তার আধপেটা বৈ খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হঠাৎ তার মিল হইয়া গেল। যে মাগী ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মার কোলে উঠিয়া ধেড়ে বৌ দেখিতে চলিল। কাহারও স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল তরকারী পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই, এমন সময়ে বৌয়ের খবর আসিল, আর তাঁর কপালে সে দিন মাছের ঝোল হইল না। এইমাত্র বুড়ী নাতিনীর সঙ্গে কাজিয়া করিতেছিল যে, "আমার হাত ধরিয়া না নিয়ে গেলে, আমি কেমন করে পুকুরঘাটে যাই?" এমন সময়ে গোল হইল—বৌ এসেছে, অমনি নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল, আয়িও কোন রকমে সেইখানে উপস্থিত। এক যুবতী মার কাছে তিরস্কার খাইয়া শপথ করিতেছিলেন যে, তিনি কখন বাহির হন না, এমন সময়ে বৌ আসার সংবাদ পৌঁছিল, শপথটা সম্পূর্ণ হইল না; যুবতী বৌয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মা শিশু ফেলিয়া ছুটিল, শিশু মার পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। ভাশুর, স্বামী বসিয়া আছে, ভ্রাতৃবধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খসিয়া পড়ে, আঁটিয়া পরিবার অবকাশ নাই। চুল খুলিয়া পড়ে, জড়াইবার অবকাশ নাই। সামলাইতে কোথাকার কাপড় কোথায় টানেন, তারও বড় ঠিক নাই। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লজ্জায় লজ্জাদেবী পলায়ন করিলেন।

বর-কন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে, গিন্নী বরণ করিতেছেন। বৌয়ের মুখ দেখিবার জন্য লোকে ঝুঁকিয়াছে, কিন্তু বৌ বৌগিরির চাল ছাড়ে না, দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছে, কেহ মুখ দেখিতে পায় না। শাশুড়ী বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "বেস্ বউ।" তাঁর চোখে একটু জল আসিল।

বরণ হইয়া গেলে, বধূ ঘরে তুলিয়া শাশুড়ী সমবেত প্রতিবাসিনীদিগকে বলিলেন, "মা! আমার বেটা বউ অনেক দূর থেকে আসিতেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। আমি এখন ওদের খাওয়াই দাওয়াই। ঘরের বউ ত ঘরেই রহিল, তোমরা নিত্য দেখ্‌বে; এখন ঘরে যাও, খাও দাও গিয়া।"

গিন্নীর এই বাক্যে অপ্রসন্ন হইয়া নিন্দা করিতে করিতে প্রতিবাসিনীরা ঘরে গেল। দোষ গিন্নীর, কিন্তু নিন্দাটা বধূরই অধিক হইল; কেন না, বড় কেহ মুখ দেখিতে পায়

নাই। ধেড়ে মেয়ে বলিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিল। আবার সকলেই বলিল, "কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।" তখন যে যেখানে কুলীনের ঘরে বুড় বৌ দেখিয়াছে, তার গল্প করিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যা পঞ্চান্ন বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করিয়াছিল, হরি চাটুয্যা সত্তর বৎসরের এক কুমারী ঘরে আনিয়াছিলেন, মনু বাঁড়ুয্যা একটি প্রাচীনার অন্তর্জলে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল আখ্যায়িকা সালঙ্কারে পথিমধ্যে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপ আন্দোলন করিয়া ক্রমে গ্রাম ঠাণ্ডা হইল।

গোলমাল মিটিয়া গেল; গিন্নী বিরলে ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, "কি মা?"

গিন্নী। বাবা, এ বৌ কোথা পেলে, বাবা?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয়, মা।

গিন্নী। বাবা, এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাবা?

গিন্নীর চোখে জল পড়িতেছিল।

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন। এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জ্জনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক্। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারও কাছে কিছু বলিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

পাকস্পর্শ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। বড় ঘটা পটা কিছু হইল না, কেবল জনকতক আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য্য সমাধা করিলেন।

পাকস্পর্শের পর গিন্নী আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।"

হরবল্লভ চমকিয়া উঠিল—সুপ্ত ব্যাঘ্রকে কে যেন বাণে বিঁধিল। "অ্যাঁ, সেই বড় বউ—কে বল্লে?"

গিন্নী। আমি চিনেছি। আর ব্রজও আমাকে বলিয়াছে।

হর। সে যে দশ বৎসর হলো ম'রে গেছে।

গিন্নী। মরা মানুষেও কখন ফিরে থাকে?

হর। এত দিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে আমার ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটি ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। যদি তুমি কোন কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, "তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক্।"

গিন্নী বলিলেন, "তাই থাকিবে।"

সময়ান্তরে গিন্নী ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন। বলিলেন, "আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম। তিনি কোন কথা কহিবেন না। সে সব কথার আর কোন উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।"

ব্রজ হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে খবর দিল।

আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নী সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন। গিন্নীরও সাধ, তিনটি বৌ একত্র করেন।

যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে। সাগরের বড় ঘৃণা হইল। "ছি! বুড়ো মেয়ে!" বড় রাগ হইল, "আবার বিয়ে?—আমরা কি স্ত্রী নই?" দুঃখ হইল, "হায়! বিধাতা কেন আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই—আমি কাছে থাকিতে পারিলে, তিনি হয় ত আর বিয়ে করিতেন না।"

এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্নভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিল। আসিয়াই প্রথমে নয়ান বৌয়ের কাছে গেল। নয়ান বৌ, সাগরের দুই চক্ষের বিষ; সাগর বৌ, নয়ানেরও তাই। কিন্তু আজ দুই জন এক, দুই জনের এক বিপদ্। তাই ভাবিয়া সাগর আগে নয়নতারার কাছে গেল।

সাপকে হাঁড়ির ভিতর পূরিলে, সে যেমন গর্জ্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। একবার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্লও ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। স্বামী সপত্নী দূরে থাক্, পাড়াপ্রতিবাসীও সে কয় দিন নয়নতারার কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই। নয়নতারার কতকগুলি ছেলে মেয়ে হইয়াছিল। তাদেরই বিপদ্ বেশী। এ কয় দিন মার খাইতে খাইতে তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সেই দেবীর শ্রীমন্দিরে প্রথম সাগর গিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া নয়নতারা বলিল, "এসো, এসো। তুমি বাকী থাক কেন? আর ভাগীদার কেউ আছে?"

সাগর। কি! আবার না কি বিয়ে করেছে?

নয়ন। কে জানে, বিয়ে কি নিকে, তার খবর আমি কি জানি?

সাগর। বামনের মেয়ের কি আবার নিকে হয়?

নয়ন। বামন, কি শূদ্র, কি মুসলমান, তা কি আমি দেখ্তে গেছি?

সাগর। অমন কথাগুলো মুখে এনো না। আপনার জাত বাঁচিয়ে সবাই কথা কয়।

নয়ন। যার ঘরে অত বড় কনে বৌ এলো, তার আবার জাত কি?

সাগর। কত বড় মেয়ে? আমাদের বয়স হবে?

নয়ন। তোর মার বয়সী।

সাগর। চুল পেকেছে?

নয়ন। চুল না পাক্‌লে আর রাত্রি দিন বুড়ো মাগী ঘোম্‌টা টেনে বেড়ায়?

সা। দাঁত পড়েছে?

ন। চুল পাক্‌লো, দাঁত আর পড়ে নি?

সা। তবে স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় বল?

ন। তবে শুন্‌চিস্ কি?

সা। তাও কি হয়?

ন। কুলীনের ঘরে এ সব হয়।

সা। দেখতে কেমন ?

ন। রূপের ধ্বজা ! যেন গালফুলো গোবিন্দের মা।

সা। যে বিয়ে ক'রেছে, তাকে কিছু বল নি ?

ন। দেখ্‌তে পাই কি ? দেখ্‌তে পেলে হয়। মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি।

সা। আমি তবে সে সোণার প্রতিমাখানা দেখে আসি।

ন। যা, জন্ম সার্থক কর্‌গে, যা।

নূতন সপত্নীকে খুঁজিয়া, সাগর তাহাকে পুকুর-ঘাটে ধরিল। প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল। সাগর পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি আমাদের নূতন বৌ ?"

"কে, সাগর এয়েছ ?" বলিয়া নূতন বৌ সমুখ ফিরিল।

সাগর দেখিল, কে। বিস্ময়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী রাণী ?"

প্রফুল্ল বলিল, "চুপ্‌ ! দেবী মরিয়া গিয়াছে।"

সা। প্রফুল্ল ?

প্র। প্রফুল্লও মরিয়াছে।

সা। কে তবে তুমি ?

প্র। আমি নূতন বৌ।

সা। কেমন ক'রে কি হলো, আমায় সব বল দেখি।

প্র। এখানে বলিবার জায়গা নয়। আমি একটি ঘর পাইয়াছি, সেইখানে চল, সব বলিব।

দুই জনে দ্বার বন্ধ করিয়া, বিরলে বসিয়া, কথোপকথন হইল। প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে ? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে ? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে ? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুম-বর্‌দারি কি তার ভাল লাগিবে ?"

প্র। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম ; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন

নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।

সা। তবে কিছু দিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।

যখন সাগরের সঙ্গে প্রফুল্লের এই কথা হইতেছিল, তখন ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে ব্রজেশ্বর ভোজনে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেজ, এখন কেমন রাঁধি?"

ব্রজেশ্বরের সেই দশ বছরের কথা মনে পড়িল। কথাগুলি মূল্যবান্—তাই দুই জনেরই মনে ছিল।

ব্রজ বলিল, "বেস্।"

ব্রহ্ম। এখন গোরুর দুধ কেমন? বেগড়ায় কি?

ব্রজ। বেস্ দুধ।

ব্রহ্ম। কই, দশ বৎসর হলো—আমায় ত গঙ্গায় দিলি না?

ব্রজ। ভুলে গিছিলেম।

ব্রহ্ম। তুই আমায় গঙ্গায় দিস্ নে। তুই বাগ্দী হয়েছিস্।

ব্রজ। ঠান্‌দিদি! চুপ্। ও কথা না।

ব্রহ্ম। তা দিস্, পারিস্ ত গঙ্গায় দিস্। আমি আর কথা কব না। কিন্তু ভাই, কেউ যেন আমার চর্‌কা টর্‌কা ভাঙ্গে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না,

তাহার বুদ্ধিবিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মঠাকুরাণীও রান্নাঘরের কর্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ী আর বড় রাঁধিতে পারে না, তিন বৌ রাঁধে; কিন্তু যে দিন প্রফুল্ল তুই একখানা না রাঁধিত, সে দিন কাহারও অন্ন ব্যঞ্জন ভাল লাগিত না। যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধপেটা খাইলাম। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে কোন্দল করিতে আসিত না। বরং প্রফুল্লের ভয়ে আর কাহারও সঙ্গে কোন্দল করিতে সাহস করিত না। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোণা হইত। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর-পরিচয়ও আছে। গৃহধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।

প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ, সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা; তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?" ব্রজেশ্বর তা শুনিত না। ব্রজেশ্বরের হৃদয় কেবল প্রফুল্লময়। প্রফুল্ল বলিত, 'আমায় যেমন ভালবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।" ব্রজেশ্বর তা বুঝিত না।

প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্ম্মও তাহার হাতে আসিল। তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে, কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে, কর্ত্তা আসিয়া গিন্নীকে বলিতেন, "নূতন বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন ?" প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিন দিন লক্ষ্মী-শ্রী বাড়িতে লাগিল। শেষ যথাকালে ধন জন ও সর্ব্বসুখে পরিবৃত হইয়া হরবল্লভ পরলোকে গমন করিলেন।

বিষয় ব্রজেশ্বরের হইল। প্রফুল্লের গুণে ব্রজেশ্বরের নূতন তালুক মুলুক হইয়া হাতে অনেক নগদ টাকা জমিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ কর।"

ব্র। কেন, তুমি টাকা লইয়া কি করিবে ?

প্র। আমি কিছু করিব না। কিন্তু টাকা আমার নয়—শ্রীকৃষ্ণের ;—কাঙ্গাল গরিবের। কাঙ্গাল গরিবকে দিতে হইবে।

ব্র। কি প্রকারে ?

প্র। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা কর।

ব্রজেশ্বর তাই করিল। অতিথিশালামধ্যে এক অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অতিথিশালার নাম দিল, "দেবীনিবাস।"

যথাকালে পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত হইয়া, প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল, "আমরা মাতৃহীন হইলাম।"

রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি, দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভোজনে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া, পরলোকে গমন করিলেন। ভবানী ঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না।

ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।

এখন এসো, প্রফুল্ল। একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

'দেবী চৌধুরাণী'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ

'দেবী চৌধুরাণী' 'বঙ্গদর্শনে'র ৯৯ সংখ্যায় (পৌষ, ১২৮৯) সুরু হইয়া ১০৬ সংখ্যা (মাঘ, ১২৯০) পর্য্যন্ত অংশতঃ প্রকাশিত হয়। ১০৬ সংখ্যার পর বঙ্কিম-যুগের 'বঙ্গদর্শন' আর বাহির হয় নাই বলিয়া 'দেবী চৌধুরাণী'ও অসমাপ্ত রহিয়া যায়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম খণ্ড সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, মে) সম্পূর্ণ গ্রন্থ একেবারে পুস্তকাকারে বাহির করেন। ইহা "৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত" ও "শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত" হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তক মোট তিন খণ্ডে (১৬+১২+১৪) বিয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে ২০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। নিতান্ত পরিণত বয়সের রচনা হওয়া সত্ত্বেও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত অংশ পুস্তকাকারে যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের নিত্যপরিবর্ত্তনপ্রয়াসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের নবম হইতে সপ্তদশ, এই নয় পরিচ্ছেদকে তিনি যে শুধু ভাঙিয়া আট পরিচ্ছেদেই শেষ করিয়াছেন, তাহা নয়, আগাগোড়া একেবারে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ আমাদের আলোচনার বিষয় নহে বলিয়া এই সকল বিচিত্র পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল না।

বঙ্কিমের জীবিতকালে 'দেবী চৌধুরাণী'র ছয়টি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল; পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্র ইহার খুব বেশী পরিবর্ত্তন করেন নাই। দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯১, পৃ. ২০৬) প্রথম সংস্করণের হুবহু অনুরূপ। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫এ জানুয়ারি প্রকাশিত হইয়াছিল, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৩। চতুর্থ সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই বাহির হইয়াছিল, আমরা এই সংস্করণ একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পঞ্চম (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) ও ষষ্ঠ (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) সংস্করণ অনেকটা এক, দুইটিই ২৩১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন যাহা লক্ষিত হয়, তাহা ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ সংস্করণে সাধিত হইয়াছে—দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে (পৃ. ৯৭ দ্রষ্টব্য) যে দুইটি অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে, পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত তাহা বরাবরই ছিল। প্রথম সংস্করণের "ডাকাত" ষষ্ঠ সংস্করণের প্রায় সর্ব্বত্র "ডাকাইত" হইয়াছে।

প্রথম ও ষষ্ঠ সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

পৃ. ১৪, পংক্তি ১৫-১৮, '—থাকি, যদি—...কিসে হবে ভাই ?' ছত্র কয়টির স্থলে ছিল—

সা। একবার দেখা করবে না ?

প্র। কার সঙ্গে ? তোমার সঙ্গে ?

সা। দূর ! যেন হাবি। শ্বশুরবাড়ী এসে কি কেবল সতীনের সঙ্গে দেখা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যেন দেখা করতে হয় না।

পৃ. ১৪, প. ১৯-২১, 'চক্ষে জল পড়িল।...নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি' কথা কয়টির স্থলে ছিল—

বলিল, "বুঝি নাই ভাই—স্বামীর সঙ্গে ? তা কি কপালে ঘটিবে ?"

সা। আমি ঘটাইব। তুমি

পৃ. ৩৬, প. ১৬, 'মাতাপিতার' কথাটির স্থলে 'বংশাবলীর' ছিল।

পৃ. ৪৪, প. ১৮, '*' চিহ্নটি প্রথম সংস্করণে ছিল, কিন্তু পাদটীকা ছিল না।

পৃ. ৪৯, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের প্রথম প্যারাটি ছিল না এবং দ্বিতীয় প্যারার প্রথমে 'সে রাত্রে' কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৫৬, প. ১৮, 'করিবে।' কথাটির পর ছিল—

কোন কর্ম্মের শুভ ফল নিজে প্রাপ্ত হইবার কামনা করিবে না।

পৃ. ৬৫, প. ৫, 'গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু' স্থলে 'গালিচাখানি চারি আঙ্গুল পুরু' ছিল।

পৃ. ৬৫, প. ২৭, 'সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে' স্থলে 'সুগন্ধি তৈলের গন্ধে' ছিল।

পৃ. ৬৭, প. ৪, 'উজাইয়া যাও।' কথাগুলির পর 'পিছন হইতে।' কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৭২, ১৭ পংক্তির পর নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরটি ছিল।

দেবী। তোমাদের কেহ মারা পড়িয়াছে ?

রঙ্গ। না।

পৃ. ৯০, প. ২১, 'ডাকাত ! ছি !' কথা দুইটির পর ছিল—

আমি মরিলাম ন কেন ? প্রফুল্ল মরিল না কেন ?

পৃ. ৯৭, প. ৬, 'পদবন্দনা করিলেন।' কথাগুলির পর ছিল—

ব্রজেশ্বর মনে মনে স্থির সংকল্প করিয়াছিলেন যে, এ ডাকাইতির টাকা স্পর্শ করা যাইবে না—"তাহা হইলে আমরা সেই পাপীয়সীর"—হায় প্রফুল্ল এখন পাপীয়সী!—"পাপীয়সীর পাপের ভাগী হইব।" কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিই সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণ হইল।

পৃ. ৯৭, প. ১১, 'আমার শ্বশুর টাকা দিতে' কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

ব্রজেশ্বর যদি বলেন যে, "টাকা পাই নাই" তবে স্পষ্ট মিথ্যা কথা হয়। ব্রজেশ্বর যদি এ কালের ছেলে হইতেন, তবে ইংরেজি পড়িয়া "Lie direct" সম্বন্ধে এ স্থলে কি বিবেচনা করিতেন, বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রজেশ্বর সে কেলে ছেলে—একটা "Lie direct" সম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আর যেখানে ব্রজেশ্বর মিথ্যা কথা বলিতে পারুক আর না পারুক, বাপেব সম্মুখে নহে। মুখ দিয়া কখনও বাহির হয় নাই। ব্রজেশ্বর বলিতে পারিল না, টাকা পাই নাই। ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া হরবল্লভ হতাশ্বাস হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, চুপ কবিয়া থাকাও মিথ্যাবাদ হইতেছে। ব্রজেশ্বব টাকা আনিয়াছেন, অথচ তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরবল্লভ বুঝিতেছেন যে, ব্রজ টাকা আনে নাই। ব্রজেশ্বরের মোটা বুদ্ধিতে বোধ হইল যে, আমি বাপকে প্রবঞ্চনা কবিতেছি। আমাব মাৰ্জ্জিতবুদ্ধি, মাৰ্জ্জিতরুচি, মাৰ্জ্জিতপাদুক একেলে ইংরেজিনবিসের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধ হইত যে, "আমি ত মিছে কিছুই বলি নাই—যেটুকু বলিয়াছি, সাঁচা সত্য। তবে দেবী চৌধুরাণীর টাকার কথা আমি বলিতে বাধ্য নই—কেন না, সে টাকা ত আনিবার কোন কথাও ছিল না, আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও হয় নাই। আর সে ডাকাতির টাকা—গ্রহণ করিলে পিতৃঠাকুর মহাশয় পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন, অতএব সে কথা প্রকাশ না করাই আমার ন্যায় বিশুদ্ধাত্মার কাজ। বিশেষ, আমার মুখ দিয়া ত মিথ্যা বাহির হয় নাই—তা বাবা কেন জেলে যান না—আমি কি করব?" ব্রজেশ্বর তত বিশুদ্ধাত্মা নয়—সে সে রকম ভাবিল না। তার বাপ মাথায় হাত দিয়া নীরব হইযা বসিয়াছে—দেখিয়া তাঁর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর আর থাকিতে পারিলেন না—বলিয়া ফেলিলেন,

পৃ. ১২৪, প. ২২, 'আমার ইহাতে কথা কহা' কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

আমি অতি ক্ষুদ্র চাকরাণী।

পৃ. ১২৪, প. ২৬, 'ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।"' কথা কয়টির পর ছিল—

পরে দিবাকে দেখাইয়া বলিল, "এই যথার্থ রাণীজি।"

পৃ. ১২৪, শেষ দুই ছত্রের পরিবর্ত্তে ছিল—

এই স্থলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, দেবীর এই উক্তি, আধুনিক পাশ্চাত্য ধৰ্ম্মনীতি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে গেলে গর্হিত বলিতে হয়। কেন না, কথাটা মিছা কথা। ইহা

পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য কার্য্য-প্রণালীর অনুমোদিত কি না, তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। তবে দেবীর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তার সত্যবাদের ভান নাই। ভানই ভয়ানক মিথ্যাবাদিতা। সরল নীতিশাস্ত্র ও জটিল কর্ম্মকৌশলের একত্র সমাবেশ হইতে জগদীশ্বর মানবজাতিকে রক্ষা করুন।

পৃ. ১২৫, প. ৩, 'দেবী বলে, "আমি দেবী।"' কথা কয়টির স্থলে ছিল—
দেবী দিবাকে বলে, "এই দেবী।"

পৃ. ১২৫, প. ৫-৬, 'ওটা চাকরাণী, ওটা দেবী নহে। এই' কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ১৩৫, প. ২৩, 'লঙ্কায়' কথাটির পরিবর্ত্তে 'সীতা দেবীর উদ্দেশে' কথা কয়টি ছিল

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

সীতারাম

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১২৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, অপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য দুই টাকা

চৈত্র, ১৩৪৬

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

'সীতারামে'র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি স্বীকার করিয়াও তাহার উপন্যাসের সীতারামের অনৈতিহাসিকতা মানিয়া লইয়াছেন; কারণ, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, গ্রন্থের উদ্দেশ্য অন্য। প্রারম্ভে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক কয়টির মধ্যে সেই উদ্দেশ্যের আভাস আছে। এতৎসত্ত্বেও ইতিহাসবিষয়ে কৌতূহলী পাঠকের উপর তিনি "Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ"-এর বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই ইতিহাসের ছাত্রের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না, দুইটি বৃত্তান্ত পরস্পরবিরোধী। ঐতিহাসিক সীতারামকে লইয়া সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকার কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় সংখ্যায়। ঐতিহাসিক সীতারামের বীরত্ব ও শৌর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্কিম-বর্ণিত সীতারামের অপদার্থতায় অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়াছেন। ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ "সীতারাম-প্রসঙ্গ" লেখেন। ১৩৩১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা 'মানসী'তে তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রবন্ধেও কিছু আলোচনা আছে। ১৩২৭ সালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে 'সীতারামে'র ঐতিহাসিকতা আলোচিত হইয়াছে। ১৩৩০ সালের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ ও কাজী মোহাম্মদ বক্স্ সীতারামের ঐতিহাসিকত্ব বিচার করিয়াছেন। W. W. Hunter-প্রণীত *A Statistical Account of Bengal* পুস্তকের ২য় খণ্ডেও কিছু বিবরণী আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এগুলি হইতে 'সীতারামে'র ঐতিহাসিক পরিচয় সংগ্রহ করিবেন।

'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় আমরা দেখাইয়াছি যে, শেষ জীবনে, অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই কতকগুলি কারণে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতার পরিবর্ত্তন ঘটে, শুধু উপন্যাস রচনার খেয়ালেই উপন্যাস রচনা হইতে তিনি বিরত হন। এই কালে 'অনুশীলনতত্ত্ব' লইয়া তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন এবং এই

তত্ত্বের সহজ প্রচারের জন্যই শেষ তিনটি উপন্যাসের আশ্রয় লন। 'সীতারাম'—'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'রও পরের রচনা ; ইহাই তাঁহার শেষ উপন্যাস।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে শোভাবাজার রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদ্রি হেস্টি 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, "রামচন্দ্র" এই বেনামে তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অব্যবহিত পরের ঘটনা। ফলে তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত *Letters on Hinduism*। এই অসম্পূর্ণ পত্রগুলিতে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। ইহার পরেই 'দেবী চৌধুরাণী'—ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বিলুপ্ত হয় ; সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই। ঐ সালের জুলাই মাস (শ্রাবণ, ১২৯১) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ঐ শ্রাবণ মাসেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন'ও আত্মপ্রকাশ করে। এই দুইটি সাময়িক-পত্রের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নূতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে 'সীতারাম' অন্যতম "কল" মাত্র। প্রথম সংখ্যা হইতেই ইহা প্রকাশিত হইতে থাকে ; ১২৯৩ সালের মাঘ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ইহা প্রকাশিত হয়, মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল।

'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যাতেই (শ্রাবণ, ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র পর পর দুইটি প্রবন্ধ লেখেন—"বাঙ্গালার কলঙ্ক" ও "হিন্দুধর্ম্ম"। এই দুইটি রচনায় 'সীতারাম' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। নিম্নে প্রবন্ধ দুইটি হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

> ...কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে

মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।…

বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।…

—"বাঙ্গালার কলঙ্ক"—'প্রচার', শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ৬-৮ *

এই প্রমাণের উপরেই বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম-চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন; মেনাহাতীও নিতান্ত তাঁহার মানস পুত্র নন।

এই গেল এক দিক্। অন্য দিকে "হিন্দুধর্ম্ম"। প্রথম সংখ্যা 'প্রচারে'র এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন—

জাতীয় ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি। যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইস্লাম ধর্ম্ম এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ‥কতকগুলা বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই।…

যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে? ‥

‥যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়; তাহাই ধর্ম্ম।…এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব সকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে।…

"হিন্দুধর্ম্ম"—'প্রচার', শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৫-২২

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এই বিশ্বাস এবং আস্থা লইয়া 'সীতারামে'র সূত্রপাত। "হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে?" এই মন্তব্য সপ্রমাণ করিবার জন্যই

---

* বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ, পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ৩১৪-১৫

যেন গঙ্গারাম ও ফকিরের কথা দিয়া উপন্যাস আরম্ভ করা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে "পাঠভেদ" অংশে কয়েকটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদের সহিত 'প্রচারে' প্রকাশিত উক্ত অংশ মিলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে দিয়া "হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপনে"র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া-চূরিয়া ছারখার হইয়াছে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডি হিসাবে 'সীতারাম'ই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এবং ভয়াবহ। 'সীতারাম' উপন্যাসে হিন্দুধর্ম্ম অভ্যুদয়ের সূচনা আছে, কিন্তু পরিণতি নাই। সূচনার মুখেই তাহা ধ্বংস হইয়াছে।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে ১৭ই ফাল্গুন (মার্চ, ১৮৮৭) 'সীতারাম' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪১৯। ইহা 'প্রচারে'রই প্রায় পুনর্মুদ্রণ। ১২৯৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃ. ৩০০) বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, অনেকগুলি পরিচ্ছেদ ইহাতে পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে মুদ্রিত হইলেও প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাস "ত্রয়ী" নামে খ্যাত। এই "ত্রয়ী" লইয়া অনেকে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। 'বঙ্গবাণী' মাসিক-পত্রিকায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও 'নারায়ণে' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাসগুলির মূল তত্ত্ব লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকারেরাও সংক্ষেপে এই "ত্রয়ী"-কথা বিবৃত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী-প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহাতে 'সীতারামে'র নানা চরিত্র লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে। ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী" প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। আমরা 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি। বিশেষভাবে 'সীতারাম' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

> সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবীচৌধুরাণীর obverse proposition solve বা কতকটা বিরোধী ভাবের ব্যঞ্জনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট ; সীতারাম রায় কর্ম্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা এবং রমা। শ্রী যেন ঐশ্বর্য্য, নন্দা যেন হ্লাদিনী, রমা যেন স্ত্রী বা মোদিনী। রাজার রাণী যেমন হইতে হয়, ঘরণী-গৃহিণী যেমন হইতে হয়, নন্দা তেমনই। রমা যেন মোমের পুঁতুল, সোহাগের খুঁচি, যেন আদিরসের মঞ্জুষা ;···কিন্তু শ্রী—সে কেমন নারী ! শ্রী একটা প্রহেলিকা, সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে, কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ীর টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামী-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে। অথচ যখন সীতারাম তাহার দ্বারস্থ, তাহার জন্য পাগল, সে পাগলামীর ফলে রাজ্য যায়, স্বাধীনতা যায়, তখন শ্রী

> পাষাণী। এই পাষাণ ভাবটাই সীতারামের পুরুষকারের তাসের ঘর শেষে ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীকে allegory বলিতে পারি না; কারণ allegoryর হিসাবে শ্রীর চরিত্রোন্মেষ ঘটান হয় নাই। শ্রী একটা abstractionও নহে; কারণ অমন ভাবে abstraction ফুটিয়া উঠে না।... সাধনশাস্ত্রের মাপকাঠিতে ইহা বুঝি না, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের মাপকাঠি লইয়া ইহার পরিমাণ করিতে পারি না।...

'সীতারামে'র শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজী অনুবাদ ১৯০৩ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে বি. বেঙ্কটাচার্য্য মহীশূর হইতে ইহার কানাড়ী অনুবাদ ও ১৯১০ সালে এস. টি. পিলাই মাদ্রাজ হইতে তামিল অনুবাদ প্রকাশ করেন।

'সীতারাম' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ কলিকাতাতেই (হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে) বাস করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে জাজপুর(কটক)-প্রবাসের স্মৃতি 'সীতারাম' রচনায় তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিয়াছিল।

সীতারাম

[২৬ মে ১৮৯৪ তারিখে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে

সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত,

সর্ব্বগুণের আধার,

সকলের প্রিয়,

আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র,

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের

স্মরণার্থ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমান গেল।

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

গীতা। ৩। ১-৯।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

গীতা। ২। ৬২-৬৪।

প্রথম খণ্ড

দিবা—গৃহিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম "ভূষ্‌নো।" যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় এক শত আশী বৎসর পূর্ব্বে, এক দিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর এক জন মুসলমান ফকির শুইয়াছিল। ফকির, আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। এমন সময়ে সেখানে এক জন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক বড় দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু ফকির পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে মাতা মরে, অন্তিম কাল উপস্থিত। তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সেকালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল। খোদ আকবর শাহ ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও এক জন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত। গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিলেন না। বলিলেন, "সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িল না, কোন উত্তরও করিল না।—গঙ্গারাম যোড়হাত করিল, বলিল, "আল্লা তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ্! আমায় একটু পথ দাও।"

শাহ সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম যোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িল না, কথাও কহিল না। অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিল—সে কাজির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই চারি বার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম মার সৎকারের জন্য পাড়া প্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেল। পাঁচ জন স্বজাতি যুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্নে শ্রীনাম্নী ভগিনী এবং প্রতিবাসিগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দুই জন পাইক, ঢাল সড়কি-বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বিষণ্ণ হইলেন। সভয়ে দেখিলেন, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর?—আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিল, "কাফের! বদ্‌বখ্‌ত্! বেত্‌মিজ্! চল্।"

পাইকেরা বলিল, "চল্।"

এক জন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর এক জন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। এক জন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর এক জন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথা পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজির কাছে লইয়া গেল। ফকির মহাশয় দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্ব্বোধ্য ফার্সি ও আর্বি শব্দ সকল সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজি সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদি শাহ সাহেব—সাক্ষীও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্ত্তাও শাহ সাহেব। কাজি মহাশয় তাঁহাকে

আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরাণ ও নিজের চসমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক্ সমালোচনা করিয়া, পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল। যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন ?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে দুই চারিটি দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজি সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দিল এবং যে সকল কথার অর্থ হয় না, এরূপ শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে গালি দিতে দিতে এবং ঘুসী, কীল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল। সে দিন সন্ধ্যা হইয়াছিল ; সে দিন আর কিছু হয় না—পরদিন তাহার জীবন্তে কবর হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ সংবাদ পৌঁছিল। ভগিনী শুনিল, ভাইয়ের কাল জীয়ন্তে কবর হইবে। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে গঙ্গারামের অনুজা।

সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! হে

অনাথনাথ! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও। আমি স্ত্রীলোক—পাপিষ্ঠা। আমা হইতে কি হইবে! তুমি দেখিও ঠাকুর!"

এই বলিয়া সেখান হইতে শ্রী অপসৃতা হইয়া বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, সে শ্রীর মার অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি চুপি কি বলিল। পরে দুই জনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি ঘুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল। সে দেশে কোটা ঘর তত বেশী নয়, কিন্তু এখনকার অপেক্ষা তখন কোটা ঘর অধিক ছিল, মধ্যে মধ্যে একটি একটি বড় বড় অট্টালিকাও পাওয়া যাইত। ঐ দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া, এমনই একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে দীঘি, দীঘিতে বাঁধা ঘাট। বাঁধা ঘাটের উপর কতকগুলা দ্বারবান্ বসিয়া, কেহ সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, কেহ টপ্পা গাইতেছিল, কেহ স্বদেশের প্রসঙ্গে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিল। তাহাদেরই মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া পাচকড়ির মা বলিল, "পাঁড়ে ঠাকুর! ভাণ্ডারীকে ডেকে দাও না?" দ্বারবান্ বলিল, "হাম্ পাঁড়ে নেহি, হাম্ মিশর হোতে হেঁ।"

পাঁচকড়ির মা। তা আমি জানি না, বাছা! পাঁড়ে কিসের বামুন? মিশর যেমন বামুন!

তখন মিশ্রদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ ভাণ্ডারী লেকে কেয়া করোগে?"

পাঁচকড়ির মা। কি আর করিব? আমার ঘরে কতকগুলা নাউ কুম্‌ড়া তরকারী হয়েছে, তাই বলে যাব যে, কাল গিয়ে যেন কেটে নিয়ে আসে।

দ্বারবান্। আচ্ছা, সো হাম্ বোলেঙ্গে। তোম্ ঘর্‌মে যাও।

পাঁচকড়ির মা। ঠাকুর, তুমি বলিলে কি আর সে ঠিকানা পাবে কার ঘরে তরকারী হয়েছে?

দ্বারবান্। আচ্ছা। তোমারি নাম বোল্‌কে যাও।

পাঁচকড়ির মা। যা আবাগির বেটা! তোকে একটা নাউ দিতাম, তা তোর কপালে হলো না।

দ্বারবান্। আচ্ছা, তোম্ খাড়ি রহো। হাম্ ভাণ্ডারীকো বোলাতে হেঁ।

তখন মিশ্রঠাকুর গুন্ গুন্ করিয়া পিলু ভাঁজিতে ভাঁজিতে অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অচিরাৎ জীবন ভাণ্ডারীকে সংবাদ দিলেন যে, "একঠো তরকারিওয়ালি

আয়ি হৈ। মুঝ্‌কো কুছ্ মেলেগা, তোম্‌কো বি কুছ্ মেল সক্‌তা হায়। তোম্ জল্‌দী আও।”

জীবন ভাণ্ডারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো চাবি ঘুন্‌সিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ। কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশা পাইয়া সে শীঘ্র বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, দুইটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, “কে ডেকেছ গা?”

পাঁচকড়ির মা বলিল, “এই আমার ঘরে কিছু তরকারি হয়েছে, তাই ডেকেছি। কিছু বা তুমি নিও, কিছু বা দরওয়ান্‌জীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।”

জীবন ভাণ্ডারী। তা তোর বাড়ী কোথা বলে যা, কাল যাব।

পাঁচকড়ির মা। আর একটি দুঃখী অনাথা মেয়ে এয়েছে, ও কি বল্‌বে একবার শোন।

শ্রী গলা পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষভাবে বলিল, “ও ভিক্ষে শিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।” পাঁচকড়ির মা তখন অস্ফুট স্বরে ভাণ্ডারী মহাশয়কে বলিল, “ভিক্ষে যদি কিছু পায় ত অর্দ্ধেক তোমার।”

ভাণ্ডারী মহাশয় তখন প্রসন্নবদনে বলিলেন, “কি বল মা?” ভিখারির পক্ষে ভাণ্ডারীর প্রভুর দ্বার অবারিত। শ্রী ভিক্ষার অভিপ্রায় জানাইল, সুতরাং ভাণ্ডারী মহাশয় তাহাকে মুনিবের কাছে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ভাণ্ডারী শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, “তুমি কে?”

শ্রী বলিল, “আমি শ্রী।”

“শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? আমি সীতারাম রায়।”

তখন শ্রী মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, “তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!”

শ্রী বলিল, “আমি বড় দুঃখী। তোমার ঘরের যোগ্য নহি।” শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন, “এত দিনের পর কেন আসিয়াছ? আসিয়াছ ত অত কাঁদিতেছ কেন?”

শ্রী তবু কাঁদে—কথা কহে না। সীতারাম বলিল, "নিকটে এসো।"

তখন শ্রী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না—আমার অশৌচ।"

সীতা। সে কি ?

গদগদস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রী বলিতে লাগিল, "আজ আমার মা মরিয়াছেন।"

সীতারাম। সেই বিপদে পড়িয়া কি তুমি আজ আমার কাছে আসিয়াছ ?

শ্রী। না—আমার মার কাজ আমিই যথাসাধ্য করিব। সে জন্য তোমায় দুঃখ দিব না। কিন্তু আজ আমার ভারি বিপদ্ !

সীতা। আর কি বিপদ্ !

শ্রী। আমার ভাই যায়। কাজি সাহেব তাহার জীয়ন্তে কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন হাবুজখানায় আছে।

সীতা। সে কি ? কি করেছে ?

তখন শ্রী যাহা যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায় ?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পর এসেছি।

সীতারাম। আমি কি করিব ?

শ্রী। তুমি কি করিবে ? তবে কে করিবে ? আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজি। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য ?

শ্রী বলিল, "তবে কি কোন উপায় নাই ?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?

সীতারাম অনেক ক্ষণ ভাবিল। পরে বলিল, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোম্‌টা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

সীতারাম দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া, ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি যত ক্ষণ না দ্বার খুলি, তত ক্ষণ আমাকে কেহ না ডাকে।" মনে মনে একবার আবার ভাবিলেন, "শ্রী এমন শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব, তার পর অন্য কথা।" ভাবিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক গোছ মানুষ, তসর নামাবলী পরা, মাথাটি যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে—কেবল এক "রেফ।" কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা,—খুব লম্বা ফোঁটা, আর আর বামুনগিরির সমান সব আছে। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতারাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড়ও তখন সেইখানে বাস করিতেন। সম্প্রতি ভূষণায় বাস করিতেছিলেন। আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই এক জন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।

কিছু ক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি কি কথা হইল, তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। কথাবার্ত্তার ফল এই হইল যে, সীতারাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পরিবারবর্গ এক জন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতীপারে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক খুব বড় ফর্‌দা জায়গায়, সহরের বাহিরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। বন্দী সেখানে আসিবার আগেই লোক আসিতে আরম্ভ হইল। অতি প্রত্যূষে,—তখনও—গাছের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় নাই—অন্ধকারের আশ্রয় হইতে নক্ষত্র সব

সরিয়া যায় নাই, এমন সময়ে দলে দলে পালে পালে জীয়ন্ত মানুষের কবর দেখিতে লোক আসিতে লাগিল। একটা মানুষ মরা, জীবিতের পক্ষে একটা পর্ব্বের সমান। যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাঠ প্রায় পূরিয়া গিয়াছে, অথচ নগরের সকল গলি, পথ, রাস্তা হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর মত মনুষ্য বাহির হইতেছে। শেষ সে বিস্তৃত স্থানেও স্থানাভাব হইয়া উঠিল। দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনূমানের মতন আসীন—যেন লাঙ্গুলাভাবে কিঞ্চিৎ বিরস :—কোথাও বাদুড়ের মত দুল্যমান, দিনোদয়ে যেন কিঞ্চিৎ সরস। পশ্চাতে, নগরের যে কয়টা কোটাবাড়ী দেখা যাইতেছিল, তাহার ছাদ মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, আর স্থান নাই। কাঁচা ঘরই বেশী, তাহাতেও মই লাগাইয়া, মইয়ে পা রাখিয়া, অনেকে চালে বসিয়া দেখিতেছে। মাঠের ভিতর কেবল কালো মাথার সমুদ্র—ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কেবল মানুষ আসিতেছে, জমাট বাঁধিতেছে, সরিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আবার মিশিতেছে। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি, মারামারি আরম্ভ করিল। হিন্দু মুসলমানকে গালি দিতে লাগিল, মুসলমান হিন্দুকে গালি দিতে লাগিল। কেহ বলে, "আল্লা!" কেহ বলে, "হরিবোল!" কেহ বলে, "আজ হবে না, ফিরে যাই!" কেহ বলে, "ঐ এয়েছে দেখ্।" যাহারা বৃক্ষারূঢ়, তাহারা কার্য্যাভাবে গাছের পাতা, ফুল, এবং ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিম্নচারীদিগের মাথার উপর ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, যেখানে যেখানে বৃক্ষ, সেইখানে সেইখানে তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তাহা প্রায় জনশূন্য। দুই চারি জন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় যোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া কেবল এক জন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখ মুখ ফুলিয়াছে; বেশভূষা বড় আলুথালু—যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কিন্তু এখন আর কাঁদিতেছে না। যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে, "ঠাকুর! এখন কিছু দেখা যায় না!"

বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি উপর হইতে বলিল, "না।"

"তবে বোধ হয়, নারায়ণ রক্ষা করিলেন।"

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই স্ত্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। বৃক্ষশাখা ঠিক তাঁর উপযুক্ত স্থান নহে, কিন্তু তর্কালঙ্কার মনে করিতেছিলেন, "আমি ধর্ম্মাচরণনিযুক্ত, ধর্ম্মের জন্য সকলই কর্ত্তব্য।"

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, "নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমার সে ভরসা আছে। তুমি উতলা হইও না। কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় হয় নাই বোধ হইতেছে। কতকগুলা লালপাগড়ি আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি।"

শ্রী। কিসের লাল পাগড়ি?

চন্দ্রচূড়। বোধ হয় ফৌজদারি সিপাহী।

বাস্তবিক দুই শত ফৌজদারি সিপাহী সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেমন যেমন দেখিতে লাগিলেন, চন্দ্রচূড় সেইরূপ শ্রীকে বলিতে লাগিলেন। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কত সিপাই?"

চন্দ্র। দুই শত হইবে।

শ্রী। আমরা দীন দুঃখী—নিঃসহায়। আমাদের মারিবার জন্য এত সিপাহী কেন?

চন্দ্র। বোধ হয়, বহুলোকের সমাগম হইয়াছে শুনিয়া, সতর্ক হইয়া ফৌজদার এত সিপাহী পাঠাইয়াছেন।

শ্রী। তার পর কি হইতেছে?

চন্দ্র। সিপাহীরা আসিয়া, শ্রেণী বাঁধিয়া, প্রস্তুত কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজি, আর সেই ফকির।

শ্রী। দাদা কি করিতেছেন?

চন্দ্র। পাপিষ্ঠেরা তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়াছে।

শ্রী। কাঁদিতেছেন কি?

চন্দ্র। না। নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ। মূর্ত্তি বড় গম্ভীর, বড় সুন্দর।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। দেখিবার সুবিধা আছে। তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার?

শ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠিতে জানি না।

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সময় মা ?

শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি সরল ডাল ছিল। সে ডালটি উঁচু হইয়া না উঠিয়া, সোজা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। হাতখানিক গিয়া, ঐ ডাল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই দুই ডালের উপর দুইটি পা দিয়া, নিকটস্থ আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার বড় সুবিধা। চন্দ্রচূড় শ্রীকে ইহা দেখাইয়া দিলেন। শ্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

প্রথম দুই একবার চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। তার পর, কি কৌশলে কে জানে, শ্রী ত জানে না—সে সেই নিম্ন শাখায় উঠিয়া, সেই যোড়া ডালে যুগল চরণ রাখিয়া, আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইল।

তাতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে শ্রী দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে সম্মুখদিকে পাতার আবরণ ছিল না—শ্রী সেই অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়া রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশিমধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার ঠাটের মত, চারি দিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে; চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না, এ মূর্ত্তিমতী বনদেবী কিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া নিকটস্থ জনতা বাত্যাতাড়িত সাগরবৎ, সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল!

শ্রী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। আপনার অবস্থান প্রতি তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। অনিমেষলোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। এমন সময়ে শাখান্তর হইতে চন্দ্রচূড় ডাকিয়া বলিলেন, "এ দিকে দেখ! এ দিকে দেখ! ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে?"

শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে। যোদ্ধৃবেশ, অথচ নিরস্ত্র। অশ্বী বড় তেজস্বিনী, কিন্তু লোকের ভিড় ঠেলিয়া আগুইতে পারিতেছে না। অশ্বী নাচিতেছে, দুলিতেছে, গ্রীবা বাঁকাইতেছে, কিন্তু তবু বড় আগু হইতে পারিতেছে না। শ্রী চিনিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম।

এ দিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা কবরে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল। শাহ সাহেব বলিলেন, "কিয়া দেখতে হো! কাফেরকো মাট্টী দেও।"

কাজি সাহেব ভাবিলেন। কাজি সাহেবের সে সময়ে সেখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা শুনিয়া শখ করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, "সীতারাম যখন বারণ করিতেছে, তখন কিছু কারণ আছে। সীতারাম আসা পর্য্যন্ত বিলম্ব কর।"

শাহ সাহেব অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অগত্যা সীতারাম পৌছান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। গঙ্গারামের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

সীতারাম কাজি সাহেবের নিকট পৌছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণতমস্তকে শাহ সাহেবকে বিনয়পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজি সাহেবকে তদ্রূপ করিলেন। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, রায় সাহেব! আপনার মেজাজ সরীফ্।"

সীতারাম। অলহম্-দল্-ইল্লা। মেজাজে মবারকের সংবাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

কাজি। খোদা নফরকে যেমন রাখিয়াছেন। এখন এই উমর, বাল সফেদ, কাজা পৌছিলেই হয়। দৌলতখানার কুশল সংবাদ ত?

সীতা। হজুরের এক্‌বালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?

কাজি। এখন এখানে কি মনে করিয়া?

সীতা। এই গঙ্গারাম—বদ্‌বখ্‌ত্—বেত্‌মিজ্ যাই হৌক, আমার স্বজাতি। তাই দুঃখে পড়িয়া হজুরে হাজির হইয়াছি, জান বখ্‌শিশ্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি। সে কি? তাও কি হয়?

সীতা। মেহেরবান ও কদরদান সব পারে।

কাজি। খোদা মালেক। আমা হইতে এ বিষয়ের কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরমানা দিবে। জান বখ্‌শিশ্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি সাহেব ফকিরের মুখপানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িল। কাজি বলিলেন, "সে সব কিছু হইবে না। কবরমে কাফেরকো ডারো।"

সীতা। দুই হাজার আসরফি দিব। আমি যোড় হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির!

কাজি ফকিরের মুখ পানে চাহিল, ফকির নিষেধ করিল, সে কথাও উড়িয়া গেল। শেষ সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিল। তাও না। পাঁচ হাজার—তাও না। আট হাজার—দশ হাজার, তাও না। সীতারামের আর নাই। শেষ সীতারাম জানু

পাতিয়া, করযোড় করিয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "আমার আর নাই। তবে, আর অন্য যা কিছু আছে, তাও দিতেছি। আমার তালুক মুলুক, জমী জেওরাত, বিষয় আশয় সর্ব্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেছ ?"

সীতা। ও আমার যেই হৌক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্ব্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম।

কাজি। হিন্দুধর্ম্ম যাহাই হৌক, মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার বড়। এ ব্যক্তি মুসলমান ফকিরের অপমান করিয়াছে, উহার প্রাণ লইব—তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার আর অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম জানু পাতিয়া কাজি সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের প্রাণ ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইলে এ প্রায়শ্চিত্ত হয় না ? আমি এই কবরে নামিতেছি—আমাকে মাটি চাপা দিউন—আমি হরিনাম করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব—আমার প্রাণ লইয়া এই দুঃখীর প্রাণদান করুন। দোহাই তোমার কাজি সাহেব ! তোমার যে আল্লা, আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর ! ধর্ম্মাচরণ করিও। আমি প্রাণ দিতেছি—বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণদান কর।"

কথাটা নিকটস্থ হিন্দু দর্শকেরা শুনিতে পাইয়া হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। করতালি দিয়া বলিতে লাগিল, "ধন্য রায়জী ! ধন্য রায় মহাশয় ! জয় কাজি সাহেবকা ! গরিবকে ছাড়িয়া দেও।"

যাহারা কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই, তাহারাও হরিধ্বনি শুনিয়া হরিধ্বনি দিতে লাগিল। তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। কাজি সাহেবও বিস্মিত হইয়া সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বলিতেছেন, রায় মহাশয় ! এ আপনার কে যে, ইহার জন্য আপনার প্রাণ দিতে চাহিতেছেন ?"

সীতা। এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয় ; কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে। রাজা ঔশীনর, আপনার শরীরের সকল মাংস কাটিয়া দিয়া একটি পায়রাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আমাকে গ্রহণ করুন—ইহাকে ছাড়ুন।

কাজি সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাহিতেছে। নিলে সরকারি তহবিলের কিছু সুসার হইবে। দশ হাজার আসরফি লইয়া, এই হতভাগ্যকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। আপনি কি বলেন?"

কাজি। তোবা! আমি তাহা পারিব না। সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই—বিশেষ এ ব্যক্তি মান্য, গণ্য ও সচ্চরিত্র। তা হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই, মনে জানিত যে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ সাহেবের সঙ্গে কাজি সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া সে যোড় হাত করিয়া কাজি সাহেবকে বলিল, "হজুরের মর্জি মবারকে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু এ গরিবের প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুনিতে হয়। একের অপরাধে অন্যের প্রাণ লইবেন, এ কোন্ সরায় আছে? সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমায় প্রাণদান দিবেন আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা, স্বয়ং চন্দ্রচূড় ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। এক জন জমাদার শুনিয়া বলিল, "পাকড়ো বস্কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাক্ড়ান বড় শক্ত কথা। সে কাজ হইল না।

এ দিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীয়ন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজি সাহেবকে বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজি সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামার সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারি বেড়ি হাতকড়ি সব তাহার জিম্মা, সেই উপলক্ষে সে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর কিছু গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্ম্মকার মহাশয় চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিলেন।

তখন ফকির বলিল, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন্।"

শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ি পায়ে থাকিবে কি ? সরকারি বেড়ি নোক্‌সান্ হইবে কেন ? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া যায় না। আর বদমায়েসেরও এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি আর বেড়ি যোগাইতে পারিতেছি না।" শুনিয়া কাজি সাহেব বেড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ি খোলা হইল।

শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিল। তার পর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন; ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল।

যতক্ষণে একবার বিদ্যুৎ চমকে, ততক্ষণে এই কাজ সম্পন্ন হইল। দেখিয়া, সেই লোকারণ্যমধ্যে তুমুল হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। সিপাহীরা "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাতে একটা ভারী গোলযোগ উপস্থিত হইল। বেগবান অশ্বের সম্মুখ হইতে লোকে ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল, গঙ্গারাম পথ পাইতে লাগিল, কিন্তু সিপাহীরা পথ পাইল না। তাহাদের সম্মুখে লোক জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারা হাতিয়ার চালাইয়া পথ করিবার উদ্যোগ করিল।

সেই সময়ে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, কালান্তক যমের ন্যায় কতকগুলি বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষ, একে একে ভিড়ের ভিতর হইতে আসিয়া সারি দিয়া তাহাদের সম্মুখে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও সিপাহী আসিল। দেখিয়া আরও ঢাল-শড়কীওয়ালা হিন্দু আসিয়া তাহাদের পথ রোধ করিল। তখন দুই দলে ভারী দাঙ্গা উপস্থিত হইল।

দেখিয়া, সক্রোধে কাজি সাহেব সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার ?"

সীতা। আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

কাজি। বুঝিতে পারিতেছ না ? আমি বুঝিতে পারিতেছি, এ তোমারই খেলা।

সীতা। তাহা হইলে আপনার কাছে নিরস্ত্র হইয়া, মৃত্যুভিক্ষা চাহিতে আসিতাম না।

কাজি। আমি এখন তোমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিব। এ কবরে তোমাকেই পুঁতিব।

এই বলিয়া কাজি সাহেব কামারকে হুকুম দিলেন, "ইহারই হাতে পায়ে ঐ হাতকড়ি, বেড়ি লাগাও।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইলেন—ফৌজদার সাহেব যাহাতে আরও সিপাহী লইয়া স্বয়ং আইসেন, এমন প্রার্থনা জানায়। ফৌজদারের নিকট লোক গেল। কামার আসিয়া সীতারামকে ধরিল। সেই বৃক্ষারূঢ়া বনদেবী শ্রী তাহা দেখিল।

এদিকে গঙ্গারাম কষ্টে অথচ নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া লোকারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কষ্টে—কেন না, আসিতে আসিতে দেখিলেন যে, সেই জনতামধ্যে একটা ভারী গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কোলাহল ভয়ানক হইল, লোকসকল সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। তাঁহার অশ্ব এই সকলে অতিশয় ভীত হইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অশ্বারোহণের কৌশল গঙ্গারাম তেমন জানিতেন না; ঘোড়া সামলাইতেই তাঁহাকে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল যে, তিনি আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না যে, কোথায় কি হইতেছে। কেবল "মার! মার!" একটা শব্দ কাণে গেল।

লোকারণ্য হইতে কোন মতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া, এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিলেন, দেখিবেন—কি হইতেছে। দেখিলেন, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান—আর এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢাল শড়কীওয়ালা। হিন্দুরা বাছা বাছা যোয়ান, আর সংখ্যাতে বেশী। মুসলমানেরা তাহাদিগের কাছে হঠিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা "মার মার" শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

এই মার্ মার্ শব্দে আকাশ, প্রান্তর, কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে লড়াই করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, যে লড়াই না করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে। মার্ মার্ শব্দে হিন্দুরা চারি দিক্ হইতে চারি দিকে ছুটিতেছে। আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিলেন, যাহারা এই মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন! চণ্ডীর হুকুম, মার্ মার্! মার! জয় চণ্ডিকে!" গঙ্গারাম ভাবিলেন, "এ কি এ?" তখন দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিলেন, মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্ত্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"—অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে—

দৃপ্ত পদভরে যুগল শাখা তুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে—যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার্! মার্! শত্রু মার্!" শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে—"মার্—শত্রু মার্! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু—আমার শত্রু—মার্! শত্রু মার্!" উত্থিত বাহু, কি সুন্দর বাহু! স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময়-কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণ কুন্তলের শোভা! সকল হিন্দু সেই দিকে চাহিতেছে, আর "জয় মা চণ্ডিকে!" বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছেন যে, যথার্থই চণ্ডী অবতীর্ণা—তার পর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিলেন, শ্রী!

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। অল্প-কালমধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিলেন, এক জন ভারী লম্বা যোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিলেন, পশ্চাৎ আর এক জন শড়কীওয়ালা শাহ সাহেবের কাটামুণ্ড শড়কীতে বিঁধিয়া উচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। গঙ্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলা গুলি লইয়া, সসৈন্য ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। গোলা গুলির কাছে ঢাল শড়কী কি করিবে? বলা বাহুল্য যে, নিমেষমধ্যে সেই যোয়ানের দল অদৃশ্য হইল। যে নিরস্ত্র বীরপুরুষেরা তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া লড়াই ফতে করিতেছি বলিয়া কোলাহল করিতে-ছিলেন, তাহারা বলিলেন, "আমরা ত বারণ করিয়াছিলাম!" এই বলিয়া আর পশ্চাদ্দৃষ্টি না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাহারা দাঙ্গার কোন সংস্রবে ছিল না, তাহারা 'চোরা গোরুর অপরাধে কপিলার বন্ধন' সম্ভাবনা দেখিয়া সীতারাম গঙ্গারামকে নানাবিধ গালিগালাজ করিয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। অতি অল্পকালমধ্যে সেই

লোকারণ্য অন্তর্হিত হইল। প্রান্তর যেমন জনশূন্য ছিল, তেমনই জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্চ্ছিতা, ভূতলস্থা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, "তুমি যে আমার ঘোড়া চুরি করিয়া পলাইয়াছিলে, সে ঘোড়া কি করিলে? বেচিয়া খাইয়াছ?"

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না। ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়াছি—ধরিয়া দিতেছি।"

সীতা। ধরিয়া, তাহার উপর আর একবার চড়িয়া, পলায়ন কর।

গঙ্গা। আপনাদের ছাড়িয়া?

সীতা। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না।

গঙ্গা। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি যাইব না।

সীতা। তুমি বড় নদী পার হইয়া যাও। শ্যামপুর চেন ত?

গঙ্গা। তা চিনি না?

সীতা। সেইখানে অতি দ্রুতগতি যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে; নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন।

গঙ্গারাম সীতারামের ভ্রূকুটি দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল; এবং সীতারাম কিছু ধমক চমক করায় ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে গেল।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। শ্রী এদিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথার ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। তার পর এদিকে ওদিকে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায়?

সীতা। কেন, তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। সেখানে কে আছে ?—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে ?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর ?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এইখানে থাকিবে ? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি করিবে ?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসি দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেইখানে যাইবে। সেখানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেইখানে যাও। সেখানে বা যেখানে তোমার অভিলাষ, সেইখানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব ?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে যে, দুরন্ত সিপাহীদিগের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে ?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন ; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এত দিন পরে, এ কথা কেন ?"

সীতা। সে কথা বুঝান বড় দায়। নাই বুঝিলে ?

শ্রী। না বুঝিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। যখন তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন ? যাইব বই কি ? কিন্তু তুমি দয়া করিয়া আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য যে, এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী,—আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন ? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,—আমি যাইব না। এত কাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণত্যাগ করিব; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথাগুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না।

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ করিব?

সীতা। স্বীকার কর, করিবে না।

শ্রী। এমন কি কথা? তবে না শুনিয়া আগে স্বীকার করি, কি প্রকার?

সীতা। দেখ, সিপাহীদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে, সিপাহীরা তাহাদের পাছু ছুটিয়াছে। এই বেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয় তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পঁহুছিলেন। পলায়নের অনেক বিঘ্ন। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া, শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন, এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

তোমার সঙ্গে, আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের

বাড়ীতে এক জন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতৃঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।* অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা হইয়াছ।

বলিয়া সীতারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিতে লাগিলেন, "দৈবজ্ঞ পিতাকে বলিলেন, 'আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন, এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। কারণ, দেখুন, যদিও স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়, কিন্তু যে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয়, সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে। স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না; এবং পতি প্রিয় না হইলে, তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে আপনার পুত্রের কখন সহবাস না হয় বা প্রীতি না জন্মে, সেই ব্যবস্থা করুন।' পিতৃদেব এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া, সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে, আমি তোমাকে গ্রহণ বা তোমার সঙ্গে সহবাস না করি। এই কারণে তুমি আমার কাছে সেই অবধি পরিত্যক্ত।"

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "আমার কথা বাকি আছে। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।"

* চন্দ্রাগারে থাগ্নিভাবে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃত্তির্জ্ঞস্য শিল্পে প্রবীণা।
বাচাং পত্যুঃ সদ্‌গুণা ভার্গবস্য সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥

ইতি জাতকাভরণে

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া কি তুমি আর তাঁহার অধীন নও?

সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি, যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম, কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ, ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া, শ্রী ফিরিয়া না চাহিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি। সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশিপ্রতিফলিত-কৌমুদী-রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ এক জন বসন্তনিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী; আর এক জন বর্ষা-বারিরাশিপ্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।

স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে

হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার এক দিকে নন্দা, আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান বাতির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ, শ্রী বিপদ্—যার এক দিকে সুখ, আর দিকে সম্পদ্, তার কি বিপদ্‌কে মনে পড়ে?

তবে সে দিন রাত্রিতে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না! তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা পড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সময় বুঝিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া, গুরু পুরোহিত ডাকিয়া, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত।—কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি—এমন কি আর হয়!

তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য যে, কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল যে, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবাবলম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে একটু বিচার করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন। কিন্তু পরদিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল। নন্দা, রমা, চন্দ্রচূড়, সব দূরে থাক—এখন কৈ শ্রী!

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া, যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে, কোথায় শাখাচ্ছেদ জন্য বা বৃক্ষবিশেষের শাখার উজ্জ্বল বর্ণ জন্য, যেন সাদা বোধ হয়, সীতারাম সেই দিকে দৌড়িয়া যান—কিন্তু শ্রীকে পান না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন, সে উত্তর

দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়—আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথাও নাই! হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই, যাকে ডাকি, তা ত পাই না। যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয় ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না। তা কি করিব,—আরও খুঁজি। যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা প্রভাতকালে শ্রী, সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই গঙ্গারামকে শ্যামপুরে তিনি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায়?" গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি!"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তুমি এইক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এইখানেই আছি। তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সে জন্য টাকা কড়ি যাহা আবশ্যক হয়, আমি দিতেছি।

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্ব্বক, এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান করিল। কোন সন্ধান পাইল না। নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূষণায় যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা যে সীতারামের কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। ভূষণা নগরে সীতারামের অনুগত, বাধ্য প্রজা বা খাদক বিস্তর লোক ছিল। সীতারাম তাহাদের সঙ্গে রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিয়া এই হাঙ্গামার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে সীতারামের এমন ইচ্ছা ছিল যে, যদি বিনা বিবাদে গঙ্গারামের উদ্ধার হয়, তবে আর তাহার প্রয়োজন নাই। তবে বিবাদ হয়, মন্দ নয়;—মুসলমানের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইয়া উঠিয়াছে, কিছু দমন হওয়া ভাল। চন্দ্রচূড় ঠাকুরের মনটা সে বিষয়ে আরও পরিষ্কার—মুসলমানের অত্যাচার এত বেশী হইয়াছে যে, গোটাকত নেড়া মাথা লাঠির ঘায়ে না ভাঙ্গিলেই নয়। তাই সীতারামের অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না করিয়াই চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধটা বেশী গড়াইয়াছিল—ফকিরের প্রাণবধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে, সীতারাম ভীত হইয়া কিছু কালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাদক, যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগরনির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন। যেখানে বহুজন-সমাগম, সেইখানেই ব্যবসায়ীরা আসিয়া উপস্থিত হয়; এই জন্য ভূষণা এবং অন্যান্য নগর হইতে দোকানদার, শিল্পী, আড়দ্দার, মহাজন, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামপুরে অধিষ্ঠান করিল। সীতারামও তাহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই নূতন নগর, হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা, বন্দরে পরিপূর্ণ হইল। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের সংগৃহীত অর্থ ছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহা ব্যয় করিয়া তিনি নূতন নগর সুশোভিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ এখন প্রজাবাহুল্য ঘটাতে, তাঁহার বিশেষ আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। আবার এক্ষণে জনরব উঠিল যে, সীতারাম হিন্দুরাজধানী স্থাপন করিতেছেন; ইহা শুনিয়া দেশে বিদেশে যেখানে মুসলমানপীড়িত, রাজভয়ে ভীত বা ধর্ম্মরক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক,

তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগিল। অতএব, সীতারামের ধনাগম সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজপ্রাসাদতুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলীশোভিত সরোবর, এবং রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। প্রজাগণও হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নগরনির্ম্মাণ ও রাজ্যরক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা, এবং প্রজাবর্গের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না; কেন না, দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহিতার কোন কার্য্য করেন নাই। গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি প্রকাশ্যে অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন বলিয়া ফৌজদার জানিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই তাহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করার কোন কারণ ছিল না। যখন তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহণ করেন নাই, বরং দিল্লীশ্বরকে সম্রাট্ স্বীকার করিয়া জমিদারীর খাজনা পূর্ব্বমত রাজ-কোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন; আর নূতন নগরীর নাম "মহম্মদপুর" রাখিয়া, ও হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার আর কোন কারণই রহিল না।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, একটা কোন ছল পাইলেই মহম্মদপুর লুঠপাঠ করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন। ছল ছুতারই বা অভাব কি? তোরাব খাঁ সীতারামকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার জমিদারীতে অনেকগুলি বিদ্রোহী ও পলাতক বদমাস বাস করিতেছে, ধরিয়া পাঠাইয়া দিবা। সীতারাম উত্তর করিলেন যে, অপরাধীদিগের নাম পাঠাইয়া দিলে, তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ফৌজদার পলাতক প্রজাদিগের নামের একটি তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। শুনিয়া পলাতক প্রজারা সকলেই নাম বদলাইয়া বসিল। সীতারাম কাহারও নামের সহিত তালিকার মিল না দেখিয়া, লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফর্দ্দের লিখিত নাম কোন প্রজা স্বীকার করে না।

এইরূপে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিলেন। তোরাব খাঁ, সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও আত্মরক্ষার্থ, মহম্মদপুরের চারি পার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন, এবং সুন্দরবন-পথে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিন জন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিন জন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুতর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃণ্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃণ্ময়, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম। গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল। এই সময়ে চাঁদ শাহ নামে এক জন মুসলমান ফকির, সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। তাঁহার সহিত সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাঁহারই পরামর্শমতে, নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন, "মহম্মদপুর"।

ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসামতে সৎপরামর্শ দেয়। কেহ বিবাদের কথা তুলিলে তাহাকে ক্ষান্ত করে। অতএব আপাততঃ সকল বিষয় সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সীতারামের যেমন তিন জন সহায় ছিল, তেমনই তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে এক জন পরম শত্রু ছিল। শত্রু—তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা।

রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন দেখিলেন যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণী-প্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিকট

চীৎকার রাত্রিদিন কানে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কাণ দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রিদিন রমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠা (শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা) পত্নী নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।

দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল যে, মুসলমানের সঙ্গে এই বিবাদে, তাহার ক্রমে সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায় পড়া, মাথা খোঁড়ার জ্বালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তার পর—সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া—ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌সে গুড়ুনি, কখনও কালবৈশাখী, কখনও ত্রিকে ঝড়। ধুয়োটা সেই এক—মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া গিয়া পড়—নহিলে কি বিপদ ঘটিবে! সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণার অপেক্ষা জনাকীর্ণা রাজধানী হইয়া উঠিল, তাহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে, তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বিছানা লইল। যখন একবার পূজাহ্নিকের জন্য শয্যা হইতে উঠিত, তখন রমা ইষ্টদেবের নিকট নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত—"হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি। এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।" সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সম্মুখেই রমা, দেবতার কাছে সেই কামনা করিত।

বলা বাহুল্য, রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, "হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত!" শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রীর স্মরণপটস্থা মূর্ত্তির কাছে, নন্দাও নয়, রমাও নয়। কিন্তু মনের কথা জানিতে পারিলে রমা, কি নন্দা পাছে মনে ব্যথা পায়, এজন্য

সীতারাম কখন শ্রীর নাম মুখে আনিতেন না। তবে রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম!"

রমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তা শ্রীকে গ্রহণ কর না কেন? কে তোমায় নিষেধ করে?"

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকে এখন আর কোথায় পাইব!" কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল। রমার অপরাধ যাই হৌক, স্বামী পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহই তাহার মূল। পাছে তাহাদের কোন বিপদ্ ঘটে, এই চিন্তাতেই সে এত ব্যাকুল। সীতারাম তাহা না বুঝিতেন, এমন নহে। বুঝিয়াও রমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না—বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—বড় কাজের বিঘ্ন—বড় যন্ত্রণা। স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ। রমা বুঝিল, বিনাপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি। সীতারাম ভাবিল, "গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।"

রমার দোষে, সীতারামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না—কিন্তু এখন শ্রী আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সিংহাসনের আধখান জুড়িয়া বসিল। সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি। ইহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই।

কিন্তু এ মন্দিরে এ প্রতিমা স্থাপনে যে রমাই একা ব্রতী, এমন নহে। নন্দাও তাহার সহায়, কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। যখন সীতারামের সাহস আছে, তখন নন্দার সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল মন্দের বিচারক আমার স্বামী—তিনি যদি ভাল বুঝেন, তবে আমার সে ভাবনায় কাজ কি? তাই নন্দা সে সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রাণপাত করিয়া পতিপদসেবায় নিযুক্তা। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে স্ফূর্ত্তি-দায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধ-সৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত! "মার! মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু,

আমার শত্রু, মার!”—সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে “ভালবাসা”, স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন, আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে-নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর? তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানিমাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে—অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। ততদিন এসো, আমরা বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এই ত বৈতরণী! পার হইলে না কি সকল জ্বালা জুড়ায়? আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণীসৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। পশ্চাৎ অতি দূরে নীলমেঘের মত নীলগিরির* শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীলসলিল-বাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকত মধ্যে বাহিতা হইতেছিল; পারে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর সপ্তমাতৃকার মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে আসীনা সপ্তমাতৃকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল; রাজ্ঞীশোভাসমন্বিতা ইন্দ্রাণী, মধুররূপিণী বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, সাক্ষাৎ বীভৎসরসরূপধারিণী যমপ্রসূতি ছায়া, নানালঙ্কারভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিতরত্নহারা লম্বোদরা চীনাম্বরা বরাহবদনা বারাহী, বিশুষ্কাস্থিচর্ম্মমাত্রাবশেষা পলিতকেশা নগ্নবেশা খণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা, রাশি রাশি কুসুম চন্দন বিল্বপত্রে প্রপীড়িতা হইয়া বিরাজ করিতেছে। তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুমণ্ডপের উচ্চচূড়া নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তম্ভোপরি আকাশমার্গে খগপতি গরুড় সমাসীন।† অতিদূরে উদয়গিরির ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশপ্রান্তে শয়ান।‡ এই সকলের প্রতি শ্রী চাহিয়া দেখিল; বলিল, "হায়! এই ত বৈতরণী! পার হইলে আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

"এ সে বৈতরণী নহে—

যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী—

আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী।

শ্রী বলিল, "ও মা! সেই সন্ন্যাসিনী! তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে, না ও পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ পারেই কি যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ না কি?

---

* বালেশ্বর জেলার উত্তরভাগস্থিত কতকগুলি পর্ব্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরণীতীর হইতে দেখা যায়।

† এই গরুড়স্তম্ভ দেখিতে অতি চমৎকার।

‡ পুরুষোত্তম যাইবার আধুনিক যে রাজপথ, এই সকল পর্ব্বত, তাহার বামে থাকে। নিকটে নহে।

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

সন্ন্যাসিনী। না, মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। ওপারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

শ্রী। তা, মা, বোঝাটা এ পারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না—

সন্ন্যাসিনী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হ'লে বাতাস উঠিবে।

সন্ন্যাসিনীর আজিও তুফানের বেলা হয় নাই—বয়সটা কাঁচা রকমের। তাই শ্রী এই রকমের কথা কহিতে সাহস করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীও সেই রকম উত্তর দিল, "তুফানের ভয় কর মা? কেন তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?"

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না। কেন তাঁর নৌকা ভারি করিব?

সন্ন্যাসিনী। তাই কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈতরণী-তীরে আসিয়া বসিয়া আছ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই না কি পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যাসিনী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না, দুই জনে একত্রে যাই। কিন্তু আজ তুমি একা কেন? সে দিন সুবর্ণরেখাতীরে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল—আজ একা কেন?

শ্রী। আমার কেহ নাই। অর্থাৎ আমার অনেক আছে, কিন্তু আমি ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্যাগী। আমি এক যাত্রীর দলে জুটিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলাম, কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম। কিছু দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কালি রাত্রিতে যাত্রীর দল হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলাম।

সন্ন্যাসিনী। এখন?

শ্রী। এখন, বৈতরণী-তীরে আসিয়া ভাবিতেছি, দুইবার পারে কাজ নাই। একবারই ভাল। জল যথেষ্ট আছে।

সন্ন্যাসিনী। সে কথাটা না হয়, তোমায় আমায় দুই দিন বিচার করিয়া দেখা যাইবে। তার পর বিচারে যাহা স্থির হয়, তাহাই করিও। বৈতরণী ত তোমার ভয়ে পলাইবে না! কেমন, আমার সঙ্গে আসিবে কি ?

শ্রীর মন টলিল। শ্রীর এক পয়সা পুঁজি নাই। দল ছাড়িয়া আসিয়া অবধি আহার হয় নাই ; শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু, এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল, কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মা ? তুমি দিনপাত কর কিসে ?"

সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না—বৈতরণী তাহার অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছিল।

সন্ন্যাসিনী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না—আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। বাছা, তোমার এই বয়স—তুমি আমার অপেক্ষা ছোট বৈ বড় হইবে না। তোমার এই রূপের রাশি--

সন্ন্যাসিনী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—ঘসা ফানুষের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীর কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিল, "আমরা উদাসীন, সংসারত্যাগী, আমাদের কিছুতেই কোন ভয় নাই। ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।"

শ্রী। তা যেন হইল। তুমি সন্ন্যাসিনী বলিয়া নির্ভয়। কিন্তু আমি বেলপাতের পোকার মত, তোমার সঙ্গে বেড়াইব কি প্রকারে ? তুমিই বা লোকের কাছে এ পোকার কি পরিচয় দিবে ? বলিবে কি যে, উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়িয়াছে ?

সন্ন্যাসিনী হাসিল—ফুল্লাধরে মধুর হাসিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়, সেই ভস্মাবৃত রূপমাধুরী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসিনী বলিল, "তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না ?"

শ্রী শিহরিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি ? আমি সন্ন্যাসিনী হইবার কে ?"

সন্ন্যাসিনী। আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। তুমি যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ বলিতেছ, তখন তোমার চিত্তে যদি পাপ না থাকে, তবে হইলেই বা দোষ কি ? কিন্তু এখন

সে কথা থাক—এখন তা বলিতেছি না। এখন এই বেশ ছদ্মবেশস্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি?

শ্রী। মাথা মুড়াইতে হইবে? আমি সধবা।

সন্ন্যাসিনী। আমি মাথা মুড়াই নাই দেখিতেছ।

শ্রী। জটা ধারণ করিয়াছ?

সন্ন্যাসিনী। না, তাও করি নাই। তবে চুলগুলাতে কখনও তেল দিই না, ছাই মাখিয়া রাখি, তাই কিছু জট পড়িয়া থাকিবে।

শ্রী। চুলগুলি যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া ফণা ধরিয়া আছে, আমার ইচ্ছা করিতেছে, একবার তেল দিয়া আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিই।

সন্ন্যা। জন্মান্তরে হইবে,—যদি মানবদেহ পাই। এখন তোমায় সন্ন্যাসিনী সাজাইব কি?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখিলেই কি সাজ হইবে?

সন্ন্যা। না—গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, সব আমার এই রাঙ্গা ঝুলিতে আছে। সব দিব।

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী সন্ন্যাসিনী শ্রীকে আর এক রূপসী সন্ন্যাসিনী সাজাইল। কেশদামে ভস্ম মাখাইল, অঙ্গে গৈরিক পরাইল, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ পরাইল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিল, পরে রঙ্গের দিকে মন দিয়া শ্রীর কপালে একটি চন্দনের টিপ দিয়া দিল। তখন ভুবন-বিজয়াভিলাষী মধুমন্মথের ন্যায় দুই জনে যাত্রা করিয়া, বৈতরণী পার হইয়া, সে দিন এক দেবমন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রি যাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, খরস্রোতা* জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী, বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি-শোভিতা হইয়া পুনরপি, "সঞ্চারিণী দীপশিখা" দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। তৎপ্রদেশবাসীরা সর্ব্বদাই নানাবিধ যাত্রীকে সেই

* নদীর নাম।

পথে যাতায়াত করিতে দেখে, কোন প্রকার যাত্রী দেখিয়া বিস্মিত হয় না, কিন্তু আজ ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারাও বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, "কি পরি মাইকিনিয়া মানে যাউছন্তি পারা ?" কেহ বলিল, "সে মানে দ্যাবতা হ্যাব।" কেহ আসিয়া প্রণাম করিল; কেহ ধন দৌলত বর মাগিল। এক জন পণ্ডিত তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "কিছু বলিও না, ইহারা বোধ হয় রুক্মিণী সত্যভামা স্বশরীরে স্বামিদর্শনে যাইতেছেন।" অপরে মনে করিল যে, রুক্মিণী সত্যভামা শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, তাঁহাদিগের গমন সম্ভব নহে; অতএব নিশ্চয়ই ইহারা শ্রীরাধিকা এবং চন্দ্রাবলী, গোপকন্যা বলিয়া পদব্রজে যাইতেছেন। এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে, এক দুষ্টা স্ত্রী বলিল, "হউ হউ! যা! যা! সেঠিরে তা ভৌউড়ি* অছি, তুমানঙ্কো মারি পকাইব।"

এ দিকে শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী আপন মনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিল। সন্ন্যাসিনী বিরাগিণী প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার সুহৃদ্ কেহ নাই; আজ এক জন সমবয়স্কা প্রব্রজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখনও তার জীবন-স্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই। বরং শ্রীর শুকাইয়াছিল; কেন না, শ্রী দুঃখ কি, তাহা জানিয়াছিল, সন্ন্যাসী বৈরাগীর দুঃখ নাই। কথাবার্ত্তা যাহা হইতেছিল, তাহার মধ্যে গোটা দুই কথা কেবল পাঠককে শুনান আবশ্যক।

সন্ন্যাসিনী। তুমি বলিতেছ, তোমার স্বামী আছেন। তিনি তোমাকে লইয়া ঘর সংসার করিতেও ইচ্ছুক। তাতে তুমি গৃহত্যাগিনী হইয়াছ কেন, তাও তোমায় জিজ্ঞাসা করি না। কেন না, তোমার ঘরের কথা আমার জানিয়া কি হইবে? তবে এটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, কখনও ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি না?

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান?

সন্ন্যা। না। হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

সন্ন্যা। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি যে, তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি?

* সুভদ্রা।

সন্ন্যা। ললিতগিরিতে হস্তিগুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁহার কথা বলিতেছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায় ?

সন্ন্যা। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যার পর পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

তখন দুই জনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।† গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত, পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ, এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখর-দেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্ন-গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল্ স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইন্বর্ণ্ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

* হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে Accelerated Motionকে শীঘ্রগতি বলে। দুইটি গ্রহকে পৃথিবী হইতে যখন এক রাশিস্থিত দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে যুক্ত বলা যায়।

† এখন বিরূপা অতিশয় বিরূপা। এখন তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের প্রতাপে বৈতরণী পর্য্যন্ত বাঁধা—বিরূপাই বা কে—আর কেই বা কে ?

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তাল-বৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবন-ভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল—তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে, হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভ প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহার দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যুষে ধ্যান ভঙ্গ হইলে, গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসিনীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য—সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "তোমার কর্কট রাশি।" *

শ্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

* পবকনকশরীরো দেবনম্রপ্রকাশ্যো
ভবতি বিপুলবক্ষাঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ
কোষ্ঠীপ্রদীপে।

এইরূপ লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন।

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বাম হস্তের রেখা সকল, স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল, সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্রলিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশ-ভাবে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।" *

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভ-গ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে † পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামিসন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তমদর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে, আগামী বৎসরে, তুমি আমার নিকট আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিব।

তখন স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

---

* জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িনী রাজ্ঞী ভবেদ ভূপতেঃ।

† মকরে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই যুগল সন্ন্যাসিনীমূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। উড়িয়ারা পথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "মো মুণ্ডেরে চরণ দিবাকু হউ।" কেহ কেহ বলিল, "টিকে ঠিয়া হৈকিরি ম দুঃখ শুনিবারে হউ।" সকলকে যথাসম্ভব উত্তরে প্রফুল্ল করিয়া সুন্দরীদ্বয় চলিল।

চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধীরে যা গো বহিন! একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি?"

স্নেহসম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুই দিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুই দিন, মা! বাছা! বলিয়া কথা হইয়াছিল,—কেন না, সন্ন্যাসিনী শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে, সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিল, "আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না— আমাদের দুজনেরই সমান বয়স, আমরা দুই জনে ভগিনী।"

শ্রী। তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছ?

সন্ন্যাসিনী। আমার সুখ দুঃখ নাই। তেমন অদৃষ্ট নয়। তোমার দুঃখের কথা শুনিব। সে এখনকার কথা নয়। তোমার নাম এখনও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই— কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

সন্ন্যাসিনী। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে, কখনও কি ভাবিয়াছ?

শ্রী। না। ভাবি নাই। কিন্তু এতদিন ত কাটিয়া গেল।

জয়ন্তী। কিরূপে কাটিল?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব ?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ—কিছুই কি মন দিবার নাই ?

শ্রী। পাপে ?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে ?

জয়ন্তী। স্বামীর এক জন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী—কেন না, তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে ? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামিবিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভাল বাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন ?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না ? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে ?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল, "তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে ?"

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভাল বাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে ?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, "যদি একত্র ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ

আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মন ভার, অকৌশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিনভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলভরা গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে, ঠাকুরপ্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।”

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীরও চক্ষু ছল ছল করিল। এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী ?

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্ধ্যা—জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমশঃ শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শেষে সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।

কিন্তু সময়টা বড় মন্দ উপস্থিত হইল। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গৃহে গৃহে দেবালয়প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্যগীত, হরিসংকীর্ত্তনে দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, নরাধম মুরশিদ্ কুলি খাঁ * মুরশিদাবাদের মস্‌নদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল—বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না। মুরশিদ্ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু

* ইংরেজ ইতিহাসবেত্তগণের পক্ষপাত এবং কতকটা অজ্ঞতা নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌলা ঘৃণিত, এবং মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুর্‌শিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌলা দেবতাবিশেষ ছিলেন।

ধূল্যবলুণ্ঠিত, কেবল এইখানে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব্ খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর।"

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তবে, 'উদ্যোগ কর' বলিবামাত্র উদ্যোগটা হইয়া উঠিল না। কেন না, মুর্শিদ্ কুলি খাঁ সীতারামের বধের জন্য হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, ফৌজ পাঠান নাই। ইহাতে তিনি তোরাবের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই, মুসলমানের পক্ষে তাঁহার অবিচার ছিল না। তখনকার সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে—সাধারণ 'শান্তিরক্ষার' কার্য্য ফৌজদারেরা নিজ ব্যয়ে করিবেন,—বিশেষ কারণ ব্যতীত নবাবের সৈন্য ফৌজদারের সাহায্যে আসিত না। এক জন জমীদারকে শাসিত করা, সাধারণ শান্তিরক্ষার কার্য্যের মধ্যে গণ্য—তাই নবাব কোন সিপাহী পাঠাইলেন না। এ দিকে ফৌজদার হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, যখন শুনা যাইতেছে যে, সীতারাম রায়, আপনার এলাকার সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়াছে, তখন ফৌজদারের যে কয় শত সিপাহী আছে, তাহা লইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় হয় না। অতএব ফৌজদারের প্রথম কার্য্য সিপাহী-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেটা দুই এক দিনে হয় না। বিশেষ তিনি পশ্চিমে মুসলমান—দেশী লোকের যুদ্ধ করিবার শক্তির উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতএব মুরশিদাবাদ বা বেহার বা পশ্চিমাঞ্চল হইতে সুশিক্ষিত পাঠান আনাইতে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সীতারামও অনেক শিক্ষিত রাজপুত ও ভোজপুরী (বেহারবাসী) আপনার সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাজেই তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারিলেন না। তাহাতে একটু কালবিলম্ব হইল। ততদিন যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল।

তোরাব্ খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন। সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন। গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই—রামচন্দ্রেরও দুর্ম্মুখ ছিল। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা সিপাহী সংগ্রহ হইতেছে, ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন।

ইহার সকল উদ্যোগ করিয়া সীতারাম কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে সীতারাম রাজ্যরক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময় ও গঙ্গারামের উপর

দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃণ্ময়কে, নগররক্ষার ভার গঙ্গারামকে, এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না। সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কান্নাকাটি একটু থামিলে, রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল যে, এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয় ত তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয় ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয় ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে, নয় ত খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা যা করে, করুক, রমার তাতে তত ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন। তা, সে এক রকম ভালই হইয়াছে। তবে কি না, রমা তাঁকে আর এখন দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল, আর জন্মে দেখিবে। কই, মহম্মদপুরেও ত এখন আর বড় দেখা শুনা হইত না। তা দেখা না হউক, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা এক রকম সহিতে পারিয়াছিল। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তার পর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তার পর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না; সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেও ত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে। তা ছেলে কাকে দিয়ে যাব?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গোরু খায়, শত্রু—তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন! রমা এ কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? কিন্তু মনের মধ্যে এ সন্দেহ লইয়াও ত শরীর বহা যায় না। রমা আর ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অগত্যা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

গিয়া বলিল, "দিদি, আমার বড় ভয় করিতেছে—রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?"

নন্দা বলিল, "রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন্!"

রমা। তা এখন যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা করিবে?

নন্দা। বিধাতা করিবেন। তিনি না রাখিলে কে রাখিবে?

রমা। তা মুসলমান কি সকলকেই মারিয়া ফেলে?

নন্দা। যে শত্রু, সে কি আর দয়া করে?

রমা। তা, না হয়, আমাদেরই মারিয়া ফেলিবে—ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন, দিদি? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘটিবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন, মঙ্গলই হইবে। আমরা ত তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করি নাই—আমাদের কেন মন্দ হইবে? কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও! আয়, পাশা খেলিবি? তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।

এই বলিয়া নন্দা, রমাকে অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িল। রমা অগত্যা এক বাজি খেলিল, কিন্তু খেলায় তার মন গেল না। নন্দা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাজি হারিল—রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল। কিন্তু রমা আর খেলিল না—এক বাজি উঠিলেই রমাও উঠিয়া গেল।

রমা, নন্দার কাছে আপন জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর পায় নাই—তাই সে খেলিতে পারে নাই। কতক্ষণে সে আর এক জনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে, সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। রমা আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার এক জন বর্ষীয়সী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা—মুসলমানেরা কি ছেলে মারে?"

বর্ষীয়সী বলিল, "তারা কাকে না মারে? তারা গোরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি?"

রমার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন যাহাকে পাইল, তাহাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, পুরবাসিনী আবালবৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই মুসলমানভয়ে ভীত, কেহই মুসলমানকে ভাল চক্ষুতে দেখে না—সকলেই প্রায় বর্ষীয়সীর মত উত্তর দিল। তখন রমা সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তোরাব্ খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময় মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সংবাদও মহম্মদপুরে পৌঁছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। কেহ মাসীর বাড়ী, কেহ পিসীর বাড়ী, কেহ খুড়ার বাড়ী, কেহ মামার বাড়ী, কেহ শ্বশুরবাড়ী, কেহ জামাইবাড়ী, কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবার, ঘটি বাটি, সিন্দুক, পেটারা, তক্তপোষ সমেত গিয়া দাখিল হইল। দোকানদার দোকান লইয়া পলাইতে লাগিল, মহাজন গোলা বেচিয়া পলাইতে লাগিল, আড়তদার আড়ত বেচিয়া পলাইল, শিল্পকর যন্ত্র তন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল। বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম দাস, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিলেন। বলিলেন, "এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? সহর ত ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব্ খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল, তা হলে দুই মাস ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের এক জনকেও যাইতে দিবে না, যে যাইবে, তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র শস্ত্র একখানিও সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃণ্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব্ খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে, কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন কোন্ পথে তোরাব্ খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে; তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, তোরাব্ খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সংবাদটা কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর মহলে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, "প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তখন সে অন্তঃপুর মধ্যে কাঁদাকাটার ভারি ধূম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে একা বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত হইতে হইল—কেন না, রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি—কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।" তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এ দিকে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—"মা! তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ, আমাদের লড়াই ঝগড়া কাজ কি মা? প্রাণ বাঁচিলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে—মা, তোমার মঙ্গল হোক—আমাদের কথা শোন।"

নন্দা তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা! পুরুষ মানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ? তাঁরা যখন বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই—না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা বড় মূর্চ্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম নগররক্ষক। এ সময়ে রাত্রিতে নগর পরিভ্রমণে তিনি বিশেষ মনোযোগী। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রিতে, তিনি নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায়, গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন, এমন সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক জন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। অন্ধকারে স্ত্রীলোকের আকার, স্ত্রীলোকের বেশ, ইহা জানা গেল—কিন্তু আর কিছুই বুঝা গেল না। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

স্ত্রীলোক বলিল, "আমি যে হই, তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন নাই। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি চাই।"

কথার স্বরে বোধ হইল যে, এই স্ত্রীলোকের বয়স বড় বেশী নয়। তবে কথাগুলা জোর জোর রকম। গঙ্গারাম বলিল, "সে কথা পরে হইবে। আগে বল দেখি, তুমি স্ত্রীলোক, এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াইতেছ ? আজকাল কিরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহা কি জান না ?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে আর কিছু করিতেছি না—কেবল আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

গঙ্গারাম। মিছা কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে, আমি কে ?

স্ত্রীলোক। আমি চিনি যে, আপনি দাস মহাশয়, নগররক্ষক।

গঙ্গারাম। ভাল, চেন দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে এখানে পাইবার সম্ভাবনা, ইহা তুমি জানিবার সম্ভাবনা নাই ; কেন না, আমিই জানিতাম না যে, আমি এখন এ পথে আসিব।

স্ত্রীলোক। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আপনার বাড়িতেও সন্ধান লইয়াছি।

গঙ্গারাম। কেন?

স্ত্রীলোক। সেই কথাই আপনার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিবেন?

গঙ্গা। কি?

স্ত্রীলোক। আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেইখানে এখনই যাইতে পারিবেন?

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি?

গঙ্গা। আচ্ছা, তা না বল, আর দুই একটা কথা বল। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি করিতে হইবে?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক যেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা আগে আগে চলিল, গঙ্গারাম পাছু পাছু। কিছু দূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিলেন, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া বলিলেন, "এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ?"

মুরলা। তাতে দোষ কি?

গঙ্গারাম। সিং-দরজা দিয়া গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়কী। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে না কি?

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না, এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর! বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে ?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যাইতে দিবে ?

মুরলা। দিবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে না চিনিলে ছাড়িয়া দিবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দিবার আমার ইচ্ছা নাই।

মুরলা। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। মুরলা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন পাঁড়ে ঠাকুর, দ্বার খোলা রাখিয়াছ ত ?"

পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, রাখিয়েসে। এ কোন্ ?"

প্রহরী গঙ্গারামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিল। মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

পাঁড়ে। মবদ্ যাতে পার্বে না। হুকুম নেহি।

মুরলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ইঃ, কার হুকুম রে ? তোর আবার কার হুকুম চাই ? আমার হুকুম ছাড়া তুই কার হুকুম খুঁজিস্ ? খ্যাংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেব জানিস্ না ?"

প্রহরী জড়সড় হইল, আর কিছু বলিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতালায় উঠিল। সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, কিন্তু ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ, রজতপালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক—উজ্জ্বল দীপাবলির স্নিগ্ধ রশ্মি তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম কখনও সীতারামের অন্তঃপুরে আসে নাই, নন্দা কি রমাকে কখনও দেখে নাই। কিন্তু মহামূল্য গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে, ইনি এক জন রাণী হইবেন; রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এ জন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি কনিষ্ঠা মহিষী রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। মুরলা বলিল যে, প্রকাশ্যে আপনি আসিতে সাহস করিবেন না। সে আরও বলে—পোড়ারমুখী কত কি বলে, তা আমি কি বল্‌ব? তা, দাদা মহাশয়! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল, "কি হইয়াছে? কি করিতে হইবে?"

রমা। কি হইয়াছে? কেন, তুমি কি জান না যে, মুসলমান মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে—আমাদের সব খুন করিয়া, সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে?

গঙ্গা। কে তোমাকে ভয় দেখাইয়াছে? মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা কি জন্য? আমরা তবে তোমার অন্ন খাই কেন?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়—তোমরা অন্ত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে?

রমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা ত কর্‌বে—কিন্তু যদি না পারিলে?

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাদের সুঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের

প্রাণভিক্ষা মাগিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় বড় কাণ দিলেন না—তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন?

রমা। এই আমার গহনা পাতি আছে, সব নাও। আর আমার টাকা কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণী! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন—আর কখনও কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও এ কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমার শেষ আশা ভরসা ফরসা হইল। রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার বাছার দশা কি হইবে?" গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল, "চুপ করুন! যদি আপনার কান্না শুনিয়া কেহ এখানে আসে, তবে আমাদের দুই জনেরই পক্ষে অমঙ্গল! আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজি আছেন?"

রমা। যদি আমায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন?

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ্ দেখি, আমি আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। আমি কি প্রকারে সংবাদ পাইব?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সংবাদ লইবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া, কাঁপিয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দান করিলে, আমি চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া রমা, গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

কাহারও মনে কিছু মলা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, "আমার দোষ কি?" রমা বলিল, "এ না করিয়া কি করি—প্রাণ যায় যে।" কেবল মুরলা সন্তুষ্ট।

গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর এক জন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে—দেখিতেন—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
* * * চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥

এ দিকে বাদীর মনেও যা, বিধির মনেও তা। চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব্ খাঁর কাছে, এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন যে, "আমরা এ রাজ্য মায় কেল্লা সেলেখানা আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি—টাকা দিয়া নিন না?"

চন্দ্রচূড় মৃণ্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জানাইলেন। মৃণ্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ছি! এত বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। তত দিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারামের মনে কি হইল, বলিতে পারি না। সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তা, সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি কলান গণ্ড! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা, তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদুর্ল্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল, "মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

তা কি পারা যায় রে মূর্খ! একবার দেখিয়া, অমন হইলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দুপর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া

যে কয় বৎসর বাঁচি, সেই কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"—কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল, "আর একবার কি দেখিতে পাই না?" রাত্রি দুই চারি দণ্ডের সময়ে গঙ্গারাম ভাবিল, "আজ আবার মুরলা আসে না!" রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গিরেফ্‌তার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মুরলা। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে।

মুরলা। কিসে জানিলে?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বলা যায়?

মুরলা। তবে আমি এই কথা বলি গে?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া, রাজ্ঞীসমীপে সংবাদ নিবেদন করিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং রমাও কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল। আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই পাহারাওয়ালা সেইখানে ছিল, আবার গঙ্গারাম মুরলার ভাই বলিয়া পার হইলেন।

গঙ্গারাম, রমার কাছে আসিয়া মাথা মুণ্ড কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না, রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথা মুণ্ড তখন কিছুই ছিল না, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু দুইটি ছিল, প্রাণপাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া লইল, কাণ ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

গঙ্গারামের এতটুকু মাত্র চৈতন্য ছিল যে, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কল কৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই সে প্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ কোন কথা প্রকাশ করিতে সে আসে নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছিল। তাই দেখিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ আপনার চিত্ত রমারে দিয়া

চলিয়া গেল। আবার মুরলা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গমনকালে মুরলা গঙ্গারামকে বলিল, "আবার আসিবে?"

গঙ্গা। কেন আসিব?

মুরলা বলিল, "আসিবে বোধ হইতেছে।"

গঙ্গারাম চোখ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে—কিছু বলিল না।

এ দিকে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব্ খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প স্বল্প টাকা দিলে মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন, "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব্ খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, "কত টাকা চাও?" চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন; তোরাব্ খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তার পর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব্ খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালামুখী মুরলা যা বলিল, তাই হইল। গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল। গেল কারণ, গঙ্গারাম না গিয়া আর থাকিতে পারিবে না। রমা আর ডাকে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে সংবাদ লইতে পাঠাইত; কিন্তু গঙ্গারাম মুরলার কাছে কোন কথাই বলিত না, বলিত, "তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এ সকল গোপন কথা কি বলা যায়? আমি একদিন নিজে গিয়া বলিয়া আসিব।" কাজেই রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে, সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপর বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না। তা, প্রেমসম্ভাষণের ভরসায় গঙ্গারামের যাতায়াতের চেষ্টা নয়। গঙ্গারাম জানিত, সে পথ বন্ধ। তবু শুধু দেখিয়া, কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই এত আনন্দ!

একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে, তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।

ভয় দেখাইয়া, গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম, আজ কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

একেবারে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" চলে না। রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশ বার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছুই দোষ হইত না; কেন না, রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এমন ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। আর কিছু হউক না হউক, একটু বেশী আদর, একটু বেশী খোলা কথা, কথাবার্ত্তায় একটু বেশী অসাবধানতা, একটু বেশী মনের মিল হইয়া পড়ে। তাহা হইল না যে এমন নহে। রমা তাহা আগে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মুরলার একটা কথা দৈববাণীর মত তাহার কাণে লাগিল। একদিন মুরলার সঙ্গে পাঁড়ে ঠাকুরের সে বিষয়ে কিছু কথা হইল। পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "তোমারা ভাই হামেশা রাত্‌কো ভিতরমে যায়া আয়া করতাহৈ কাহেকো?"

মু। তোর কিরে বিট্‌লে? খ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভয় ত হৈ, লেকেন্ জান্‌কাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আরও জান্ আছে না কি? আমিই ত তোর জান্!

পাঁড়ে। তোম্ ছাড়্‌নেসে মরেঙ্গে নেহি, লেকেন্ জান্ ছোড়্‌নেসে সব আফিয়ানা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ঔর্ ছোড়েঙ্গে নেহি।

মু। তা না ছোড়িস্ আমি তোকে ছোড়ঙ্গে। কেমন কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, বহ আদমি তোমারা ভাই নেহি, কোই বড়ে আদমী হোঁগা, বঙ্গা হিঁয়া কিয়া কাম্ হাম্‌কো কুছ্ মালুম নেহি, মালুম হোনেভি কুছ্ জরুর নেহি। কিয়া জানে, বহ অন্দরকা খবরদারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ। তৌ ভী, যব্ পুষিদা হোকে আতে যাতে তব্ হম্ লোগ্‌কো কুছ্ মিল্‌না চাহিয়ে। তোম্‌কো কুছ্ মিলা হোগা—আধা হাম্‌কো দে দেও, হম্ নেহি কুছ্ বোলেঙ্গে।

মু। সে আমায় কিছু দেয় নাই। পাইলে দিব।

পাঁড়ে। আদা কর্‌কে লে লেও।

মুরলা ভাবিল, এ সৎপরামর্শ। রাণীর কাছে গহনাখানা কাপড়খানা মুরলার পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নাই। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া পাঁড়েজীকে বলিল, "আচ্ছা, এবার যে দিন আসিবে, তুমি ছাড়িও না। আমি বলিলেও ছাড়িও না। তা হলে কিছু আদায় হইবে।"

তার পর যে রাত্রিতে গঙ্গারাম পুরপ্রবেশার্থ আসিল, পাঁড়েজী ছাড়িলেন না। মুরলা অনেক বকিল ঝকিল, শেষ অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই না। গঙ্গারাম পরামর্শ করিলেন, পাঁড়ের কাছে প্রকাশ হইবেন, নগররক্ষক জানিতে পারিলে, পাঁড়ে আর আপত্তি করিবে না। মুরলা বলিল, "আপত্তি করিবে না, কিন্তু লোকের কাছে গল্প করিবে। এ আমার ভাই যায় আসে, গল্প করিলে যা দোষ, আমার ঘাড়ের উপর দিয়া যাইবে।" কথা যথার্থ বলিয়া গঙ্গারাম স্বীকার করিলেন। তার পর গঙ্গারাম মনে করিলেন, "এটাকে এইখানে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাই।" কিন্তু তাতে আরও গোল। হয় ত একেবারে এ পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পাঁড়ে কিছুতেই ছাড়িল না, সুতরাং সে রাত্রিতে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মুরলা একা ফিরিয়া আসিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি আজ আসিলেন না?"

মু। তিনি আসিয়াছিলেন—পাহারাওয়ালা ছাড়িল না।

রাণী। রোজ ছাড়ে, আজ ছাড়িল না কেন?

মু। তার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে।

রাণী। কি সন্দেহ?

মু। আপনার শুনিয়া কাজ কি? সে সকল আপনার সাক্ষাতে আমরা মুখে আনিতে পারি না, তাহাকে কিছু দিয়া বশীভূত করিলে ভাল হয়।

যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে, বুঝিতে পারে না যে, পবিত্র মানুষ আছে, সুতরাং তাহার কার্য্য ধ্বংস হয়। মুরলার কথা শুনিয়া রমার গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া, কাঁপিয়া, বসিয়া পড়িল। বসিয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান হইল। এমন কথা, রমার মনে এক দিনও হয় নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল যে, সে দিক্‌টা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। এখন বজ্রাঘাতের মত কথাটা বুকের উপর

পড়িল। দেখিল, ভিতরে যাই থাক, বাহিরে কথাটা ঠিক। মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। রমার স্থূল বুদ্ধি, তবু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর মেয়ের একটা বুদ্ধি আছে, যাহা একবার উদয় হইলে এ সকল কথা বড় পরিষ্কার হইয়া থাকে। যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রমা মনে করিয়া দেখিল—বুঝিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। তখন রমা মনে ভাবিল, বিষ খাইব, কি গলায় ছুরি দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে সব পাপ চুকিয়া যায়, মুসলমানের ভয়ও ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ছেলের কি হইবে? রমা শেষ স্থির করিল, রাজা আসিলে গলায় ছুরি দেওয়া যাইবে, তিনি আসিয়া ছেলের বন্দোবস্ত যা হয় করিবেন—তত দিন মুসলমানের হাতে যদি বাঁচি। মুসলমানের হাতে ত বাঁচিব না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিব না, কি লোক পাঠাইব না। তা রমা আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না, কি মুরলাকে যাইতে দিল না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। গঙ্গারাম মুরলার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু মুরলা রাজবাটীর পরিচারিকা—রাস্তা ঘাটে সচরাচর বাহির হয় না, কেবল মহিষীর হুকুমে গঙ্গারামের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গঙ্গারাম মুরলার কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষ নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে। রমার কাছে পাঠাইতে সাহস হয় না।

মুরলা আসিল—জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

গঙ্গারাম। আর খবর নাও না কেন?

মুরলা। জিজ্ঞাসা করিলে খবর দাও কই? আমাদের ত তোমার বিশ্বাস হয় না?

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়াও না হয় বলিয়া আসিতে পারি।

মুরলা। তাতে, যে ফল নৈবিদ্যিতে দেয় তার আটটি।

গঙ্গা। সে আবার কি?

মুরলা। ছোট রাণী আরাম হইয়াছেন।

গঙ্গা। কি হইয়াছিল যে আরাম হইয়াছেন?

মুরলা। তুমি আর জান না কি হইয়াছিল?

গঙ্গা। না।

মুরলা। দেখ নাই, বাতিকের ব্যামো?

গঙ্গা। সে কি ?

মুরলা। নহিলে তুমি অন্দর মহলে ঢুকিতে পাও ?

গঙ্গা। কেন, আমি কি ?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যোগ্য ?

গঙ্গা। আমি তবে কোথাকার যোগ্য ?

মু। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে হয় ত আমাকে লইয়া চল। অনেক দিন বাপ মা দেখি নাই।

এই বলিয়া মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গঙ্গারাম বুঝিলেন, এ দিকে কোন ভরসা নাই। ভরসা নাই, এ কথা কি কখন মন বুঝে ? যতক্ষণ পাপ করিবার শক্তি থাকে, ততক্ষণ যার মন পাপে রত হইয়াছে, তার ভরসা থাকে। "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, ভীষণমূর্তি হইয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রাত্রিতে ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে, শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তাই, দুই জনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফামধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখর-দেশে আরোহণ করিয়া, চন্দনবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরের এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

মহাপুরুষ কি আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, শ্রী বলিল, "কি মিষ্ট পাখীর শব্দ !- কাণ জুড়িয়া গেল !"

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি ?

শ্রী। এই নদীর তরতর গদগদ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি ?

শ্রী। অনেক দিন স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।

হায়! সীতারাম!

জয়ন্তী তাহা জানিত, মনে করাইবার জন্য সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জয়ন্তী বলিল, "এখন শুনিলে আর তেমন ভাল লাগিবে না কি?"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া, জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?"

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?

জয়ন্তী। বুঝিতে পারিলে না কি শ্রী? তোমায় আজিও কি এত বুঝাইতে হইবে?

শ্রী। না—বুঝি নাই।

জয়ন্তী। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে, ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না। ইহাতে তোমার শুভাশুভ কিছুই নাই।

শ্রী। বুঝিয়াছি—আমি এখন গেলে আমার স্বামীর শুভ হইবার সম্ভাবনা?

জয়ন্তী। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভাঙ্গিয়াও বলেন না, আমাদিগের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে চাহেন না। তবে তাঁহার কথার এইমাত্র তাৎপর্য্য হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এতদিন যাহা শুনিলে শিখিলে, তাহাতে তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

শ্রী। তুমি যাইবে কেন?

জয়ন্তী। তাহা আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আমি যাইব। না যাইব কেন? তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই প্রিয়প্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না। এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও, আমাকে বুঝাও। তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা এক জন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি এক দিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য; তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে, আমারই হাতে তাঁহার সংসারযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্রপারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ্ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

হো হো সীতারাম! কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

জয়ন্তী মনে মনে বড় খুসী হইল। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে ভাবিতেছ কেন?"

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠীর ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে, কি বৈতরণীতীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে বাড়িয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে, তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্য?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন কি? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ দুঃখ কি? (পরে সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া এক জন সন্ন্যাসিনী প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?

জয়ন্তী। হইতে পারে, না হইতে পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহার চিত্তে যেন স্থান না পায়—তাহা হইলে সকল দিকেই ঠিক কাজ হইবে; এক্ষণে চল, তোমার স্বামীর হউক, কি যাহারই হউক, যখন শুভ সাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

যতক্ষণ এই কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ জয়ন্তীর হাতে দুইটা ত্রিশূল ছিল। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিশূল কেন?"

"মহাপুরুষ আমাদিগকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি ত্রিশূল দিয়াছেন। বোধ হয়, ত্রিশূল মন্ত্রপূত।" *

তখন দুই জনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং উভয়ে পর্ব্বত অবরোহণ করিয়া বিরূপাতীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল। পথপার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া উভয়ে তাহার দল কেশর রেণু প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এবং পুষ্পনির্ম্মাতার অনন্ত কৌশলের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সীতারামের নাম আর কেহ একবারও মুখে আনিল না। এ পোড়ারমুখীদিগকে জগদীশ্বর কেন রূপ যৌবন দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমূর্খ সীতারাম, শ্রী! শ্রী! করিয়া পাতি পাতি করিল, সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধ হয়, দুইটাকেই ডাকিনী-শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বন্দেআলি নামে ভূষণার এক জন ছোট মুসলমান, এক জন বড় মুসলমানের কবিলাকে বাহির করিয়া তাহাকে নেকা করিয়াছিল। খসম গিয়া বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের উদ্যোগী হইল; দোস্ত বিবি লইয়া মহম্মদপুর পলায়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। গঙ্গারামের নিকট সে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। তাঁহার অনুগ্রহে সে সীতারামের

* আধুনিক ভাষায় "magnetized."

নাগরিক সৈন্য মধ্যে সিপাহী হইল। গঙ্গারাম তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব্ খাঁর নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন যে, টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনাবাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আসামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে বন্দেআলির ভগিনী এক্ষণে তোরাব্ খাঁর এক জন মতাহিয়া বেগম। সুতরাং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ বন্দেআলির পক্ষে কঠিন হইল না। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। গঙ্গারাম অভয় পাইলেন।

তোরাব্ স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন, "তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণা হইতে ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদ শাহা ফকির—সেও পার হইতেছিল। ফকির বন্দেআলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিলে?" জিজ্ঞাসা করায় বন্দেআলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বখশী, মনশী, কারকুন, পেস্কার, লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ফৌজদার তাঁহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইল না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের

দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন, "দুর্গদ্বারে পৌছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মৃণ্ময়ের তাবে অনেক সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে, তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর পথ, এক দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথে, দূরে নদী পার হইতে হয়—উত্তর পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মৃণ্ময় তাহা বিশ্বাস করিবে; কেন না, কিল্লার সম্মুখে নদীপার কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সেও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না বা অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মৃণ্ময় দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায় যে, আমরা উত্তর পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন। উত্তর পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন কেহ তাহা না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তার পর মৃণ্ময় ফৌজ লইয়া কিছু দূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মৃণ্ময়ের সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন, "উত্তম। তুমি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেতেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত?"

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিলেন—বলা বাহুল্য, সে পুরস্কার রমা।

সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রিতেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না যে, চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃণ্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ এই স্থির হইল যে, মৃণ্ময় সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতে দক্ষিণ পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবনসেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে রণসজ্জার ধূম পড়িয়া গেল। মৃণ্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রিতেই দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন। গড় রক্ষার্থ অল্প মাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এই সকল গোলমালের সময়ে পাঠকের কি গরিব রমাকে মনে পড়ে? সকলের কাছে মুসলমানের সৈন্যাগমনবার্ত্তা যেমন পৌঁছিল, রমার কাছেও সেইরূপ পৌঁছিল। মুরলা বলিল, "মহারাণী, এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

রমা বলিল, "মরিতে হয় এইখানেই মরিব। কলঙ্কের পথে যাইব না। কিন্তু তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মনস্থির করিবার জন্য নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরীমধ্যে কেহই সে রাত্রিতে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল। গঙ্গারাম নিশীথকালে গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রত্ন আশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে তিনি প্রবৃত্ত—সাঁতার দিয়া আবার কূল পাইবেন কি? গঙ্গারাম সাহসে ভর করিয়াও এ কথার কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারে, তাহার শেষ ভরসা জগদীশ্বর। সে বলে, "জগদীশ্বর যা করেন।" কিন্তু গঙ্গারাম তাহাও বলিতে পারিতেছিলেন না—যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত, সে জানে যে, জগদীশ্বর তার বিরুদ্ধ—জগতের বন্ধু তাহার শত্রু। অতএব গঙ্গারাম বড় বিষণ্ণ হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন।

এমন সময়ে মুরলা আসিয়া দেখা দিল। রমার প্রেরিত সংবাদ তাঁহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল, "বলেন ত এখন গিয়া ছেলে নিয়া আসি।"

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

গঙ্গা। তখন কি হইবে, কে বলিতে পারে? যদি রক্ষার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই বেলা বালকটিকে আমাকে দিন।

মুরলা। আমি তাহাকে লইয়া আসিব?

গঙ্গা। না। আমার অনেক কথা আছে।

মুরলা। আচ্ছা—পৌষ মাসে।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উঠিতে না উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল ভয়ে মুখ কালি হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে রাজপথে, প্রভাতশুক্রতারাবৎ সমুজ্জ্বলা ত্রিশূলধারিণী যুগল-ভৈরবীমূর্ত্তি! মুরলা তাহাদিগকে শঙ্করীর অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

এক জন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল, "আমি মুরলা।"

ভৈরবী। মুরলা কে?

মুরলা। আমি ছোট রাণীর দাসী।

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এত রাত্রিতে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মুরলা। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস্?

মুরলা। আজ্ঞা হাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মুরলা। যে আজ্ঞা।

তখন দুই জনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্রমধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে রাত্রিতে নিদ্রা নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, নগর রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি অতিশয় অনুতপ্ত-চিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে চাঁদশাহ ফকির আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণাগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড় শিহরিয়া উঠিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন যে, জনকত সিপাহী লইয়া গঙ্গারামকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া, নগর রক্ষার ভার অন্য লোককে দিবেন, কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামের বাধ্য। অতএব সে সকল উদ্যম সফল হইবে না। মৃণ্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, সিপাহীরা মৃণ্ময়ের আজ্ঞাকারী। মৃণ্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এত অনুতাপপীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ কেবল অসুরনিসূদন হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল ও চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, জয়ন্তী।

প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রচূড় আরও বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি এই নগরের রাজলক্ষ্মী?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, আমার কথার উত্তর দাও। নহিলে মঙ্গল হইবে না।

চন্দ্র। মা! আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগর রক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশ নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

জয়ন্তী। নগররক্ষকের সংবাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতা শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। তিনি তোরাব্ খাঁর নিকট গিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিবেন। আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই।

মা! বোধ করিতেছি, আপনি এই নগরীর রাজলক্ষ্মী। দয়া করিয়া এ দাসকে ভৈরবী-বেশে দর্শন দিয়াছেন। মা! আপনি অপরিম্লানতেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুরী রক্ষা করুন।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে, আমিই এই পুরী রক্ষা কবিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল। চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

জয়ন্তীরও আশার অতিরিক্ত ফললাভ হইয়াছিল। শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুরলা চলিয়া গেলে, গঙ্গারাম চারি দিকে আরও অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যাহার জন্য তিনি এই বিপদ্‌সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন, সে ত তাঁহার অনুরাগিণী নয়। তিনি চক্ষু বুজিয়া সমুদ্রমধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন, সমুদ্রতলে রত্ন মিলিবে কি? না, ডুবিয়া মরাই সার হইবে? আঁধার! চারি দিকে আঁধার! এখন কে তাঁকে উদ্ধার করিবে?

সহসা গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দেখিলেন, দ্বারদেশে প্রভাতনক্ষত্রোজ্জ্বল রূপিণী ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীমূর্ত্তি। অঙ্গপ্রভায় গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি ম্লান হইয়া গেল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায় প্রণত হইয়া যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

ভৈরবীর কথা শুনিয়া, গঙ্গারাম বলিল, "মা! আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ী গোলা বারুদ দাও। আর এক জন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—কে এ? জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আপনি গোলা বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। এ যদি কোন দেবী হইবে, তবে গোলা গুলি ইহার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে গোলা গুলি দিব কেন? কাহার চর তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, রমা ও মুরলা ঘটিত সংবাদ আমি সব জানি। তা ছাড়া তোমার ভূষণাগমন-সংবাদ ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন দিতেছি।" বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল, এবং পিয়ারীলাল নামে এক জন গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। যেন তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলা বারুদ লইয়া, গড়ের বাহির হইয়া, যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট, সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথা বসিয়া আছেন।

দুই জন ভৈরবীর মধ্যে এক জন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ী ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর এক জন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই না। তুমি কে?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলা গুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল, দেবতাভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তাতেই বা কি?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বলিয়াছি, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চ চূড়ে উঠিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে, ঠিক তাহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে, কিন্তু তখনও তেমন ফর্সা হয় নাই, বোঝা গেল না যে, তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকাশিখরদেশে উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও পারে অত নৌকা কেন ?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি ?"

চন্দ্র। দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন ?

গঙ্গারাম। বলিতে ত পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। তখন বোধ হইল, ঐ সকল লোক সৈনিক। চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন, "গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের চর আমাদের প্রতারণা করিয়াছে। অথবা সেই প্রতারিত হইয়াছে। আমরা দক্ষিণ পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইল। এখন রক্ষা করে কে ?"

গঙ্গা। কেন, আমি আছি কি করিতে ?

চন্দ্র। তুমি এই কয় জন মাত্র দুর্গরক্ষক লইয়া এই অসংখ্য সেনার কি করিবে ? আর তুমিও দুর্গরক্ষার কোন উদ্যোগ করিতেছ না। কাল বলিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে কড়া কড়া শুনাইয়াছিলে। এখন কে দায় ভার ঘাড়ে করে ?

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না। ও পারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহা অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয় জন সিপাহী পার হইতে পারে ? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবেন, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তার পর তিনি সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবেন, মুক্ত দ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে। তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিলেন, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার আর কিছু প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন, "তবে শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকা সকল সিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।"

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ ছয় শত মুসলমান সিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। সিপাহী সকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়! হায়! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম! এখন সর্ব্বনাশ হইল। কৈ, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কৈ? তিনিও কি ছলনা করিলেন?" চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায়ে সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুড়ুম্ করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকাশ্রেণী হইতে আওয়াজ হইল, এমন বোধ হইল না। তাহাদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ হইতেছিল না। চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, মুসলমানের কোন নৌকায় কামানের ধরা দেখা যায় না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল; আরোহী সিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"তবে কি এ আমাদের তোপ!"

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একটি সিপাহীও গড় হইতে বাহির হয় নাই। দুর্গপ্রাকারে, যেখানে তোপ সকল সাজান আছে, সেখানে একটি মনুষ্যও নাই। তবে এ তোপ ছাড়িল কে?

কোনও দিকে ধূম দেখা যায় কি না, ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য চন্দ্রচূড় চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাটীর ঘাট, সেইখান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ধূমরাশি আকাশমার্গে উঠিয়া পবন-পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে, ঘাটের উপরে, গাছের তলায় একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন—কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে? গঙ্গারামের একটি সিপাহীও বাহির হয় নাই—এখনও ফটক বন্ধ। মৃণ্ময়ের সিপাহীরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মৃণ্ময় যে কোন সিপাহী ঐ কামানের জন্য রাখিয়া

যাইবেন, ইহা অসম্ভব; কেন না, দুর্গরক্ষার ভার গঙ্গারামের উপর আছে। কোন বাজে লোক আসিয়া কামান ছাড়িল—ইহাও অসম্ভব; কেন না, বাজে লোকে গোলা বারুদ কোথা পাইবে? আর এরূপ অব্যর্থ সন্ধান—বাজে লোকের হইতে পারে না—শিক্ষিত গোলন্দাজের। কার এ কাজ? চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক্ শব্দিত করিল—আবার ধূমরাশি আকাশে উঠিয়া নদীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে গগন বিচরণ করিতে লাগিল—আবার মুসলমান সিপাহীপরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য! ধন্য!" বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী! বুঝি কালিকা সদয় হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয় লক্ষ্মীনারায়ণজী! জয় কালী! জয় পুররাজলক্ষ্মী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন যে, যে সকল নৌকা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল—অর্থাৎ যে সকল নৌকার সিপাহীদের গুলি তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহারা তীর লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল—শব্দে কাণ পাতা যায় না। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, "যদি আমাদের রক্ষক দেবতা হয়েন—তবে এ গুলিবৃষ্টি তাঁহার কি করিবে? আর যদি মনুষ্য হয়েন, তবে আমাদের জীবন এই পর্য্যন্ত—এ লোহাবৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।"

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবার দশ দিক্ কাঁপিয়া উঠিল—ধূমের চক্রে চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল। আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন এক দিকে—এক কামান—আর এক দিকে শত শত মুসলমান সেনায় তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কাণ পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্ম্মুহুঃ ইন্দ্রহস্তপরিত্যক্ত বজ্রের মত, সেই কামান ডাকিতে লাগিল,—প্রশস্ত নদীবক্ষ এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে, চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তালতরঙ্গসংক্ষুব্ধ ধূমসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন। চন্দ্রচূড় তীব্র দৃষ্টিতে ধূমসমুদ্রের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—এই আশ্চর্য্য সমরের ফল কি হইল—দেখিবেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধূঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল—তখন চন্দ্রচূড় সেই জলময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ছিন্ন, নিমগ্ন, নৌকা সকল স্রোতে উলটি পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহে নদীস্রোত ঝটিকাশান্তির পর পল্লবকুসুমসমাকীর্ণ উদ্যানবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কাহারও

অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও বাদ্য, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—কাহাকেও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে কয়খানা নৌকা ডোবে নাই—সে কয়খানা, নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। একমাত্র বজ্রের প্রহারে আহত আসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাত যোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে, গদগদকণ্ঠে, সজলনয়নে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! জয় দৈত্যদমন, ভক্ততারণ, ধর্ম্মরক্ষণ হরি! আজ বড় দয়া করিলে! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে এই পুররাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

তখন চন্দ্রচূড়, প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কামানের বন্দুকের হুড়্মুড়্ হুড়্মুড়্ শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল—এ আবার কি? লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় ত? তিনি কি দেবতা? গঙ্গারাম এক জন জমাদ্দারকে দেখিতে পাঠাইলেন। জমাদ্দার নিষ্ক্রান্ত হইল। সে দিন, সেই প্রথম ফটক খোলা হইল।

জমাদ্দার ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল, "মুসলমান লড়াই করিতেছে।"

গঙ্গারাম বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা ত জানি। কার সঙ্গে মুসলমান লড়াই করিতেছে?"

জমাদ্দার বলিল, "কারও সঙ্গে নহে।"

গঙ্গারাম হাসিল, "তাও কি হয় মূর্খ! তোপ কার?"

জমাদ্দার। হুজুর, তোপ কারও না।

গঙ্গারাম বড় রাগিল। বলিল, "তোপের আওয়াজ শুনিতেছিস্ না?"

জমাদ্দার। তা শুনিতেছি।

গঙ্গারাম। তবে? সে তোপ কে দাগিতেছে?

জমা। তাহা দেখিতে পাই নাই।

গঙ্গা। চোখ কোথা ছিল ?

জমা। সঙ্গে।

গঙ্গা। তবে তোপ দেখিতে পাও নাই কেন ?

জমা। তোপ দেখিয়াছি—ঘাটের তোপ।

গঙ্গা। বটে! কে আওয়াজ করিতেছে ?

জমা। গাছের ডাল।

গঙ্গা। তুই কি ক্ষেপিয়াছিস্ ? গাছের ডালে তোপ দাগে ?

জমা। সেখানে আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না—কেবল কতকগুলা গাছের ডাল তোপ ঢাকিয়া নুইয়া পড়িয়া আছে দেখিলাম।

গঙ্গা। তবে কেহ ডাল নোওয়াইয়া বাঁধিয়া তাহার আশ্রয়ে তোপ দাগিতেছে। সে বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই। সিপাহীরা তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু সে পাতার আড়াল হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিবে। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন ?

জমা। সেখানে কি যাওয়া যায় ?

গঙ্গা। কেন ?

জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়িতেছে।

গঙ্গা। গুলিতে এত ভয় ত এ কাজে এসেছিলি কেন ?

তখন গঙ্গারাম অনুচরকে হুকুম দিল যে, জমাদ্দারের পাগড়ি পোষাক কাপড় সব কাড়িয়া লয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মৃণ্ময় বাছা বাছা জনকত হিন্দুস্থানীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং দুর্গরক্ষার জন্য তাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গারাম তাহাদিগের মধ্যে চারি জনকে আদেশ করিল, "যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে, সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারি জন সিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা বাহিয়া পলাইয়া যাইতেছে। সিপাহীরা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে এক জন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে—আর এক জন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোওয়ান, ধুতি মালকোঁচা মারা, মাথায় মুখে গালচাল্লা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারি জন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "তোম্ কোন্ হো রে ?"

সে বলিল, "কেন বাপু!"

"তোম্ কাহে হিঁয়া বৈঠ্ বৈঠ্কে তোপ ছোড়্তে হো ?"

"কেন বাপু, তাতে কি দোষ হয়েছে ? মুসলমানের সঙ্গে তোমরা মিলেছ ?"

"আরে মুসলমান আনেসে হম্লোক আভি হাঁকায় দেতে—তোম্ কাহেকো দিক্ কিয়ে হো ? চল্ হুজুরমে যানে হোগা।"

"কার কাছে যাব ?"

"কোতোয়াল সাহেবকি হুকুমসে তোম্কো উন্কা পাশ লে যাঙ্গে।"

"আচ্ছা যাই। আগে নেড়েরা বিদায় হোক। যতক্ষণ ওদের মধ্যে এক জনকে ও পারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলে উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ও কে চিনিতে পারিস্ কি না ?"

সিপাহীরা দেখিয়া বলিল, "হাঁ, হামলোক ত ইস্কো পহচান্তে হেঁ। য়ে ত হমারা গোলন্দাজ পিয়ারীলাল হৈ—য়ে কাঁহাসে আয়া ?"

"তবে আগে ওকে গড়ের ভিতর নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।"

সিপাহীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "য়ে আদমি ত অচ্ছা বোল্তা হৈ। যো তোপ্কা পাশ রহেগা, ওসিকো লে যানেকো হুকুম হৈ। এই মুবদার তোপ্কা পাশ হৈ —উস্কো আলবৎ লে যানে হোগা।"

কিন্তু মড়া—হিন্দু সিপাহীরা ছুঁইবে না। তখন পরামর্শ করিয়া এক জন সিপাহী, ডোম ডাকিতে গেল—আর তিন জন তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এ দিকে কালি বারুদ মাখা পুরুষ, ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যে, মুসলমান সিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি সিপাহীদিগকে বলিলেন, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।" সিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে যেখানে ভীত নাগরিকগণ পিপীলিকা শ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেইখানে সিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ পূরিয়া উঠিল। সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিকমণ্ডলী, একেবারে সহস্র কণ্ঠে গর্জ্জন করিল, "জয় মহারাজের জয়।"

"জয় মহারাজাধিরাজকি জয়।"

"জয় শ্রীসীতারাম রায় রাজা বাহাদুরকি জয়।"

"জয় লক্ষ্মীনারায়ণজীকি জয়।"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন ; বারুদমাখা পুরুষও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সমর দেখিয়া আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন এ অব্যর্থ সন্ধান আর কাহারও নাই। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দাও।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতারামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সীতারাম, তখন সিপাহীদিগকে দুর্গপ্রাকারস্থিত তোপ সকলের নিকট, এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া, এবং মৃণ্ময়ের সম্বন্ধে সংবাদ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কখন আসিয়াছেন, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। একাই বা কেন আসিলেন? আপনার অনুচরবর্গই বা কোথায়? পথে কোন বিপদ্ ঘটে নাই ত?"

সীতা। সঙ্গীদিগকে পথে রাখিয়া আমি একা আগে আসিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জানিবার জন্য ছদ্মবেশে একা রাত্রিকালে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিয়াছি। পরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলাম, ফটক বন্ধ। দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, প্রভাত নিকট দেখিয়া নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান সেনা নৌকায় পার হইতেছে। দুর্গরক্ষকেরা রক্ষার কোন উদ্যোগই করিতেছে না দেখিয়া, আপনার যাহা সাধ্য, তাহা করিলাম।

চন্দ্র। যাহা করিয়াছেন, তাহা আপনারই সাধ্য, অপরের নহে। এত গোলা বারুদ পাইলেন কোথা?

সীতা। এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা বারুদ, এবং গোলন্দাজ আনিয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্র। দেবী? আমিও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। তিনি কোথায় গেলেন?

সীতা। তিনি আমাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এক্ষণে এ কয় মাসের সংবাদ আমাকে বলুন।

তখন চন্দ্রচূড় সকল বৃত্তান্ত, যতদূর তিনি জানিতেন, আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন, "এক্ষণে যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সংবাদ বলুন।"

সীতা। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আমি কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, ফৌজদার সুবাদারের অধীন, এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। যিনি আমাকে এতদূর অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা নিতান্ত কৃতঘ্নের কাজ। আত্মরক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার অকর্ত্তব্য। অতএব এ বিরোধ আমার বড় দুরদৃষ্ট বিবেচনা করি।

চন্দ্র। ইহা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট—হিন্দু মাত্রেরই শুভাদৃষ্ট; কেন না, আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে? হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইবে কোথায়? ইহা আপনারও শুভাদৃষ্ট; কেন না, যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্য মধ্যে কৃতী ও সৌভাগ্যশালী।

সীতা। মৃণ্ময়ের সংবাদ না পাইলে, কি কর্ত্তব্য, কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃণ্ময়ের সংবাদ আসিল। পীর বক্স্ খাঁ নামে ফৌজদারী সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক পথে মৃণ্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃণ্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃণ্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, "মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে জয়ী সেনা লইয়া নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।"
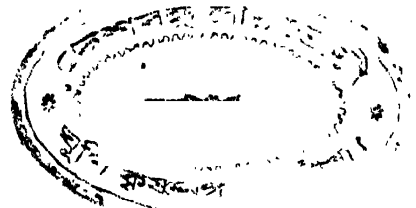
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছু দিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি, যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

অতএব শ্রী, রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

তৃতীয় খণ্ড

রাত্রি—ডাকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ মৃণ্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাসলেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্ হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন।

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ডপ্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকি যেটুকু, সেটুকু মুরলা ও চাঁদশাহ ফকির সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি—এমন সময়ে এ কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

এ কথাগুলা রমা, অন্তঃপুরে বসিয়া সীতারামের কাছে, চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার একবর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন, সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না। গঙ্গারাম কয়েদ হইল কেন? এই কথাটা লইয়া সহরে বড় আন্দোলন পড়িয়া গেল। কতক মুরলার দোষে, কতক সেই পাহারাওয়ালা পাঁড়ে ঠাকুরের গল্পের জাঁকে; রমার নামটা সেই সঙ্গে লোকে মিলাইতে লাগিল। কেহ বলিল যে, গঙ্গারাম মোগলকে রাজ্য বেচিতে বসিয়াছিল; কেহ বলিল যে, সে ছোট রাণীর মহলে গিরেপ্তার হইয়াছিল; কেহ বলিল, দুই কথাই সত্য, আর রাজ্য বেচার পরামর্শে ছোট রাণীও ছিলেন। রাজার কাণে এত কথা

উঠে না, কিন্তু রাণীর কাণে উঠে—মেয়ে মহলে এ রকম কথাগুলা সহজে প্রচার পায়—শাখা প্রশাখা সমেত। দুই রাণীর কাণেই কথা উঠিল। রমা শুনিয়া শয্যা লইল, কাঁদিয়া বালিশ ভাসাইল, শেষ গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরা ঠিক করিল। নন্দা শুনিয়া বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল।

নন্দা খুঁজিয়া খুঁজিয়া রমা যেখানে বালিশে মুখ ঝাঁপিয়া কাঁদিতেছে, আর পুকুরে ডুবিয়া মরা সোজা, কি গলায় দড়ি দিয়া মরা সোজা, ইহার যতদূর সাধ্য মীমাংসা করিতেছে, সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "দেখিতেছি, তুমিও ছাই কথা শুনিয়াছ।" রমা কেবল ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ "শুনিয়াছি।" চক্ষুর জল বড় বেশী ছুটিল।

নন্দা তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া, সস্নেহবচনে বলিল, "কাঁদিলে কলঙ্ক যাবে না, দিদি! না কাঁদিয়া, যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে। পারিস্ ত উঠিয়া বসিয়া, ধীরে সুস্থে আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল্ দেখি। এখন আমাকে সতীন ভাবিস্ না—কালি চূণ তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমারও প্রভু, এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী, তা মনে করিস্ না। আর মহারাজা আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কাণে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব?"

রমা বলিল, "যাহা যাহা হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি; তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার ত কোন দোষ নাই।"

নন্দা। তা বলিতে হইবে না—তোর যে কোন দোষ নাই, সে কথা আমায় বলিয়া কেন দুঃখ পাস্? তবে কি হইয়াছিল, তা আমাকে বলিস্ না বলিস্—

রমা। বলিব না কেন? আমি এ কথা সকলকেই বলিতে পারি।

এই বলিয়া রমা, চক্ষুর জল সামলাইয়া, উঠিয়া বসিয়া, সকল কথা যথার্থরূপে নন্দাকে বলিল। নন্দার সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নন্দা বলিল, "যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ কাজ করিতে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হইতে পায়? তা যাক্—যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য তিরস্কার করিয়া এখন আর কি হইবে? এখন যাহাতে আবার মানসম্ভ্রম বজায় হয়, তাই করিতে হইবে।"

রমা। যদি তা না কর দিদি, তবে তোমায় নিশ্চিত বলিতেছি, আমি জলে ডুবিয়া মরিব, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আমি ত রাজার মহিষী—এমন কাঙ্গাল গরিব, ভিখারীর মেয়ে কে আছে যে, অপবাদ হইলে আর প্রাণ রাখিতে চায়?

নন্দা। মরিতে হইবে না, দিদি! কিন্তু একটা খুব সাহসের কাজ করিতে পারিস্? বোধ হয়, তা হলে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

রমা। এমন কাজ নাই যে, এর জন্য আমি করিতে পারি না। কি করিতে হইবে?

নন্দা। তুমি যে রকম করিয়া আমার কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলে, এই রকম করিয়া তুমি যার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিবে, সেই তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত বিবেচনা হয়। যদি রাজধানীর লোক সকলে তোমার মুখে এ কথা শুনে, তবে আর এ কলঙ্ক থাকে না।

রমা। তা, কি প্রকারে হইবে?

নন্দা। আমি মহারাজকে বলিয়া দরবার করাইব। তিনি ঘোষণা দিয়া সমস্ত নগরবাসীকে সেই দরবারে উপস্থিত করিবেন; সেখানে গঙ্গারামের সাক্ষাৎকারে, সমস্ত নগরবাসীর সাক্ষাৎকারে, তুমি এই কথাগুলি বলিবে। আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না। এই সমস্ত নগরবাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।

রমা তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা কর, আমি জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব।"

নন্দা। পারিবি?

রমা। পারিব—নহিলে মরিব।

নন্দা। আচ্ছা, তবে আমি গিয়া মহারাজকে বলিয়া দরবারের বন্দোবস্ত করাই। তুই আর কাঁদিস্ না।

নন্দা উঠিয়া গেল। রমাও শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিয়া, পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল। এতক্ষণ তাহাও করে নাই।

নন্দা রাজাকে সংবাদ দিয়া অন্তঃপুরে আনাইল। যে কুরব উঠিয়াছে, সকলেই যাহা বলিতেছে, তাহা রাজাকে শুনাইল। তার পর রমার সঙ্গে নন্দার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সকলই অবিকল তাঁহাকে বলিল। তার পর বলিল, "আমরা দুই জনে গলায় কাপড় দিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া (বলিবার সময়ে নন্দা গলায় কাপড় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া,

দুই হাতে দুই পা চাপিয়া ধরিল) বলিতেছি যে, এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর, নহিলে আমরা দুই জনেই আত্মহত্যা করিয়া মরিব।”

সীতারাম বড় বিষণ্ণভাবে—কলঙ্কের জন্যও বটে, নন্দার প্রস্তাবের জন্যও বটে,—বলিলেন, “রাজার মহিষী—আমি কি প্রকারে দরবারে বাহির করিব? কি প্রকারে আপনার মহিষীকে সামান্যা কুলটার ন্যায় বিচারালয়ে খাড়া করিয়া দিব?”

নন্দা। তুমি যেমন বুঝিবে, আমরা কিন্তু তেমন বুঝিব না; কিন্তু সে বেশী লজ্জা, না রাজমহিষীর কুলটা অপবাদ বেশী লজ্জা?

সীতা। এরূপ মিথ্যা অপবাদ রাজার ঘরে, সীতা হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথামত কাজ করিতে হইলে এত কাণ্ড না করিয়া, সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়। তাহা হইলে আর কোন কথা থাকে না।

নন্দা। মহারাজ! নিরপরাধিনীকে ত্যাগ করিবে, তবু তার বিচার করিবে না? এই কি তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই কি, গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ?

সীতা। এই সমস্ত প্রজা, শত্রু মিত্র ইতর ভদ্র লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে আমার বুক কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? আমি পাষাণ নহি।

নন্দা। মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সামনে, শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?

সীতারাম নন্দার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, “তা হয়েছিল, নন্দা! আবার তেমন হইল না, সেই দুঃখই আমার বেশী।”

হটুটি মারিয়া পাটখেল খাইয়া, নন্দা যোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। যোড় হাত করিয়া, নন্দা জিতিয়া গেল। সীতারাম শেষে দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী। কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

বিষণ্ণভাবে রাজা, চন্দ্রচূড়ের নিকটে আসিয়া দরবারের কর্ত্তব্যতা নিবেদিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আবরু পরদার উপর তত্‌টা শ্রদ্ধা হইল না। তিনি সাধুবাদ করিয়া সম্মত হইলেন। তাঁর কেবল ভয়, রমা কথা কহিতে পারিবে না। সীতারামেরও সে ভয় ছিল। সে যদি না পারে, তবে সকল দিক্ যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন সীতারাম ঘোষণা করিলেন যে, আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে, সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল। দিল্লীর অনুকরণে সীতারামও এক "দরবারে আম" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজিকার দিন তাহা রাজকর্ম্মচারী-দিগের যত্নে সুসজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর মত তাহার রূপার চাঁদোবা, মতির ঝালর ছিল না; কিন্তু তথাপি চন্দ্রাতপ পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত, তাহাতে জরির কাজ। স্তম্ভ সকল সেইরূপ কারুকার্য্যখচিত, পট্টবস্ত্রে আবৃত। নানাচিত্রবর্ণরঞ্জিত কোমল গালিচায় সভামণ্ডপ শোভিত, তাহার চারি পার্শ্বে বিচিত্রপরিচ্ছদধারী সৈনিকগণ সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। বাহিরে অশ্বারূঢ় রক্ষিবর্গ শান্তি রক্ষা করিতেছে। সভামণ্ডপমধ্যে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপর সীতারামের জন্য স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, মুক্তাঝালরশোভিত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে দুর্গ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সভামণ্ডপমধ্যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই স্থান পাইল। নিম্ন শ্রেণীর লোকে সহস্রে সহস্রে সভামণ্ডপ পরিবেষ্টিত করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত?"

রমা। যদি আমার স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই।

রমা। তুমিও কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকে যাইতে হইবে না। কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড় চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও। এই বেলা প্রস্তুত হও।"

রমা স্বীকৃত হইয়া আপনার মহলে গেল। সেখানে ঘর রুদ্ধ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, "জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় জগদীশ্বর! আজিকার দিনে আমার

যাহা বলিবার, তাহা বলিয়া, আমি যদি তার পর জন্মের মত বোবা হই, তাহাও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন সভামধ্যে আপনার কথা বলিয়া, আর কখনও ইহ জন্মে কথা না কই, তাও তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন মুখ রাখিও। তার পর মরণে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।”

তার পর বেশ পরিবর্ত্তনের কথাটা মনে পড়িল। রমা ধাত্রীদিগের একখানা সামান্য বস্ত্র চাহিয়া লইয়া, তাই পরিয়া সভামণ্ডপে যাইতে প্রস্তুত হইল। নন্দা দেখিয়া বলিল, “এ কি এ?”

রমা বলিল, “আজ আমার সাজিবার দিন নয়। বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।”

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাকালে, মহারাজ সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল, কিন্তু গীত বাদ্য সে দিন নিষেধ ছিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম সম্মুখে আনীত হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে দণ্ডায়মান জনসমূহ বিচলিত ও উন্মুখ হইয়া উঠিল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদিগকে শান্ত করিল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর, তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।”

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, “কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।”

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন, আর যথাসাধ্য উত্তর দাও।

এই বলিয়া রাজা চন্দ্রচূড়কে অনুমতি করিলেন যে, "আপনি যাহা জানেন, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল যে, যে দিন মুসলমান, দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নদী পার হইতেছিল, সে দিন চন্দ্রচূড়ের পীড়াপীড়ি সত্বেও গঙ্গারাম দুর্গরক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রচূড়ের কথা সমাপ্ত হইলে, রাজা গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "নরাধম! ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম যুক্তকরে বলিল, "ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইনি যুদ্ধের কি জানেন? মুসলমান এ পারে আসেও নাই, দুর্গ আক্রমণও করে নাই। যদি তাহা করিত, আর আমি তাহাদের না হঠাইতাম, তবে ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য হইত। মহারাজ! দুর্গমধ্যে আমিও বাস করি। দুর্গের বিনাশে আমার কি লাভ?"

রাজা। কি লাভ, তাহা আর এক জনের নিকট শুন।

এই বলিয়া রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে আজ্ঞা করিলেন, "আপনি যাহা জানেন, তাহা বলুন।"

চাঁদশাহ তখন দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে তোরাব্ খাঁর নিকট গঙ্গারামের গমন-বৃত্তান্ত যাহা জানিতেন, তাহা বলিলেন। রাজা তখন গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম বলিল, "আমি সে রাত্রে তোরাব্ খাঁর নিকট গিয়াছিলাম বটে। বিশ্বাসঘাতক সাজিয়া, কুপথে আনিয়া, তাহাকে গড়ের নীচে আনিয়া টিপিয়া মারিব আমার এই অভিপ্রায় ছিল।"

রাজা। সে জন্য তোরাব্ খাঁর কাছে কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। নহিলে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে কেন?

রাজা। কি পুরস্কার চাহিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। অর্দ্ধেক রাজ্য।

রাজা। আর কিছু?

গঙ্গা। আর কিছু না।

তখন রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সে কথা কিছু জানেন?"

চাঁদশাহ। জানি।

রাজা। কি প্রকারে জানিলেন ?

চাঁদ। আমি মুসলমান ফকির, তোরাব্ খাঁর কাছে যাতায়াত করিতাম। তিনিও আমাকে বিশেষ আদর করিতেন। আমি কখন তাঁহার কথা মহারাজের কাছে বলিতাম না, অথবা মহারাজের কথা তাঁহার কাছে বলিতাম না। এজন্য কোন পক্ষ বলিয়া গণ্য নহি। এখন তিনি গত হইয়াছেন, এখন ভিন্ন কথা। যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হইয়া মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার দেখা হইয়াছিল। তখন গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এই বিবেচনায় তিনি আপনা হইতেই সে সকল কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কারস্বরূপ চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও কিছু চাহিয়াছিল। তবে সে কথা হুজুরে নিবেদন করিতে বড় ভয় পাই—অভয় ভিন্ন বলিতে পারি না।

রাজা। নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদ। দ্বিতীয় পুরস্কার মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।

দর্শকমণ্ডলী সমুদ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল —গঙ্গারামকে নানাবিধ গালি পাড়িতে লাগিল। শান্তিরক্ষকেরা শান্তি রক্ষা করিল। গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! এ অতি অসম্ভব কথা। আমার নিজের পরিবার আছে—মহারাজের অবিদিত নাই। আর আমি নগররক্ষক স্ত্রীলোকে আমার রুচি থাকিলে, আমার দুষ্প্রাপ্য বড় অল্প। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীকে কখনও দেখি নাই- কি জন্য তাঁহাকে কামনা করিব ?"

রাজা। তবে তুমি কুকুরের মত রাত্রে লুকাইয়া আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কেন ?

গঙ্গারাম। কখনও না।

তখন সেই পাঁড়েঠাকুর পাহারাওয়ালাকে তলব হইল। পাঁড়েঠাকুর, দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন যে, গঙ্গারাম প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে মুরলার সঙ্গে, তাহার ভাই পরিচয়ে, অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত।

শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! ইহা সম্ভব নহে। মুরলার ভাইকেই বা ঐ ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিবে কেন ?"

তখন পাঁড়েঠাকুর উত্তর করিলেন যে, তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনিতেন; তবে কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে ? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না।

গঙ্গারাম দেখিল, ক্রমে গতিক মন্দ হইয়া আসিল। এক ভরসা মনে এই উদয় হইল, মুরলা নিজে কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিবে না—কেন না, তাহা হইলে সেও দণ্ডনীয়—তার কি আপনার প্রাণের ভয় নাই? তখন গঙ্গারাম বলিল, "মুরলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক—কথা সকলই মিথ্যা প্রকাশ পাইবে।"

বেচারা জানিত না যে, মুরলাকে, মহারাজ্ঞী শ্রীমতী নন্দা ঠাকুরাণী পূর্ব্বেই হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দা, মুরলাকে বুঝাইয়াছিল যে, "মহারাজা স্ত্রীহত্যা করেন না—তোর মরিবার ভয় নাই। স্ত্রীলোককে শারীরিক কোন রকম সাজা দেন না। অতএব বড় সাজার তোর ভয় নাই। কিছু সাজা তোর হইবেই হইবে। তবে, তুই যদি সত্য কথা বলিস্—তোর সাজা বড় কম হবে।" মুরলাও তাহা বুঝিয়াছিল, স্থতরাং সব কথা ঠিক বলিল—কিছুই ছাড়িল না।

মুরলার কথা গঙ্গারামের মাথায় বজ্রাঘাতের মত পড়িল। তথাপি সে আশা ছাড়িল না। বলিল, "মহারাজ! এ স্ত্রীলোক অতি কুচরিত্রা। আমি নগরমধ্যে ইহাকে অনেক বার ধরিয়াছি, এবং কিছু শাসনও করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেই রাগে এ সকল কথা বলিতেছে।"

রাজা। তবে কার কথায় বিশ্বাস করিব, গঙ্গারাম? খোদ মহারাণীর কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

গঙ্গারাম যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রমা কখনও এ সভামধ্যে আসিবে না বা এ সভায় এ সকল কথা বলিতে পারিবে না। গঙ্গারাম বলিল, "অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর কথায় যদি আমি দোষী হই, আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।"

রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন গঙ্গারাম সবিস্ময়ে দেখিল, অতি ধীরে ধীরে সশঙ্কিত শিশুর মত, এক মলিনবেশধারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আসিতেছে। যে রূপ, গঙ্গারামের হাড়ে হাড়ে আঁকা, তাহা দেখিয়াই চিনিল। গঙ্গারাম বড় শঙ্কিত হইল। দর্শকমণ্ডলীমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদের থামাইল।

রমা আসিয়া আগে রাজাকে, পরে গুরু চন্দ্রচূড়কে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইল—মলিনবেশেও রূপরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় দেখিল, রাজা কথা কহিতে পারিতেছেন না—অধোবদনে আছেন। তখন চন্দ্রচূড় রমাকে বলিলেন, "মহারাণী! এই গঙ্গারামের বিচার হইতেছে। এ ব্যক্তি

কখন আপনার অন্তঃপুরে গিয়াছিল কি না, গিয়া থাকে, তবে কেন গিয়াছিল, আপনার সঙ্গে কি কি কথা হইয়াছিল, সব স্বরূপ বলুন। রাজার আজ্ঞা, আর আমি তোমার গুরু, আমারও আজ্ঞা, সকল কথা সত্য বলিবে।”

রমা গ্রীবা উন্নত করিয়া গুরুকে বলিল, “রাজার রাণীতে কখনও মিথ্যা বলে না। আমরা যদি মিথ্যাবাদিনী হইতাম, তবে এই সিংহাসন এতদিন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত।”

দর্শকমণ্ডলী বাহির হইতে জয়ধ্বনি দিল—“জয় মহারাণীজিকী!”

রমা সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, “বলিব কি গুরুদেব! আমি রাজার মহিষী—রাজার ভৃত্য, আমার ভৃত্য—আমি যে আজ্ঞা করিব—রাজার ভৃত্য তা কেন পালন করিবে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম—কোতোয়াল আসিয়া আজ্ঞা শুনিয়া গিয়াছিল—তার আর বিচারই বা কেন, আমি বলিবই বা কি?”

কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী এবার আর জয়ধ্বনি করিল না—অনেকে বিষণ্ণ হইল অনেকে বলিল, “কবুল।” চন্দ্রচূড় বলিলেন, “এমন কি রাজকার্য্য মা! যে, রাত্রিতে কোতোয়ালকে ডাকিতে হয়?”

রমা তখন বলিল, “তবে সকল কথা শুনুন।” এই বলিয়া রমা দেখিল, পুত্র কোথা? পুত্র সুসজ্জিত হইয়া ধাত্রীক্রোড়ে। মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। তখন রমা সবিশেষ বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, অতি দূরাগত সঙ্গীতের মত, রমা বলিতে লাগিল—সকলে শুনিতে পাইল না। বাহিরের দর্শকমণ্ডলী বলিতে লাগিল, “মা! আমরা শুনিতে পাইতেছি না—আমরা শুনিব।” রমা আরও একটু স্পষ্ট বলিতে লাগিল। ক্রমে আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট। তার পর যখন রমা পুত্রের বিপদ্ শঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল—যখন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল—তখন পরিষ্কার স্বর্গীয়, অপ্সরোনিন্দিত তিন গ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃগণের কর্ণে সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তার পর সহসা রমা, ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, যুক্তকরে বলিতে লাগিল, “মহারাজ! আপনার আরও সন্তান আছে—আমার আর নাই। মহারাজ! আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ

আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই—মহারাজ! অপরাধিনী হইয়া থাকি, তবে দণ্ড করুন—” শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী অশ্রুপূর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু লোক ভাল মন্দ দুই রকমই আছে—অনেকেই জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—কিন্তু আবার অনেকেই তাহাতে যোগ দিল না। জয়ধ্বনি ফুরাইলে তাহারা কেহ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, “আমার ত এ কথায় বিশ্বাস হয় না।” কোন বর্ষীয়সী বলিল, “পোড়া কপাল! রাত্রে মানুষ ডাকিয়া নিয়া গিয়াছেন—উনি আবার সতী!” কেহ বলিল, “রাজা এ কথায় ভুলেন ভুলুন—আমরা এ কথায় ভুলিব না।” কেহ বলিল, “রাণী হইয়া যদি উনি এই কাজ করিবেন, তবে আমরা গরিব দুঃখী কি না করিব?”

এ সকল কথা সীতারামের কাণে গেল। তখন রাজা রমাকে বলিলেন, “প্রজাবর্গ সকলে ত তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।”

রমা কিছুক্ষণ মুখ অবনত করিয়া রহিল। চক্ষুতে প্রবল বারিধারা বহিল—তার পর দমা সামলাইল। তখন মুখ তুলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “যখন লোকের বিশ্বাস হইল না, তখন আমার এক মাত্র গতি—আপনার রাজপুরীর কলঙ্কস্বরূপ এ জীবন আর রাখিতে পারিব না। আপনি চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিন—আমি সকলের সম্মুখেই পুড়িয়া মরি। দুঃখ তাহাতে কিছু নাই। লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিল—মরিলেই সে দুঃখ গেল। কিন্তু এক নিবেদন মহারাজ! আপনিও কি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন? তাহা হইলে বুঝি—(আবার রমার চক্ষুতে জলের ধারা ছুটিল,)—বুঝি আমার পুড়িয়া মরাও বৃথা হইবে। তুমি যদি এই লোক-সমারোহের সম্মুখে বল যে, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নাই—তাহা হইলে আমি সেই চিতাই স্বর্গ মনে করিব। মহারাজ! পরলোকের উদ্ধারকর্ত্তা, ভূদেব তুল্য আমার গুরুদেব এই সম্মুখে। আমি তাঁহার সম্মুখে, ইষ্টদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতার অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতিদেবতা, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে—আমি পতিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। মহারাজ! এই নারীদেহ ধারণ করিয়া যে কিছু দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দান ব্রত নিয়ম করিয়াছি, যদি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া থাকি, তবে সে সকলেরই ফলে যেন বঞ্চিত হই। পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই, কায়মনোবাক্যে আমি যে আপনার চরণসেবা করিয়াছি, তাহা আপনিই জানেন, আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সে পুণ্যফলে বঞ্চিত হই। আমি

ইহজীবনে যে কিছু আশা, যে কিছু ভরসা, যে কিছু কামনা, যে কিছু মানস করিয়াছি,---আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, সকলই যেন নিষ্ফল হয়। মহারাজ! নারীজন্মে স্বামিসন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই, সুখও নাই---যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, যেন ইহজন্মে আমি সে সুখে চিরবঞ্চিত হই। যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি---যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই---যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, আমি যেন সেই পুত্রমুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই। মহারাজ! আর কি বলিব---যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামিপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।"

রমা আর বলিতে পারিল না---ছিন্ন লতার মত সভাতলে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইল---ধাত্রীগণে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে বহিয়া লইয়া গেল। ধাত্রীক্রোড়স্থ শিশু মার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল; সভাতলস্থ সকলে অশ্রুমোচন করিল। গঙ্গারামের করচরণস্থিত শৃঙ্খলে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। দর্শকমণ্ডলী বাত্যাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া মহান্ কোলাহল সমুত্থিত করিল---রক্ষিবর্গ কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না।

তখন "গঙ্গারাম কি বলে?" "গঙ্গারাম কি এ কথা মিছা বলে?" "গঙ্গারাম যদি মিছা বলে, তবে আইস, আমরা সকলে মিলিয়া গঙ্গারামকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি।" এইরূপ রব চারি দিক্ হইতে উঠিতে লাগিল। গঙ্গারাম দেখিল, এই সময়ে লোকের মন ফিরাইতে না পারিলে, তাহার আর রক্ষা নাই। গঙ্গারাম বুদ্ধিমান্, বুঝিয়াছিল যে, প্রজাবর্গ যেমন নিষ্পত্তি করিবে, রাজাও সেই মত করিবেন। তখন সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া লোকের মনভুলান কথা বলিতে আরম্ভ করিল, "মহারাজ! কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন---না আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? প্রভু! আপনার এই রাজ্য কি স্ত্রীলোকে সংস্থাপিত করিয়াছে---না আমার ন্যায় রাজভৃত্যদিগের বাহুবলে স্থাপিত হইয়াছে? মহারাজ! সকল স্ত্রীলোকেই বিপথগামিনী হইতে পারে, রাজরাণীরাও বিপথগামিনী হইয়া থাকেন; রাজরাণী বিপথগামিনী হইলে রাজার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাসী ভৃত্য কখনও বিপথগামী হয় না; তবে স্ত্রীলোকে আপনার দোষ ক্ষালন জন্য ভৃত্যের ঘাড়ে চাপ দিতে পারে। এই মহারাণী রাত্রিতে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দোষী করিতেছেন, তাহার স্থিরতা---মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম কথা সমাপ্ত না করিয়া,---অতিশয় ভীত হইয়া, "মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!" এই শব্দ করিয়া স্তম্ভিত বিহ্বলের মত হইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল, গঙ্গারাম থর থর কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত

জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে সভয়ে চাহিয়া দেখিল—অপূর্ব্বমূর্ত্তি! জটাজূটবিলম্বিনী, গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী দুর্গা তুল্য, ত্রিশূল হস্তে, গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র সেই সাগরবৎ সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী একেবারে নিস্তব্ধ হইল। গঙ্গারাম এক দিন রাত্রিতে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল—আবার এই বিপৎকালে, যখন মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা নিরপরাধিনী রমার সর্ব্বনাশ করিতে সে উদ্যত, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, চণ্ডী তাহাকে বধ করিতে আসিতেছেন বিবেচনা করিয়া, ভয়ে কাতর হইয়া "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" শব্দ করিয়া উঠিল। এ দিকে রাজা, ও দিকে চন্দ্রচূড়, সেই রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন, এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই গাত্রোত্থান করিল।

জয়ন্তী কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া, গঙ্গারামের বক্ষে সেই মন্ত্রপূত ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, "এখন বল।"

ত্রিশূল গঙ্গারামের গাত্র স্পর্শ করিল মাত্র, তথাপি গঙ্গারামের শরীর হঠাৎ অবসন্ন হইয়া আসিল, গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা কথা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম তখন সভয়ে, বিনীতভাবে, সত্য বৃত্তান্ত সভাসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্ত হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। গঙ্গারাম তখন রমার নির্দ্দোষিতা, আপনার মোহ, লোভ, ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ, কথোপকথন এবং বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সমুদায় সবিস্তারে কহিল।

জয়ন্তী তখন ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। গমনকালে সভাস্থ সকলেই নতশিরে সেই দেবীতুল্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না। সে কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ সন্ধান করিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে রাজা, গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল। বধদণ্ডের আজ্ঞা শুনিয়া সকল লোক স্তম্ভিত হইয়াছিল। কেহ কিছু বলিল না। নীরবে সকলে আপনার

ঘরে ফিরিয়া গেল। গৃহে গিয়া সকলেই রমাকে "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী" বলিয়া প্রশংসা করিল রমার আর কোন কলঙ্ক রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে হুকুম তখনই তামিল হইল। মুরলার নির্গমনকালে একপাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিনকতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না, সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত। সীতারাম নিজ বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা হওয়া উচিত। চন্দ্রচূড় ঠাকুর এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, সীতারাম তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এরূপ একটা মহোৎসবের দ্বারা প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট হইলে তাহাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। অতএব বিশেষ সমারোহের সহিত অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার কল্পনা হইতেছিল। নন্দা এবং চন্দ্রচূড় উভয়েই এক্ষণে সীতারামকে অনুরোধ করিলেন যে, এখন একটা মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্ম্মটা করা বিধেয় নহে ; তাহাতে অমঙ্গলও যদি না হয়, লোকের আনন্দেরও লাঘব হইতে পারে। এ কথায় রাজা সম্মত হইলেন। ভিতরের আসল কথা এই যে, গঙ্গারামকে শূলে দিতে সীতারামের আন্তরিক ইচ্ছা নহে, তবে রাজধর্ম্ম পালন এবং রাজ্য শাসন জন্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল না, তাহার কারণ—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। শ্রীকে সীতারাম ভুলেন নাই, তবে এতদিন ধরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া বিষয়কর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিয়া শ্রীকে ভুলিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। অতএব আবার রাজ্যের উপর তিনি মন স্থির করিতেছিলেন। সেই জন্যই দিল্লীতে গিয়া, বাদশাহের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। এবং বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া সনন্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য উৎসাহ সহকারে সংগ্রাম করিয়া ভূষণা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় এক্ষণে একাধিপত্য

প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রী এখনও হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারিণী। অতএব গঙ্গারামের শূলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল।

এ দিকে অভিষেকের বড় ধূম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ—অত্যন্ত গোলযোগ। দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল—রাজা, রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, দৈবজ্ঞ, ইতর, ভদ্র, আহূত, অনাহূত, রবাহূত, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, সাধু, অসাধুতে নগরে আর স্থান হয় না। এই অসংখ্য জনমণ্ডলের কর্ম্মের মধ্যে প্রতিনিয়ত আহার। ভক্ষ্য ভোজ্য লুচি সন্দেশ দধির ছড়াছড়িতে সহরে এক হাঁটু কাদা হইয়া উঠিল, পাতা কাটার জ্বালায় সীতারামের রাজ্যের সব কলাগাছ নিষ্পত্র হইল, ভাঙ্গা ভাঁড় ও ছেঁড়া কলাপাতে গড়খাই ও মধুমতী বুজিয়া উঠিবার গোছ হইয়া উঠিল। অহরহ বাদ্য ও নৃত্য গীতের দৌরাত্ম্যে ছেলেদের পর্য্যন্ত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

এই অভিষেকের মধ্যে একটা ব্যাপার দান। সীতারাম অভিষেকের দিনে সমস্ত দিবস কখনও স্বহস্তে, কখনও আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে ভৃত্যহস্তে, সুবর্ণ, রজত, তৈজস, এবং বস্ত্রদান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিয়াছিল যে, সমস্ত দিনে দান ফুরাইল না। অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে, অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন যে, সেই ত্রিশূলধারিণী সুবর্ণময়ী রাজলক্ষ্মীমূর্ত্তি।

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।"

রাজা। মা! কেন আমায় ছলনা করেন? আপনি দেবী, আমি চিনিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ কমলা—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আমি সামান্য মানুষী। নহিলে আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিতাম না। শুনিলাম, আজ যে যাহা চাহিতেছে, আপনি তাহাকে তাই দিতেছেন। আমার আশা বড়, কিন্তু যার এমন দান, তার কাছে আশা নিষ্ফলা হইবে না মনে করিয়া আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, "মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি একবার আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, দ্বিতীয় বারে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, আপনি

দেবীই হউন, আর মানবীই হউন—আপনাকে সকলই আমার দেয়। কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি এখনই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।”

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

রাজা। আপনি!

জয়ন্তী। কেন মহারাজ? অসম্ভাবনা কি?

রাজা। গঙ্গারাম কীটাণুকীট—আপনার তার প্রতি দয়া কিসে হইল?

জয়ন্তী। আমরা ভিখারী—আমাদের কাছে সবাই সমান।

রাজা। কিন্তু আপনিই ত তাহাকে ত্রিশূল বিঁধিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন—আপনা হইতেই দুইবার তাহার অসদভিসন্ধি ধরা পড়িয়াছে। বলিতে কি, আপনি মহারাণীর প্রতি দয়াবতী না হইলে সে সত্য স্বীকার করিত না, তাহার বধদণ্ড হইত না। এখন তাহার অন্যথা করিতে চান কেন?

জয়ন্তী। মহারাজ! আমা হইতে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি। ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য ত্রিশূলাঘাতে অধর্ম্মাচারীর প্রাণবিনাশেও দোষ বিবেচনা করি না, কিন্তু ধর্ম্মের এখন রক্ষা হইয়াছে, এখন প্রাণিহত্যা-পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

রাজা। আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। গঙ্গারাম এখনই মুক্ত হইবে। কিন্তু মা! তোমাকে ভিক্ষা দিই, আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি তোমায় ভিক্ষা দিব না। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচিব—মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

জয়ন্তী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কি মূল্য মহারাজ! রাজভাণ্ডারে এমন কোন ধনের অভাব যে, ভিখারিণী তাহা দিতে পারিবে?

রাজা। রাজভাণ্ডারে নাই—রাজার জীবন। আপনি সেই মধুমতীতীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি যাহা খুঁজি, তাহা পাইব। সে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিন—সেই মূল্যে আজ গঙ্গারামের জীবন আপনার নিকট বেচিব।

জয়ন্তী। কি সে অমূল্য সামগ্রী মহারাজ? আপনি রাজ্য পাইয়াছেন।

রাজা। যাহার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিতে পারি, তাই চাহিতেছি।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ ?

রাজা। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, সব দিতে পারেন। আমার জীবন আমায় দিয়া, সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনিয়া লউন।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ! আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাজাধিরাজের জীবনের সঙ্গে সেই নরাধম পাপাত্মার জীবনের কি বিনিময় হয় ? মহারাজ! কাণা কড়ির বিনিময়ে রত্নাকর ?

রাজা। মা! জননী যত দেন, ছেলে কি মাকে কখনও তত দিতে পারে!

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুর দ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন; আর অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হৌক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচরবর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচরদিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি ?

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র, বায়ুশূন্য কারাগৃহমধ্যে, গঙ্গারাম শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথকালেও তাহার নিদ্রা নাই—যে পর্য্যন্ত সে শুনিয়াছে যে, তাহাকে শূলে যাইতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত আর সে ঘুমায় নাই—আহার নিদ্রা সকলই বন্ধ। এক দণ্ডে মরা যায়, মৃত্যু তত বড় কঠিন দণ্ড নহে; কিন্তু কারাগৃহে একাকী পড়িয়া দিবারাত্র সম্মুখেই মৃত্যুদণ্ড, ইতি ভাবনা করার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কিছুই নাই। গঙ্গারাম পলকে পলকে শূলে যাইতেছিল। দণ্ডের আর তাহার কিছু অধিক বাকি নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া, চিত্তবৃত্তি সকল প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মন অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছিল—ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়াছিল। মনের মধ্যে কেবল দুটি

ভাব এখনও জাগরিত ছিল—ভৈরবীকে ভয়, আর রমার উপর রাগ। ভয়ের অপেক্ষা, এই রাগই প্রবল। গঙ্গারাম, আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এখন রমার তেমন আন্তরিক শক্র আর কেহ নহে।

গঙ্গারাম এখন রমাকে সম্মুখে পাইলে নখে বিদীর্ণ করিতে প্রস্তুত। গঙ্গারামের যখন কিছু চিন্তাশক্তি হইল, তখন কি উপায়ে মরিবার সময়ে রমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিতে পারিবে, গঙ্গারাম তাহাই ভাবিতেছিল। শূলতলে দাঁড়াইয়া রমার সম্বন্ধে কি অশ্লীল অপবাদ দিয়া যাইবে, গঙ্গারাম তাহাই কখন কখন ভাবিত। অন্য সময়ে জড়পিণ্ডের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে বাহিরে অভিষেকের উৎসবের মহৎ কোলাহল শুনিত। যে পাচক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহার নুন ভাত লইয়া আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গারাম উৎসবের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল। শুনিল যে, রাজ্যের সমস্ত লোক অতি বৃহৎ উৎসবে নিমগ্ন—কেবল সেই একা অন্ধকারে আর্দ্র ভূমিতে মূষিকদষ্ট হইয়া, কীটপতঙ্গপীড়িত হইয়া, শৃঙ্খলভার বহন করিতেছে। মনে মনে বলিতে লাগিল, রমার কবে এই রকম স্থান মিলিবে!

যেমন অন্ধকারে বিদ্যুৎ জ্বলে, তেমনি গঙ্গারামের একটা কথা মনে পড়িত, যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত! শ্রী একবার প্রাণভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, আবার ভিক্ষা চাহিলে কি ভিক্ষা পাইত না! আমি যত পাপী হই না কেন, শ্রী কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিত না। এমন ভগিনীও মরিল!

দুই প্রহর রাত্রিতে ঝঞ্চনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রিতে কেন শিকল খুলিতেছে! আরও কিছু নূতন বিপদ আছে, না কি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার পর জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! কি করিয়াছ তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?"

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি।

পলাও গঙ্গারাম! কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।

গঙ্গারাম বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ। বিশ্বাস করিল না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু দেখিল যে, রাজপুরুষেরা বেড়ী খুলিতে লাগিল। গঙ্গারাম নীরবে দেখিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা! রক্ষা করিলে কি?"

জয়ন্তী বলিলেন, "বেড়ী খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞা মত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা কেমন আছে?"

রমার পীড়া। সে কথা পরে বলিব। নন্দা উত্তর করিল, "কই—কিছু বিশেষ হইতে ত দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি; তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও; আর আমি যে জন্য যাইতে পারিলাম না, তাহাও বলিও।

কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইল। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন—সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ড-প্রণেতা হইয়া, শ্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।

নন্দা বুঝিল, প্রভু আজ একা থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। নন্দা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীতারাম সমস্ত দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যান্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ছিলেন। অন্য দিন হইলে পড়িতেন আর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। কিন্তু আজ স্বতন্ত্র কথা—যাহার জন্য রাজ্যসুখ বা রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া এতকাল ধরিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, যাহার চিন্তা অগ্নিস্বরূপ দিবারাত্র হৃদয় দাহ করিতেছিল, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে। সীতারাম জাগিয়া রহিলেন।

কিন্তু নিদ্রাদেবীও ভুবন-বিজয়িনী। যে যতই বিপদাপন্ন হউক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে তাহারও নিদ্রা আসে। সীতারাম বিপদাপন্ন নহেন, সুখের আশায় নিমগ্ন, সীতারামের একবার তন্দ্রা আসিল। কিন্তু মনের ততটা চাঞ্চল্য থাকিলে তন্দ্রাও বেশী ক্ষণ থাকে না। ক্ষণকাল মধ্যেই সীতারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল—চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্ত-কুন্তলা কমনীয়া মূর্ত্তি!

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই? শ্রী কই?" কিন্তু তখনই দেখিলেন, জয়ন্তী নহে, শ্রী।

তখন চিনিয়া, "শ্রী! শ্রী! ও শ্রী! আমার শ্রী!" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষু বুজিয়া রাজা আবার শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনিই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

তখন সীতারাম, উর্দ্ধমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্তদৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই—যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথার স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে—যেন তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না- একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমার শ্রী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন যে, স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিতধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রুবিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, মহামহিমাময়ী, এ যে দেবী প্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে!

হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথাও কতক কতক বলিল, সকল বলিল না।

তার পর, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের নয়নে জল আসিল। চিরজীবনের পর স্বামীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি না, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে?" সীতারামের মনে হইল, উত্তর করেন, "কড়িকাঠে দড়ি ঝুলাইয়া দিবে, আমি গলায় দিব।"

তাহা না বলিয়া সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন?

শ্রী। যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।

সীতারাম। সে কি? কেন গিয়াছে? কিসে গিয়াছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী; সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতারাম। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে; দেবসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। সর্ব্ব কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; তুমিও পার নাই। গঙ্গারামের জীবন রক্ষা করিয়া কি তুমি কর্ম্ম করিলে না? আমাকে দেখা দিয়া তুমি কি কর্ম্ম করিলে না?

শ্রী। করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, একবার ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া এখন চিরকাল ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে বল?

সীতা। স্বামিসহবাস স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ, এমন কুশিক্ষা তোমায় কে দিল? যেই দিক, ইহার উপায় আমার হাতে আছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সেই অধিকার বলে, আমি তোমাকে আর যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা। তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে আমি যাইতে পারিব না।

সীতা। আমি স্বামী, আমি রাজা, আর আমি উপকারী, তাই আমি যাইতে না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না। বলিতেছ না কেন, আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমি ছাড়িয়া না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না? স্নেহের সোণার শিকল কাটিবে কি প্রকারে?

শ্রী। মহারাজ! সে ভ্রমটা এখন গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, যে ভালবাসে, ভালবাসায় তাহার ধর্ম্ম এবং সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তাহার তাতে কি? তুমি মাটির ঠাকুর গড়িয়া, তাহাকে পুষ্পচন্দন দাও, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম আছে, সুখও আছে, কিন্তু তাহাতে মাটির পুতুলের কি?

সীতা। কি ভয়ানক কথা!

শ্রী। ভয়ানক নহে—অমৃতময় কথা। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভাল বাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ দুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। ও সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। ভাল যা, তা বলিতেছি, শুন। আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম; তোমার ধর্ম্মান্তর নাই। আমি রাজা, সকলেরই ধর্ম্মরক্ষা আমার কর্ম্ম; এবং স্বামীরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে যাইতে দিব না।

শ্রী। তা বলিয়াছি, তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কেবল আমার এইটুকু বলিয়া রাখা যে, আমা হইতে তুমি সুখী হইবে না।

সীতা। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হইব।

শ্রী। আর এক ভিক্ষা এই, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে আমাকে এই রাজপুরীমধ্যে স্থান না দিয়া, আমাকে একটু পৃথক্ কুটীর তৈয়ার করিয়া দিবেন। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আমিও সুখী হইব না, লোকেও আপনাকে উপহাস করিবে।

সীতা। আর কুটীরে রাজমহিষীকে রাখিলে লোকে উপহাস করিবে না কি?

শ্রী। রাজমহিষী বলিয়া কেহ নাই জানিল।

সীতা। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না কি?

শ্রী। সে আপনার অভিরুচি।

সীতা। তোমার সঙ্গে আমি দেখা শুনা করিব, অথচ তুমি রাজমহিষী নও, লোকে তোমাকে কি বলিবে জান?

শ্রী। জানি বৈ কি! লোকে আমাকে রাজার উপপত্নী বিবেচনা করিবে। মহারাজ! আমি সন্ন্যাসিনী আমার মান অপমান কিছুই নাই। বলে বলুক না। আমার মান অপমান আপনারই হাতে।

সী। সে কি রকম?

শ্রী। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখনও বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণীসহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়-বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব। যতদিন আমি এ গেরুয়া না ছাড়িব, ততদিন মহারাজ! তোমাকে পৃথক্ আসনে বসিতে হইবে।

সী। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে, কেন না, তুমি বলবান্। কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক প্রকার বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘটিতে পারে যে, তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। মন কিছুতেই বুঝিল না। যাহার ভালবাসার জিনিষ মরিয়া যায়, সেও মৃত দেহের কাছে বসিয়া থাকে, কিছু ক্ষণ বিশ্বাস করে না যে, আর নিশ্বাস নাই। পাগল লিয়রের মত দর্পণ খুঁজিয়া বেড়ায়, দর্পণে নিশ্বাসের দাগ ধরে কি না। সীতারাম এত বৎসর ধরিয়া, মনোমধ্যে একটা শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়া, তাহার আরাধনা করিয়াছিল। বাহিরে শ্রী যাই হৌক, ভিতরের শ্রী তেমনিই আছে। বাহিরের শ্রীকেই ত সীতারাম হৃদয়ে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাহিরের শ্রী ত বাহিরেই আছে, তবে সে হৃদয়ের শ্রী হইতে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন বলিয়া সীতারাম বারেক মাত্রও ভাবিতে পারিলেন না। লোকের বিশ্বাস আর সব যাই হৌক, লোকে মনে করে, মানুষ যা তাই থাকে। মানুষ যে কত বার মরে, তাহা আমরা বুঝি না। এক দেহেই কত বার যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না! সীতারাম বুঝিল না যে, সে শ্রী মরিয়াছে, আর একটা শ্রী সেই দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে করিল যে, আমার শ্রী আমার শ্রীই আছে। তাই শ্রীর চড়া চড়া কথাগুলা কাণে তুলিল না। তুলিবারও বড় শক্তি ছিল না। শ্রীকে ছাড়িলে সব ছাড়িতে হয়।

তা, শ্রী কিছুতেই রাজপুরীমধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষময় ফল ফলিল।

আলাপটা কি রকম হইল মনে কর? রাজা বলিতেন ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এত দিন যে দুঃখ পাইয়াছেন তাহার কথা, শ্রী ভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছুই নাই, সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী, ফল মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারীর কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্মের কথা, কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক্ আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ্ হইল! কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে, সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার

ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে ;—শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল ; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয় সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ,—শ্রীর তেমনিই স্বাস্থ্য ;—শরীর সম্পূর্ণ, সেই জন্য শ্রী প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী শোভা। তার পর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময় এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়! তাহার পর সেই মনোমোহিনী কথা—নানা দেশের, নানা বিষয়ের, নানাবিধ অশ্রুত-পূর্ব্ব কথা, কখনও কৌতূহলের উদ্দীপক, কখনও মনোরঞ্জন, কখনও জ্ঞানগর্ভ—এই দুই মোহ একত্রে মিশিলে কোন্ অসিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে? সীতারামের অনেক দিন যে আগুন জ্বলিয়াছিল, এখন ঘর পুড়িতে লাগিল। শ্রী হইতে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তার পর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক্ আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার, এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে ; শ্রীর বাঘছালের নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না। যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া, বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীটপতঙ্গও প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ, দুই জন নিরীহ গৃহস্থ লোক, মহম্মদপুরে বাস করে। রামচাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, প্রদোষকালে, নিভৃতে তামাকুর সাহায্যে দুই জন কথোপকথন করিতেছিল। কিয়দংশ পাঠককে শুনিতে হইবে।

রামচাঁদ। ভাল, ভায়া, বলিতে পার, চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি?

শ্যামচাঁদ। কি জান, দাদা, ও সব রাজা রাজড়ার হয়েই থাকে। আমাদের গৃহস্থ ঘরে কারই বা ছাড়া—তার আর রাজা রাজড়ার কথায় কাজ কি? তবে আমাদের মহারাজাকে ভাল বল্‌তে হবে—মাত্রায় বড় কম। মোটে এই এ একটি।

রাম। হাঁ, তা ত বটেই। তবে কি জান, আমাদের মহারাজা না কি সে রকম নয়, পরম ধার্ম্মিক, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করি। বলি, এত কাল ত এ সব ছিল না।

শ্যাম। রাজাও আর সে রকম নাই, লোকে ত বলে। কি জান, মানুষ চিরকাল এক রকম থাকে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ বাড়িলে, মনটাও কিছু এ দিক্ ও দিক্ হয়। আগে আমরা রামরাজ্যে বাস করিতাম—ভূষণা দখল হ'য়ে অবধি কি আর তাই আছে?

রাম। তা বটে। তা আমার যেন বোধ হয় যে, চিত্তবিশ্রামের কাণ্ডটা হ'য়ে অবধিই যেন বাড়াবাড়ি ঘটেছে। তা মহারাজকে এমন বশ করাও সহজ ব্যাপার নয়। মাগীও ত সামান্যা নয়—কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিল?

শ্যাম। শুনেছি, সেটা না কি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী বেশ ধ'রে বেড়ায়। আবার কেউ বলে, তার একটা জোড়া আছে, সেটা উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাকে বড় কেউ দেখিতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্ব্বনাশ! রাজা পড়িল ডাকিনীর হাতে। এ রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে?

শ্যাম। গতিকে ত বোধ হয় না। রাজা ত আর কাজ কর্ম্ম দেখেন না। যা করেন চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার ঠাকুর। তা তিনি লড়াই ঝকড়ার কি জানেন! এ দিকে না কি নবাবি ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে, মৃণ্ময় আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ! যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। এই ত দেখ্‌লে, গঙ্গারাম দাস কি কর্‌লে? আবার কে জানে, মৃণ্ময় বা কি করবে? সে যদি মুসলমানের সঙ্গে মিশে যায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? গোষ্ঠী শুদ্ধ জবাই হব দেখতে পাচ্চি।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে! সে দিন তিলক ঘোষেরা উঠে যশোর গেল, তখন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কেন যাও? বলে, এখানে জিনিসপত্র মাগ্‌গি। এখনই ত আরও কয় ঘর আমাদের পাড়া থেকে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। তা দাদা, তোমার কাছে বলচি, প্রকাশ করিও না, আমিও শিগ্‌গির সরবো।

রামচাঁদ। বটে! ত আমিই পড়ে জবাই হই কেন? তবে কি জান, এই সব বাড়ী ঘর দ্বার খরচ পত্র করে করা গেছে, এখন ফেলে ঝেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড় দায়।

শ্যাম। তা কি করবে, প্রাণটা আগে, না বাড়ী ঘর আগে? ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘর দ্বার ত পালাবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!

শ্রী। ছি! ছি! মহারাজ! এই জন্য কি হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার কাছে হিন্দুসাম্রাজ্য খাটো হইয়া গেল, ধর্ম্ম গেল, আমিই সব হইলাম! এই কি রাজা সীতারাম রায়?

সীতা। রাজ্য ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রী। টিকিবে কি ?

সীতা। ভাঙ্গে কার সাধ্য ?

শ্রী। তুমিই ভাঙ্গিতেছ। রাজার রাজ্য, আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

সীতা। কৈ, অরক্ষাও ত হইতেছে না।

শ্রী। তুমি কি রাজ্য রক্ষা কর ? তোমাকে ত আমার কাছেই দেখি।

সীতা। আমি রাজকর্ম্ম না দেখি, তা নয়। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। আমি এক দণ্ড দেখিলে যা হইবে, অন্যের সমস্ত দিনে তত হইবে না। তা ছাড়া, তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃণ্ময় আছে, তাঁহারা সকল কর্ম্মে পটু। তাঁহারা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। একবার ত তাঁহারা থাকিতে রাজ্য যাইতেছিল। দৈবাৎ তুমি সে রাত্রে না পৌঁছিলে, রাজ্য থাকিত না। আবার কেন কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছ ?

সীতা। আমি ত আছি। কোথাও যাই নাই। আবার বিপদ্ পড়ে, রক্ষা করিব।

শ্রী। যতক্ষণ এই বিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ তুমি কোন যত্নই করিবে না। যত্ন ভিন্ন কোন কাজই সফল হয় না।

সী। যত্নের ত্রুটি কি দেখিলে ?

শ্রী। আমি স্ত্রীজাতি, সন্ন্যাসী, আমি রাজকার্য্য কি বুঝি যে, সে কথার উত্তর দিতে পারি ! তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুরশিদাবাদের সংবাদ পাইতেছেন কি ? তোরাব্ খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভুঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে ?

সী। সে ভাবনা করিও না। মুরশিদ কুলি যতক্ষণ মাল খাজনা ঠিক কিস্তী কিস্তী পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি ?

সী। হাঁ, পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচ পত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি ?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া কিছু ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "সে কি করিবে, কি করিতেছে, তাহার কিছু সংবাদ পাই নাই।"

শ্রী। মহারাজ ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সংবাদ লইতে ভুলিয়া গিয়াছ ?

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তাই। শ্রী! তোমার মুখ দেখিলে আমি সব ভুলিয়া যাই।"

শ্রী। তবে, আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ, আবার লুকাইতে হইবে। নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; ধর্ম্মরাজ্য ছারে খারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

সীতা। যা হয় হোক, আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। হয় তোমায় ছাড়িতে হইবে, নয় রাজ্য ছাড়িতে হইবে। আমি রাজ্য ছাড়িব, তোমায় ছাড়িব না।

শ্রী। তবে তাহাই করুন। রাজ্য কোন উপযুক্ত লোকের হাতে দিন। তার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে বনে চলুন।

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজার এখন ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবলা। আগে হইলে সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন। এখন সে সীতারাম নাই; রাজ্যভোগে সীতারামের চিত্ত সমল হইয়াছে। সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই যে সভাতলে রমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, সেই অবধি রমা আর উঠে নাই। প্রাণপণ করিয়া আপনার সতী নাম রক্ষা করিয়াছিল। মান রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ বুঝি গেল।

এখন রোগ পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু গোড়া থেকে বলি। রাজার রাণীর চিকিৎসার অভাব হয় নাই। প্রথম হইতেই কবিরাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। অনেকগুলা কবিরাজ রাজবাড়ীতে চাকরী করে, তৎ কর্ম্ম নাই, সচরাচর ভৃত্যবর্গকে মসলা খাওয়াইয়া, এবং পরিচারিকাকে পোষ্টাই দিয়া কালাতিপাত করে; এক্ষণে ছোট রাণীকে রোগী পাইয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হঠাৎ বড় লোক হইয়া বসিলেন, তখন রোগনির্ণয় লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছা, বায়ু, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ ইত্যাদি নানাবিধ রোগের লক্ষণ শুনিতে শুনিতে রাজপুরুষেরা জ্বালাতন হইয়া উঠিল। কেহ নিদানের দোহাই দেন, কেহ বাগ্‌ভটের, কেহ চরকসংহিতার বচন আওড়ান, কেহ সুশ্রুতের টীকা ঝাড়েন। রোগ অনির্ণীত রহিল।

কবিরাজ মহাশয়েরা, কেবল বচন ঝাড়িয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নিন্দা আমরা করি না। তাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বটিকা, কেহ গুঁড়া, কেহ ঘৃত, কেহ তৈল; কেহ বলিলেন, ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, কেহ বলিলেন, আমার কাছে যাহা প্রস্তুত আছে, তেমন আর হইবে না। যাই হউক, রাজার বাড়ী, রাণীর রোগ, ঔষধের প্রয়োজন থাক, না থাক, নূতন প্রস্তুত হইবে না, এমন হইতে পারে না। হইলে দশ জনে দুটাকা দুসিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, অতএব ঔষধ প্রস্তুতের ধূম পড়িয়া গেল। কোথাও হামানদিস্তায় মূল পিষ্ট হইতেছে, কোথাও ঢেঁকিতে ছাল কুটিতেছে, কোথাও হাঁড়িতে কিছু সিদ্ধ হইতেছে, কোথাও খলিতে তৈলে মূর্চ্ছনা পড়িতেছে। রাজবাড়ীর এক জন পরিচারিকা এক দিন দেখিয়া বলিল, "রাণী হইয়া রোগ হয়, সেও ভাল।"

যার জন্য ঔষধের এত ধূম, তার সঙ্গে ঔষধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বড় অল্প। কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধ যোগাইতেন না, তা নয়। সে গুণে তাঁহাদের কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না। তবে রমার দোষে সে যত্ন বৃথা হইল—রমা ঔষধ খাইত না। মুরলার বদলে, যমুনা নাম্নী এক জন পরিচারিকা, রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল। যমুনাকে একটু প্রাচীন দেখিয়া নন্দা তাহাকে এই পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। আমরা এমন বলিতে পারি না যে, যমুনা আপনাকে প্রাচীনা বলিয়া স্বীকার করিত; শুনিয়াছি, কোন ভৃত্যবিশেষের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতান্তর ছিল; তথাপি স্থূল কথা এই যে, যমুনা একটু প্রাচীন চালে চলিত, রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত; রোগিণীর সেবার কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী ছিল। রমার জন্য কবিরাজেরা যে ঔষধ দিয়া যাইত, তাহা তাহারই হাতে পড়িত; সেবন করাইবার ভার তাহার উপর। কিন্তু সেবন করান তাহার সাধ্যাতীত; রমা কিছুতেই ঔষধ খাইত না।

এ দিকে রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রমা আর মাথা তুলিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া যমুনা স্থির করিল যে, সে সকল কথা বড় রাণীকে গিয়া জানাইবে। অতএব রমাকে বলিল, "আমি বড় মহারাণীর কাছে চলিলাম; ঔষধ তিনি নিজে আসিয়া খাওয়াইবেন।"

রমা বলিল, "বাছা! মৃত্যুকালে আর কেন জ্বালাতন করিস্! বরং তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি।"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বন্দোবস্ত মা?"

রমা। তোমার এই ঔষধগুলি আমারে বেচিবে? আমি এক এক টাকা দিয়া এক একটা বড়ি কিনিতে রাজি আছি।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখে স্থানও নাই; মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলি যে?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ওষুধ খেলে, ত আর তিনটা দিন খেতে কি?

রমা। আমি ওষুধ খাই নাই।

নন্দা চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? মোটে না?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে বটে। তখন নন্দা বলিল, "কেন বহিন্—এখন আর আত্মঘাতিনী হইবে কেন? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব।

নন্দা। আর কবে খাবি?

রমা। যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর ঝর করিয়া রমার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল। আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে আসেন না। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে থাকেন। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন," এই কথা বলিয়া নন্দা রমাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল। সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাঁচিয়াছিল কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। নন্দা তাহাকে যে আশ্বাসবাক্য দিয়া আসিয়াছে, নন্দাও তাহা জপমালা করিয়াছিল, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না। যদি কখনও ধরে, তবে "আজ না কাল" করিয়া রাজা প্রস্থান করেন। নন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, কিছুতেই সে সীতারামের উপর রাগ করিবে না। ভাবিল, রাজাকে ত ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমায় যেন ভূতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ ভূত চাপিলে—এ সংসার এখন আর রাখিবে

কে? তাই নন্দা সীতারামের উপর রাগ করিল না—আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ বড় বেশী। ডাকিনী যে শ্রী, তাহা নন্দা জানিত না; সীতারাম ভিন্ন কেহই জানিত না। নন্দা অনেকবার সন্ধান জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সীতারামের আজ্ঞা ভিন্ন চিত্তবিশ্রামে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং কিছু হইল না। তবে জনপ্রবাদ এই যে, ডাকিনীটা দিবসে পরমসুন্দরী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহধর্ম্ম করে, রাত্রিতে শৃগালীরূপ ধারণ করিয়া শ্মশানে শ্মশানে বিচরণপূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করে। অতিশয় ভীতা হইয়া নন্দা, চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে সবিশেষ নিবেদন করিল। চন্দ্রচূড় উত্তম তন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থ তান্ত্রিক যজ্ঞ সকল সম্পাদন করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ডাকিনীর ধ্বংস হইল না। পরিশেষে এক জন দক্ষ তান্ত্রিক বলিলেন, "মনুষ্য হইতে ইহার কিছু উপায় হইবে না। ইনি সামান্যা নহেন। ইনি কৈলাসনিবাসিনী, সাক্ষাৎ ভবানীর সহচরী, ইহার নাম বিশালাক্ষী। ইনি রুদ্রের শাপে কিছু কালের জন্য মর্ত্তলোকে মনুষ্যসহবাসার্থ আসিয়াছেন। শাপান্ত হইলে আপনিই যাইবেন।" শুনিয়া চন্দ্রচূড় ও নন্দা নিরস্ত ও চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। তবু নন্দা মনে মনে ভাবিত, "ভবানীর সহচরী হউক, আর যেই হউক, আমি একবার তাকে পাইলে নখে মাথা চিরি।"

তাই, নন্দার সীতারামের উপর কোন রাগ নাই। সীতারামও রাজধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন; এই সকল সময়ে, নন্দা রমার কথা সীতারামকে জানাইত—বলিত, "সে বড় 'কাতর'—তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।" সীতারাম যাচ্ছি যাব করিয়া, যান নাই। আজ নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল—বলিল, "আজ দেখিতে যাও—নহিলে এ জন্মে আর দেখা হবে না।"

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। সীতারামকে দেখিয়া রমা বড় কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারামের মনে কিছু অনুতাপ জন্মিল কি না, জানি না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু কি হাসি! হাসি দেখিয়া সীতারামের শঙ্কা হইল যে, আর অধিক বিলম্ব নাই।

সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষুতে জল আসিল—কিছুক্ষণ অবাধে জল, শুষ্ক গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেও মার কান্না দেখিয়া কাঁদিতেছিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিলেন,

চন্দ্র। আমি বলিতেছি না যে, আপনি কাহারও মৃত্যুকামনা করেন। কিন্তু আপনি মৃত্যুকামনা না করিলেও, যে আপনার রক্ষণীয়, তাহাকে আপনি যত্ন ও রক্ষা না করিলে, কাজেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কেবল ছোট রাণী কেন, আপনার তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়। কথাটা আপনাকে বলিবার জন্য কয় দিন হইতে আমি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনার অবসর অভাবে, তাহা বলিতে পারি নাই।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "সকল বেটাই বলে—তত্ত্বাবধানের অভাব—বেটারা করে কি?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তত্ত্বাবধানের অভাব—আপনারা করেন কি?"

চন্দ্র। যা করিতে পারি—সব করি। তবে আমরা রাজা নহি। যেটা রাজার হুকুম নহিলে সিদ্ধ হয় না, সেইটুকু পারি না। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগত করি, কাগজপত্র দেখাই; আপনি রাজাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে—আমারও ইচ্ছা, তোমায় কিছু শিখাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "বিবেচনা করা যাইবে।"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাগে সে রাত্রি নিদ্রা গেলেন না। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় কাগজপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা এই। যত বড় রাজ্য হউক না কেন, আর যত বড় রাজা হউক না কেন, টাকা নহিলে কোন রাজ্যই চলে না। আমরা একালে দেখিতে পাই, যেমন তোমার আমার সংসার টাকা নহিলে চলে না—তেমনই ইংরেজের এত বড় রাজ্যও টাকা নহিলে চলে না। টাকার অভাবে তেমনই রোমক সাম্রাজ্য লোপ পাইল—প্রাচীন সভ্যতা অন্ধকারে মিশাইল। সীতারামের সহসা টাকার অভাব হইল।

সীতারামের টাকার অভাব হওয়া অনুচিত ; কেন না, সীতারামের আয় অনেক গুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভূঁইয়া তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—যাহা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা নিজে ভোগ করিতেছিলেন। তবে টাকার অকুলান কেন?

লোকের আয় বাড়িলেই অকুলান হইয়া উঠে। কেন না, খরচ বাড়ে। ভূষণা বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল—বারো ভূঁইয়াকে বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল। এখন অনেক ফৌজ রাখিতে হইত—কেন না, কখন কে বিদ্রোহী হয়, কখন কে আক্রমণ করে—সে জন্যও ব্যয় হইতেছিল। অভিষেকেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। অতএব যেমন আয়, তেমনই ব্যয় বটে।

কিন্তু যেমন আয়, তেমনই ব্যয় হইলে অকুলান হয় না। অকুলানের আসল কারণ চুরি। রাজা এখন আর বড় কিছু দেখেন না—চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন। কাজেই রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে,—কে নিষেধ করে? চন্দ্রচূড় ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ মানে না। চন্দ্রচূড় জনকত বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর চুরি ধরিলেন,—মনে করিলেন, এবার যে দিন রাজা দরবারে বসিবেন, সেই দিন খাতাপত্র সকল তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ধরা দেন না, "কাজ যা থাকে, মহাশয় করুন" বলিয়া কোন মতে পাশ কাটাইয়া চিত্তবিশ্রামে পলায়ন করেন। চন্দ্রচূড় হতাশ হইয়া শেষে নিজেই কয় জনের বরতরফের হুকুম জারি করিলেন। তাহারা তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল,—বলিল, "ঠাকুর! যখন স্মৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে, তখন আপনার কথা শুনিব। রাজার সহি মোহরের পরওয়ানা দেখান, নহিলে ঘরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করুন।"

রাজার সহি মোহর পাওয়া কিছু শক্ত কথা নহে। এখন রাজার কাছে যা হয় একখানা কাগজ ধরিয়া দিলেই তিনি সহি দেন—পড়িবার অবকাশ হয় না—চিত্তবিশ্রামে যাইতে হইবে। অতএব চন্দ্রচূড়, এই অপরাধীদিগের বরতরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি করাইয়া লইলেন। রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন।

কিন্তু তাহাতে, চন্দ্রচূড়ের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। প্রধান অপরাধী খাতাঞ্জি দরবারে উপস্থিত ছিল, সে দেখিল যে, রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন। রাজা চলিয়া গেলে সে

বলিল, "ও হুকুম মানি না। ও তোমার হুকুম—রাজার নয়। রাজা কাগজ পড়িয়াও দেখেন নাই। যখন রাজা স্বয়ং বিচার করিয়া আমাদিগকে বরতরফ করিবেন, তখন আমরা যাইব,—এখন নহে।" কেহই গেল না। খুব চুরি করিতে লাগিল। ধনাগার তাহাদের হাতে, সুতরাং চন্দ্রচূড় কিছু করিতে পারিলেন না।

তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের নামসমেত চন্দ্রচূড় কাগজপত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে অত্যন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, অপরাধী সকলেই শূলে যাইবে।

হুকুম শুনিয়া আম দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় যেন বজ্রাহত হইলেন, বলিলেন, "সে কি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?"

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "লঘু পাপ কি? চোরের শূলই ব্যবস্থা।"

চন্দ্র। ইহার মধ্যে কত জন ব্রাহ্মণ আছে। ব্রহ্মহত্যা করিবেন কি প্রকারে?

রাজা। ব্রাহ্মণদিগের নাক কান কাটিয়া, কপালে তপ্ত লোহার দ্বারা "চোর" লিখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর সকলে শূলে যাইবে।

এই হুকুম জারি করিয়া, রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুম মত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক রাজকর্মচারী কর্ম ছাড়িয়া পলাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকার তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না। চন্দ্রচূড় সন্ধানে সন্ধানে ফিরিয়া আবার একদিন রাজাকে ধরিলেন—বলিলেন, "মহারাজ! একবার এ কথায় কর্ণপাত না করিলে রাজা থাকে না!"

রাজা। থাকে থাকে, যায় যায়। ভাল শুনিতেছি, বলুন কি হয়েছে?

চন্দ্র। সিপাহী সব দলে দলে ছাড়িয়া চলিতেছে।

রাজা। কেন?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন পায় না?

চন্দ্র। টাকা নাই।

রাজা। এখনও কি চুরি চলিতেছে না কি?

চন্দ্র। না, চুরি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাতে কি হইবে? যে টাকা চোরের পেটে গিয়েছে, তা ত আর ফেরে নাই।

রাজা। কেন, আদায় তহশীল হইতেছে না?

চন্দ্র। এক পয়সাও না।

রাজা। কারণ কি?

চন্দ্র। যাহাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা কেহ বলে, "আদায় করিয়া শেষ তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব না কি?"

রাজা। তাহাদের বর্‌তরফ করুন।

চন্দ্র। নূতন লোক পাইব কোথায়? আর কেবল নূতন লোকের দ্বারায় কি আদায় তহশীলের কাজ হয়?

রাজা। তবে তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! তবে আদায় তহশীল করিবে কে?

রাজা। পনের দিনের মধ্যে যে বাকী বকেয়া সব আদায় না করিবে, তাহাকে কয়েদ করিব।

চন্দ্র। সকল তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা অনেকে দিতেছে না।

রাজা। কেন দেয় না?

চন্দ্র। বলে, "মুসলমানের রাজ্য হইলে দিব। এখন দিয়া কি দোকর দিব?"

রাজা। যে টাকা না দিবে, যাহার বাকী পড়িবে, তাহাকেও কয়েদ করিতে হইবে।

চন্দ্রচূড় হাঁ করিয়া রহিলেন। শেষ বলিলেন, "মহারাজ, কারাগারে এত স্থান কোথা?"

রাজা। বড় বড় চালা তুলিয়া দিবেন।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহশীলদার, উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে মনে শপথ করিলেন, আর কখনও রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে ভারি হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল—চন্দ্রচূড় চালা তুলিয়া কুলাইতে পারিলেন না। বাকিদার, তহশীলদার, উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে পলাইতে লাগিল।

তাই বলিতেছিলাম যে, আগে আগুন ত জ্বলিয়াইছিল, এখন ঘর পুড়িল ; যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানি না ; কেন না, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্যশাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন—সে কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই যে সব আপদ্ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম, কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয় ; কেন না, কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইতেছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুরও কিছু খর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত ; কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ্ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী! পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার জন্য প্রায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল। আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র,—এখন, ঘর পুড়িল! সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন।

তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রয়োগ বড় পামরেও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেই ইন্দ্রিয়বশ্যতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বলপ্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা করিতেছিলেন না। বলপ্রয়োগ করিব কি না, এ কথার মীমাংসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটা এদিক্ ওদিক্ স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম এক প্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে

রাজপুরুষেরা শূলে গেল, আদায় তহশীলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা কারাগারে গেল, বাকিদারেরা আবদ্ধ হইল, প্রজা সব পলাইল, রাজ্য ছারখারে যাইতে লাগিল।

শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগই করিবেন। কথাটা মনোমধ্যে স্থির হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজাকে আর এক দিন পাকড়া করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তীর্থপর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।"

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখন চন্দ্রচূড় ঠাকুরের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এ পাপ রাজ্যে আর বাস করিবেন না, এই পাপিষ্ঠ রাজার কর্ম্ম আর করিবেন না। অতএব তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। চন্দ্রচূড় অনেক তিরস্কার করিলেন। রাজাও অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সে দিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেই দিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে এক জন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। এখন চিত্তবিশ্রাম ক্ষুদ্র প্রমোদগৃহ হইলেও রাজগৃহ; জনকত দ্বারবানও দ্বারদেশে আছে। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা বলিল, "এ রাজবাড়ী—এখানে একটি রাণী থাকেন। কাহারও যাইবার হুকুম নাই।" বলা বাহুল্য যে, রাজাদিগের উপরাণীরাও ভৃত্যদিগের নিকট রাণী নাম পাইয়া থাকে।

ভৈরবী বলিল, "আমার তাহা জানা আছে। রাজাও আমায় জানেন। আমার যাইবার নিষেধ নাই। তোমরা গিয়া রাজাকে জানাও।"

দ্বারবানেরা বলিল, "রাজা এখন এখানে নাই—রাজধানী গিয়াছেন।"

ভৈরবী। তবে যে রাণী এখানে থাকেন, তাঁহাকেই জানাও। তাঁর হুকুমে হইবে না ?

দ্বারবানেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কখনও কেহ প্রবেশ করিতে পায় নাই—রাজার বিশেষ নিষেধ। রাণীরও নিষেধ। রাজায় অবর্ত্তমানে দুই এক জন স্ত্রীলোক (নন্দার প্রেরিতা) অন্তঃপুরে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাণীকে সংবাদ দেওয়াতে তিনি কাহাকেও আসিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে আবার রাণীকে খবর দেওয়া যাইবে কি ? তবে এ ভৈরবীটার মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না—তাড়াইয়া দিলেও যদি কোন গোলযোগ ঘটে !

দ্বারবানেরা সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিতেছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "আমি ত এই সময়ে তোমার সংবাদ লইতে আসিব বলিয়া গিয়াছিলাম। এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ, আর তুমিই নাকি তার কারণ ? টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর ঊনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে। ব্যাপারটা কি ?"

শ্রী বলিল, "তাই তোমায় খুঁজিতেছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। জয়ন্তী বলিল, "তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছ না কেন ?"

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী। রাজধানীতে যাও। রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।

শ্রী। তা ত জানি না। মহিষীর ধর্ম্ম ত শিখি নাই। সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ, তাই শিখিয়াছি। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সব গোল করিব। সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে ?

জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, "তা আমি বলিতে পারি না। তোমা হইতে সে ধর্ম্ম পালন হইবে না, বোধ হইতেছে—তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কি এত দূর হয় ?"

শ্রী। বুঝি, সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দোলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলাম—সে দিন থাকিলে বুঝি হইত। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা

হইল না। অদৃষ্ট গেল ঠিক উল্‌টা পথে—বনবাসে—সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে ?

জ। এখন উপায় ?

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ে মনে হয়, আমি গৃহিণী, উঁহার ধর্ম্মপত্নী।

জ। তা ত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে ; আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব ? তাই, আগেই বলিয়াছিলাম, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লইয়া বার জন।

জয়ন্তী। আর এগার জন আপনার শরীরে ? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি ! যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি ! আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি ! একে কি বলে সন্ন্যাস ?

শ্রী। তাই বলিতেছিলাম, পলায়নই বিধি কি না ?

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষ মানুষের মেয়ে ভুলান কথা ! পুষ্পশরাহতের প্রলাপ !

শ্রী। সে ভয় নাই ?

জ। থাকিলে তোমার কি ? রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি ? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা ? এই কি সন্ন্যাস ?

শ্রী। তা হোক না হোক—রাজা মরিলেই কোন্ সর্ব্বভূতের হিতসাধন হইল ?

জ। রাজা মরিবে না, ভয় নাই। ছেলে খেলানা হারাইলে কাঁদে, মরে না। তুমি ঈশ্বরে কর্ম্মসংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযতচিত্ত হইতে পার, তাই কর।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই ? দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন ?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল, সবই আছে দেখিতেছি। ভৈরবীবেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ ? তার পর তুমি যাইবে কি প্রকারে ?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "এ কি আমার সৌভাগ্য! এত কালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে! আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি?"

শ্রী। রাজার হাতে পড়িবে—কি জানি, রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন!

জ। হইলে আমার কি করিবেন? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারে?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?"

জ। তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও, আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না, তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ তল্লাস হইবে। তিনি তোমাকে রাজপুরীমধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেইখানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ। ভয়ানক ব্যাপার! লোক অস্থির হ'য়ে উঠলো।

শ্যামচাঁদ। তাই ত দাদা। আর তিলার্দ্ধ এ রাজ্যে থাকা নয়।

রামচাঁদ। তা তুমি ত আজ ক'ত দিন ধ'রে যাই যাই ক'চ্ছো—যাও নি যে?

শ্যামচাঁদ। যাওয়ারই মধ্যে, মেয়ে ছেলে সব নলডাঙ্গা পা'ঠিয়ে দিয়েছি। তবে আমার কিছু লহনা পড়ে রয়েছে, সেগুলা যত দূর হয়, আদায় ওসুল ক'রে নিয়ে যাই। আর আদায় ওসুল বা করবো কার কাছে—দেনেওয়ালারাও সব ফেরার হয়েছে।

রামচাঁদ। আচ্ছা, এ আবার নূতন ব্যাপার কি? কেন এত হাঙ্গামা, তা কিছু জান? শুনেছি না কি, হাবুজখানায় আর কয়েদী ধরে না, নূতন চালাগুলাতেও ধরে না, এখন না কি গোহালের গোরু বাহির করিয়া কয়েদী রাখ্ছে?

শ্যামচাঁদ। ব্যাপারটা কি জান না? সেই ডাকিনীটা পালিয়েছে।

রাম। তা শুনেছি। আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ যজ্ঞে কিছুতেই গেল না—এখন আপনি পালাল যে?

শ্যাম। আপনি কি আর গিয়েছে? (চুপি চুপি) বল্‌তে গায়ে কাঁটা দেয়। সে নাকি দেবতার তাড়নায় গিয়েছে।

রাম। সে কি?

শ্যাম। এই নগরে এক দেবী অধিষ্ঠান করেন শুন নি? তিনি কখন কখন দেখা দেন—অনেকেই তাঁকে দেখেছে। কেন, যে দিন ছোট রাণীর পরীক্ষা হয়, সে দিন তুমি ছিলে না?

রাম। হাঁ! হাঁ! সেই তিনিই! আচ্ছা, বল দেখি তিনি কে?

শ্যাম। তা তিনি কি কারও কাছে আপনার পরিচয় দিতে গিয়েছেন! তবে পাঁচ জন লোকে পাঁচ রকম বল্‌চে।

রাম। কি বলে?

শ্যাম। কেউ বলে, তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। কেউ বলে, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ জিউর মন্দির হইতে কখনও কখনও রূপ ধারণ ক'রে বা'র হন, লোকে এমন দেখেছে। কেউ বলে, তিনি স্বয়ং দশভূজা; দশভুজার মন্দিরে গিয়া অন্তর্দ্ধান হ'তে তাঁকে না কি দেখেছে।

রাম। তাই হবে। নইলে তিনি ভৈরবীবেশ ধারণ করবেন কেন? সে সভায় ত তিনি ভৈরবীবেশে অধিষ্ঠান করেছিলেন?

শ্যাম। তা যিনিই হ'ন, আমাদের অনেক ভাগ্য যে, আমরা তাঁকে সে দিন দর্শন করেছিলাম। কিন্তু রাজার এমনই মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে—

রাম। হাঁ—তার পর ডাকিনীটা গেল কি ক'রে শুনি।

শ্যাম। সেই দেবী, ডাকিনী হ'তে রাজ্যের অমঙ্গল হ'চ্চে দেখে, এক দিন ভৈরবী-বেশে ত্রিশূল ধারণ ক'রে তাকে বধ করতে গেলেন।

রাম। ইঃ! তার পর?

শ্যাম। তার পর আর কি? মার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে, সেটা তালগাছপ্রমাণ বিকটাকার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঘোর গর্জ্জন করতে করতে কোথায় যে আকাশপথে উড়ে গেল, কেউ আর দেখ্‌তে পেলে না।

রাম। কে বল্‌লে ?

শ্যাম। বল্‌লে আর কে ? যারা দেখেছে, তারাই বলেছে। রাজা এমনই সেই ডাকিনীর মায়ায় বদ্ধ যে, সেটা গেছে ব'লে চিত্তবিশ্রামের যত দ্বারবান দাস দাসী, সবাইকে ধরে এনে কয়েদ করেছেন। তারাই এই সব কথা প্রকাশ করেছে। তারা বলে, "মহারাজ ! আমাদের অপরাধ কি ? দেবতার কাছে আমরা কি কর্‌ব ?"

রাম। গল্প কথা নয় ত ?

শ্যাম। এ কি আর গল্প কথা !

রাম। কি জানি। হয় ত ডাকিনীটা মড়া ফড়া খাবার জন্য রাত্রিতে কোথা বেরিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি। এখন রাজার পীড়াপীড়িতে তারা আপনার বাঁচন জন্য একটা রচে মচে বলচে।

শ্যাম। এ কি আর রচা কথা ? তারা দেখেছে যে, সেটার এমন এমন মূলোর মত দাঁত, শোনের মত চুল, বারকোশের মত চোক, একটা আস্ত কুমীরের মত জিব, দুটো জালার মত দুটো স্তন, মেঘগর্জ্জনের মত নিশ্বাস, আর ডাকেতে একেবারে মেদিনী বিদীর্ণ !

রাম। সর্ব্বনাশ ! এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার ! রাজার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বল্‌ছিলে কি ?

শ্যাম। তাই বল্‌চি শোন না। এই ত গেল নিরপরাধী বেচারাদের নাহক কয়েদ। তার পর, সেই ডাকিনীটাকে খুঁজে ধরে আন্‌বার জন্য রাজা ত দিক্ বিদিকে কত লোকই পাঠাচ্চেন। এখন সে আপনার স্বস্থানে চলে গেছে, মনুষ্যের সাধ্য কি যে, তাকে সন্ধান ক'রে ধ'রে আনে। কেউ তা পারচে না—সবাই এসে যোড় হাত ক'রে এত্তেলা কর্‌ছে যে, সন্ধান করতে পার্‌লে না।

রাম। তাতে রাজা কি বলেন ?

শ্যাম। এখন যাই কেউ ফিরে এসে বল্‌চে যে, সন্ধান পেলে না, অমনই রাজা তাকে কয়েদে পাঠাচ্চেন। এই করে ত হাবুজখানা পরিপূর্ণ। এ দিকে রাজপুরুষদের এমনই ভয় লেগেছে যে, বাড়ী, ঘর, দ্বার, স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে পালাচ্চে। দেখাদেখি নগরের প্রজা দোকানদারও সব পালাচ্চে।

রাম। তা, দেবী কি করেন ? তিনি কটাক্ষ করিলেই ত এই সকল নিরপরাধী লোক রক্ষা পায়।

শ্যাম। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! তিনি এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভৈরবীবেশে রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "রাজা! নিরপরাধীর পীড়ন করিও না। নিরপরাধীর পীড়ন করিলে, রাজার রাজ্য থাকে না। এদের কোন দোষ নাই। আমিই সেটাকে তাড়াইয়াছি—কেন না, সেটা হ'তে তোমার রাজ্যের অমঙ্গল হতেছিল। দোষ হয়ে থাকে, আমারই হয়েছে। দণ্ড করিতে হয়, ওদের ছেড়ে দিয়ে আমারই দণ্ড কর।

রাম। তার পর?

শ্যাম। তাই বল্‌ছিলাম, রাজার বড় মতিচ্ছন্ন ধরেছে। সেটা পালান অবধি রাজার মেজাজ এমন গরম যে, কাক পক্ষী কাছে যেতে পাচ্চে না। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কাছে গিয়েছিলেন, বড় রাণী কাছে গিয়েছিলেন, গাল খেয়ে পালিয়ে এলেন।

রাম। সে কি! গুরুকে গালি গালাজ? নির্ব্বংশ হবেন যে!

শ্যাম। তার কি আর কথা আছে? তার পর শোন না। গরম মেজাজের প্রথম মোহড়াতেই সেই দেবতা গিয়া দর্শন দিয়া ঐ কথা বললেন। বলতেই রাজা চক্ষু আরক্ত করিয়া তাঁকে স্বহস্তে প্রহার করিতেই উদ্যত। তা না ক'রে, যা করেছে, সে ত আরও ভয়ানক!

রাম। কি করেছে?

শ্যাম। ঠাকুরাণীকে কয়েদ করেছে। আর হুকুম দিয়েছে যে, তিন দিন মধ্যে ডাকিনীকে যদি না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত রাজ্যের লোকের সমুখে (সেই দেবীকে) উলঙ্গ ক'রে চাঁড়ালের দ্বারা বেত মারিবে।

রাম। হো! হো! হোহো! দেবতার আবার কি কর্‌বে! রাজা কি পাগল হয়েছে! তা, মা কি কয়েদে গিয়েছেন না কি? তাঁকে কয়েদ করে কার বাপের সাধ্য?

শ্যাম। দেবচরিত্র কার সাধ্য বুঝে! রাজার না কি রাজ্যভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরিয়েছে, তাই মা ছল ধরিয়া, এখন স্বধামে গমনের চেষ্টায় আছেন। রাজা কয়েদের হুকুম দিলেন, মা স্বচ্ছন্দে গজেন্দ্রগমনে কারাগারমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শুনিতে পাই, রাত্রে কারাগারে মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। যত দেবতারা আসিয়া স্তব পাঠ করেন—ঋষিরা আসিয়া বেদ পাঠ, মন্ত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা বাহির হইতে শুনিতে পায়, কিন্তু দ্বার খুলিলেই সব অন্তর্দ্ধান হয়। (বলা বাহুল্য যে, জয়ন্তী নিজেই রাত্রিকালে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা তাহাই শুনিতে পায়।)

রাম। তার পর?

শ্যাম। তার পর এখন আজ সে তিন দিন পূরিল। রাজা ঢেঁট্‌রা দিয়েছেন যে, কাল এক মাগী চোরকে বেইজ্জৎ করিয়া বেত মারা যাইবে, যাহার ইচ্ছা হয়, দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কার ঠাকুরই বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণী বা কিছু বলেন না কেন? দুটো গালাগালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা না কি অনেক বলেছেন। রাজা বলেন, ভাল, দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড আমি দিব, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি?

রাম। তা এক রকম বলেছে মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত। তা ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখ্‌তে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈ কি। সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কে না দেখ্‌তে যাবে!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক ধরে না। ক্রমে ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি পেষাপেষি মিশামিশি হইতে লাগিল। এই দুর্গমধ্যে আর এক দিন এমনই লোকারণ্য হইয়াছিল—সে দিন রমার বিচার। আজ জয়ন্তীর দণ্ড। বিচার অপেক্ষা দণ্ড দেখিতে লোক বেশী আসিল। নন্দা বাতায়ন হইতে দেখিলেন, কালো চুল মাথার তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না; কদাচিৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় আঁচল বা কোন পুরুষের মাথায় চাদর জড়ান, সেই কৃষ্ণসাগরে ফেনরাশির ন্যায় ভাসিতেছে। সেই রমার পরীক্ষা নন্দার মনে পড়িল, কিন্তু মনে পড়িল যে, সে দিন দেখিয়াছিলেন যে, সেই জনার্ণব বড় চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, যেন বাত্যাতাড়িত; রাজপুরুষেরা কষ্টে শান্তি রক্ষা করিয়াছিল;—আজ সকলেই নিস্তব্ধ। সকলেরই মনে রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা বড় জাগরূক। সকলেই মনে মনে ভয় পাইতেছিল। আজ এই লোকারণ্য সিংহব্যাঘ্রবিমর্দ্দিত মহারণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক দেখাইতেছিল।

সেই বৃহৎ দুর্গপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদুপরি এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠগঠন বিকটদর্শন চণ্ডাল, মূর্ত্তিমান্ অন্ধকারের ন্যায় দীর্ঘ বেত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। জয়ন্তীকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করিয়া সেই চণ্ডাল বেত্রাঘাত করিবে, ইহাই রাজাজ্ঞা।

জয়ন্তীকে এখনও সেখানে আনা হয় নাই। রাজা এখনও আসেন নাই—আসিলে তবে তাহাকে আনা হইবে। মঞ্চের সম্মুখে রাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। তাহা বেষ্টন করিয়া চোপদার ও সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া আছে। অমাত্যবর্গ আজ সকলেই অনুপস্থিত। এমন কুকাণ্ড দেখিতে আসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। রাজাও কাহাকে ডাকেন নাই।

কতক্ষণে রাজা আসিবেন, কতক্ষণে সেই দণ্ডনীয় দেবী বা মানবী আসিবে, কতক্ষণে কি হইবে, সেই জন্য প্রত্যাশাপন্ন হইয়া লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুকরাইল; স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল। দর্শকেরা জানিল, রাজা আসিতেছেন।

রাজার আজ বেশ ভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই—বৈশাখের দিনান্তকালের মেঘের মত রাজা আজ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি! আয়ত চক্ষু রক্তবর্ণ—বিশাল বক্ষ মধ্যে মধ্যে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বর্ষণোন্মুখ জলধরের উন্নমনের ন্যায় রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন। কেহ বলিল না, "মহারাজাধিরাজকি জয়!"

তখন সেই লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল—দেখিল, সেই সময়ে প্রহরিগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। প্রহরীরা তাহাকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। কোন প্রাসাদশিখরোপরি উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি সেই মঞ্চোপরি উদিত হইল। তখন সেই সহস্র সহস্র দর্শক ঊর্দ্ধমুখে, উৎক্ষিপ্তলোচনে গৈরিকবসনাবৃতা মঞ্চস্থা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট দেহ; তাহার দেবোপম স্থৈর্য্য—দেবদুর্ল্লভ শান্তি; সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধরভরা মৃদু মৃদু মধুর স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ববিপৎসংহারিণী শক্তির পরিচয়স্বরূপ সেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য! দেখিয়া, অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল। যখন কতকগুলি লোক দেখিল, আর কতকগুলি লোক জয়ন্তীকে প্রণাম করিতেছে—তখন তাহাদের মনে সেই ভক্তিভাব প্রবেশ করিল। তখন তাহারা "জয় মায়িকি জয়!" "জয় লছমী মায়িকি জয়!" ইত্যাদি ঘোররবে জয়ধ্বনি

করিল। সেই জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গণের এক ভাগ হইতে অপর ভাগে, এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিরিশ্রেণীস্থিত বজ্রনাদের মত প্রক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষ সেই সমবেত লোকসমারোহ এককণ্ঠ হইয়া তুমুল জয়শব্দ করিল। পুরী কম্পিতা হইল। চণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। জয়ন্তী মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "জয় জগদীশ্বর! তোমারই জয়! তুমি আপনি এই লোকারণ্য, আপনিই এই লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় জগন্নাথ! তোমারই জয়! আমি কে?"

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! রক্ষা কর! আমি আর কখনও ভিক্ষা চাহিব না, এইবার আমায় এই ভিক্ষা দাও—ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন—দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়াইয়া যায়! বেটী জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে।

চন্দ্র। দেবতা না হইল—স্ত্রীলোক বটে।

রাজা। স্ত্রীলোকেরও রাজা দণ্ড করিতে পারেন।

চন্দ্র। এই জয়ধ্বনি শুনিতেছেন? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজার নাম ডুবিয়া যাইতেছে।

রাজা। ঠাকুর! আপনার কাজে যাও। পুঁথি পাঁজি নাই কি?

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উঁচু করিল—জয়ন্তীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া—রাজার পানে চাহিল—আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি!" বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চণ্ডাল বলিল, "মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।"

চণ্ডাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।"

তখন রাজা অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "চণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ কর।"

রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, জয়ন্তী সীতারামকে বলিলেন, "এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, আপনার যে আজ্ঞা, আমি নিজেই পালন করিতেছি—চণ্ডাল বা জল্লাদের প্রয়োজন নাই।" তথাপি রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া, জয়ন্তী তাহাকে বলিল, "বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে? আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই; বেতে আমার কি হইবে? আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও—বেত তোল।"

চণ্ডাল বেত উঠাইল না। জয়ন্তী তখন চণ্ডালকে বলিল, "বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না—এই তার প্রমাণ দেখ।" এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত, মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল—হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মঞ্চতল তাহাতে প্লাবিত হইল। দেখিয়া লোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চণ্ডালকে বলিল, "দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

চণ্ডাল একবার রুধিরাক্ত ক্ষতপানে চাহিল—একবার জয়ন্তীর সহাস্য প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া, অতি ত্রস্তভাবে মঞ্চসোপান অবরোহণ করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। লোকারণ্যমধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা তখন অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "দোস্‌রা লোক লইয়া আইস—মুসলমান।"

অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ এক জন কসাইকে লইয়া আসিল। সে মহম্মদপুরে গোরু কাটিতে পারিত না—কিন্তু নগরপ্রান্তে বক্‌রি মেড়া কাটিয়া বেচিত। সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান্ ও কদাকার। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বেত উঁচু করিয়া, কসাই জয়ন্তীকে বলিল, "কাপ্‌ড়া উতার্—তেরি গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা কর্‌কে হাম দোকান্‌মে বেচেঙ্গে।"

জয়ন্তী তখন অপরিম্লান মুখে, জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্যা আছে, সেই আপনার

কন্যাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্যা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু, যাহার দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে, সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।"

লোকে এই কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিল, কি না বুজিল, জয়ন্তী তাহা আর চাহিয়া দেখিল না। মন তখন খুব উচু সুরে বাঁধা আছে—জয়ন্তী তখন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। জয়ন্তী কেবল রাজার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্র হইব। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিও না। তুমি রাজ্যেশ্বর; তোমায় পশুবৃত্ত দেখিলে প্রজারা কি না করিবে? মহারাজ, আমি বনবাসিনী, বনে থাকিতে গেলে অনেক সময়ে বিবস্ত্র হইতে হয়। একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম—বাঘের মুখ হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি, তোমার আচরণ দেখিয়া সেইরূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছে না। কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—কেন না, তুমি রাজা এবং গৃহী, তোমার মহিষী আছেন। চক্ষু বুজ।"

বৃথা বলা! তখন মহাক্রোধান্ধকারে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া, কসাইকে বলিলেন, "জবরদস্তী কাপ্‌ড়া উতার লেও।"

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী আপনার কাছে আপনি ঠকিয়াছে,—এখন বুঝি জয়ন্তীর চোখে জল আসে। জয়ন্তী মনে করিয়াছিল, "যখন পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, যখন আর আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আমার আর বিবস্ত্র আর সবস্ত্র কি? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা করিব? জগদীশ্বরের নিকট ভিন্ন, সুখদুঃখের অধীন মনুষ্যের কাছে লজ্জা কি? আমি কেন এই সভামধ্যে বিবস্ত্র হইতে পারিব না?" তাই জয়ন্তী এতক্ষণ আপনাকে বিপন্নই মনে করে নাই—বেত্রাঘাতটা ত গণ্যের মধ্যে নহে। কিন্তু এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল—তখন কোথা হইতে পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয়বিজয়িনী সুখদুঃখ-বর্জ্জিতা জয়ন্তীকেও অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী মঞ্চতলে জানু পাতিয়া বসিল। তখন যুক্তকরে, পবিত্রচিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ পৃথিবীর

সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর! নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না। তাই আজ কাতরে ডাকিতেছি, জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর।"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল, "মহারাজ! এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।" রাজা কর্ণপাত করিলেন না। নিরুপায় জয়ন্তী আপনার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, ছাড়িতেছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। শ্রী থাকিলে বড় বিস্মিতা হইত—জয়ন্তীর চক্ষুতে আর কখনও কেহ জল দেখে নাই। জয়ন্তী রুধিরাক্ত ক্ষত হস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতেছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর।"

বুঝি জগন্নাথ সে কথা শুনিলেন। সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। "রাণীজিকি জয়! মহারাণীকি জয়! দেবীকি জয়!" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কারশিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া, মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল। কসাই জয়ন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু মঞ্চ হইতে নামিল না।

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া অতি পরুষভাবে নন্দাকে বলিলেন, "এ কি এ মহারাণী!"

নন্দা বলিলেন, "মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখনও এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।"

রাজা পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

নন্দা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, এই কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা কথা কহিলেন না। তখন নন্দা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই রাজপুরীমধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই যে, এটাকে নামাইয়া দেয়?"

তখন সহস্র দর্শক এককালে "মার! মার!" শব্দ করিয়া কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইল। সে লম্ফ দিয়া মঞ্চ হইতে পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দর্শকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া, মারিতে মারিতে দুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। পরে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া, প্রাণ মাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, "মা! দয়া করিয়া অভয় দাও। মা! আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়া থাকেন। মা! অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব।"

তখন রাণী পৌরস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জয়ন্তীকে ঘেরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। রাজা কিছু করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন মহাকোলাহলপূর্ব্বক, এবং নন্দাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দর্শকমণ্ডলী দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুয়াইয়া, সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, "মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া, আমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীমধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।" নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের কথা বাহিরে যায় বটে, কিন্তু কখনও ঠিক ঠিক যায় না। স্ত্রীলোকের মুখে মুখে যে কথাটা চলিয়া চলিয়া রটিতে থাকে, সেটা কাজেই মুখে মুখে বড় বাড়িয়া যায়। বিশেষ যেখানে একটুখানি বিস্ময়ের গন্ধ থাকে, সেখানে বড় বাড়িয়া যায়। জয়ন্তী সম্বন্ধে অতিপ্রকৃত রটনা পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল, নাগরিকদিগের কথাবার্ত্তায় আমরা

দেখিয়াছি। এখন জয়ন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী এবং রক্ষাকর্ত্রী দেবতা, রাজাকে ছলনা করিয়া, এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব উঠিল যে, মুর্শিদাবাদ হইতে নবাবি ফৌজ আসিতেছে। কাজেই রাজ্যধ্বংস যে অতি নিকট, সে বিষয়ে আর বড় বেশী লোকের সন্দেহ রহিল না। তখন নগরমধ্যে বোচ্‌কা বাঁধিবার বড় ধূম পড়িয়া গেল। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

সীতারাম এ সকলের কোন সংবাদ না রাখিয়া চিত্তবিশ্রামে গিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সীতারাম কতকগুলি নীচব্যবসায়ী নীচাশয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" তখন দলে দলে সেই পামরেরা চারি দিকে ছুটিল। যে অর্থের বশীভূতা, তাহাকে অর্থ দিয়া লইয়া আসিল। যে সাধ্বী, তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকারের উপর আবার হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর এবার কাহাকে কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন ?"

চন্দ্র। কাশী।—আপনি কোথায় যাইতেছেন ?

ফকির। মোক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায় ?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।
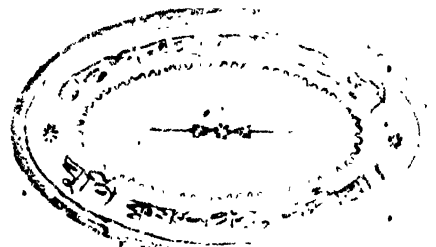
বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"জয় জগন্নাথ! তোমার দয়া অনন্ত। তোমার মহিমার পার নাই! তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ্! বিপদ্ কাহাকে বলে প্রভু? তাহা বলিতে পারি না; তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ্! আমি এত দিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই যে, আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা; কেন না, আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া। অর্জ্জুন ডাকিয়াছিলেন, আমিও ডাকিতেছি প্রভু, শিখাও প্রভু! শাসন কর!

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

জয়ন্তী, জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপিতার নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনই সেই পরম পিতা-মাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার লইল। আবদার, সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায়, বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, "আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন। সীতারাম ডাকে না—ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপীর দণ্ডই এই যে; সে দয়াময়কে ডাকিতে ভুলিয়া যায়। তাই সীতারাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে, আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক, আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি যে, এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

তার পর জয়ন্তী ভাবিল যে, "যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি, কি করা যায়। আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে

নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণপরম্পরা বুঝিয়া উঠি।"

জয়ন্তী তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "রাজার অধঃপতন নিকট। তাঁহার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী। উপায় ভগবান্। ভগবান্‌কে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌কে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে, সেই দিন তাঁহার আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

শ্রী। তাহার উপায় কি? আমি যখন তাঁহার কাছে ছিলাম, তখন সর্ব্বদা ভগবৎ-প্রসঙ্গই তাঁর কাছে কহিতাম। তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিতেন।

জয়ন্তী। তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হা করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কাণে প্রবেশ করিত না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথার কিছু উত্তর করিয়াছিলেন কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?

শ্রী। না। তা বড় লক্ষ্য করি নাই।

জয়ন্তী। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি,—ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।

শ্রী। তবে, এখন কি কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে, অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না? * স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?

শ্রী। তবে আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিয়াছিলে কেন?

জ। তুমি যে বলিলে, তোমার শত্রু, রাজা নিয়া বার জন। যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে

* কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥
গীতা ১৮।৯

কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। তাই তোমাকে পলাইতে বলিয়াছিলাম। যার যে ভার সয় না, তাকে সে ভার দিই না। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি উপমা মনে আছে ত?

শ্রী বড় লজ্জিতা হইল। ভাবিয়া বলিল, "কাল ইহার উত্তর দিব।"

সে দিন আর সে কথা হইল না। শ্রী সে দিন জয়ন্তীর সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করিল না। পরে জয়ন্তী তাহাকে ধরিল। বলিল, "আমার কথার কি উত্তর সন্ন্যাসিনী?"

শ্রী বলিল, "আমায় আর একবার পরীক্ষা কর।"

জয়ন্তী বলিল, "এ কথা ভাল। তবে মহম্মদপুর চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।"

দুই জনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবু সীতারামের চৈতন্য নাই।

বাকি মৃণ্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—আর পতিভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃণ্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক দিন প্রাতে মৃণ্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃণ্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃণ্ময় আর নাই। সেই দিন প্রাতে মৃণ্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃণ্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌঁছিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় এ সংবাদ মৃণ্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই যে, পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিবে। সংবাদ পাইবামাত্র মৃণ্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে যেখানে সুন্দরীমণ্ডলীপরিবেষ্টিত সীতারাম লীলায় উন্মত্ত, সেইখানে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, "মৃণ্ময় মরিয়াছে। মুসলমান সেনা

আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।” সীতারাম মনে মনে বলিলেন, “তবে আজ শেষ। ভোগ-বিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ; জীবনের শেষ।” তখন রাজা রমণীমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বিলাসিনীরা বলিল, “মহারাজ, কোথা যান? আমাদের ফেলিয়া কোথা যান?”

সীতারাম চোপদারকে আজ্ঞা করিলেন, “ইহাদের বেত মারিয়া তাড়াইয়া দাও।”

স্ত্রীলোকেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হরিবোল দিয়া উঠিল। তাহাদিগের থামাইয়া ভানুমতী নামে তাহাদিগের মধ্যস্থ এক সুন্দরী রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিল, “মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশু সন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইও না; কিন্তু মনে রাখিও যে, ধর্ম্ম আছে।”

রাজা এ কথার উত্তর না করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুর্গদ্বারে চলিলেন। যুবতীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বলিল, “আয় ভাই, রাজার রাজধানী লুঠি গিয়া চল। সীতারাম রায়ের সর্ব্বনাশ দেখি গিয়া চল।” কেহ বলিল, “সীতারাম আল্লা ভজিবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভজি গে চল।” সে সকল কথা রাজার কাণে গেল না। ভানুমতীর কথায় রাজার কাণ ভরিয়াছিল। রাজা এখন স্বীকার করিলেন, “ধর্ম্ম আছে।”

রাজা গিয়া দেখিলেন, মুসলমান সেনা এখনও গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র—তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধূলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিকে ধাবমান হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে; এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বার সম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় সিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। যে কয় জন বাকি ছিল, তাহারা মৃণ্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নুন খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে মনে কহিলেন, “অনেক পাপ করিয়াছি। ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।”

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই। সকলেই আপন আপন ধন প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহ নাই। দুই এক জন অতি পুরাতন দাস দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন যে যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য, জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার। রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবারও স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল---তাহারা আসিয়া গড় ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কোলাহল, অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারি পাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে!"

রাজা বলিলেন, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—"

নন্দা। সে কি মহারাজ? শ্রী?

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ?

নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হউক, শ্রীই হউক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীরধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব —তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই, এক শত যোদ্ধাও নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব; তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল, "মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহু ভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইতে! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে! ইহারা যে মুসলমানের হাতে পড়িবে।"

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, "তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্র-কন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়ই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া, রাজা সজ্জার্থ অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সঙ্গে অস্ত্রগৃহে গেলেন। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালকবালিকাগুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধৃবেশ পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যুকামনায়, একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন যে, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুই জন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে, গৈরিক-ভস্মরুদ্রাক্ষবিভূষিতা, জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে, সেইরূপ ভৈরবী-বেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে, এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদ্গদকণ্ঠ, সজললোচন—কথা কহিবে, ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে, নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,—

এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?"

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সী। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও। ঐ শোন! মুসলমানের কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহ সমর্পণ করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়ন্তী। আর একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। আজ তাহা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই, যে আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

রাজা। ঐ কোলাহল শুনিতেছ? ঐ সেনা সকলের, এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগের হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষুতে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়! উপায় কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি। জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল—হৃদয়মধ্যে অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে, সূর্য্যরশ্মি বিকসিত হইতে লাগিল—চিন্তা করিতে করিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশক সেই মহাজ্যোতিঃ প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন,

"নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?"

সীতারাম অন্যমনা হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুই জনে সেই মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, ডাকিতে লাগিল—গগনবিহারী গগনবিদারী কলবিহঙ্গনিন্দী কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ!॥

দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে বাঁকে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন অন্য শব্দশূন্য—তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তস্বরসংবাদিনী অতুলিতকণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব!॥

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন,—আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল। জয়ন্তী ও শ্রী সেই আকাশবিপ্লাবী কণ্ঠে আবার হরিনাম করিতে লাগিল, হরি! হরি! হরি! হরি হে! হরি! হরি! হরি! হরি হে!

এমন সময়ে দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল—শব্দ শুনা গেল—"জয় মহারাজকি জয়! জয় সীতারামকি জয়!"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

পাঠককে বলিতে হইবে না যে, দুর্গমধ্যেই সিপাহীরা বাস করিত। ইহাও বলা গিয়াছে যে, সিপাহী সকলই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, কেবল জন পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা বাছা লোক—বাছা বাছা লোক নহিলে এমন সময়ে বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ দিকে মুসলমান সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে, কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে—গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না! রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ? তাহাদের ত সাজিতে হুকুম দিলেন না! তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না, কিন্তু তাও ত ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত বলে না, "আইস! আমার জন্য মর!" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহার মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব! ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সেই কি ভাল হইবে? আইস, মরিতে হয় ত মরদের মত মরি! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক! মরিবার আবার হুকুম হাকাম কি? মহারাজের নিমক্ খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—তা হুকুম না পাইলে, কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল, হুকুম হোক্ না হোক্, আমরা গিয়া লড়াই করি!"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে, গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকার? এখন দুর্গরক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাজাও গড়ে আছে। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অ ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল—আপন আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালনপূর্ব্বক, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা শব্দ উঠাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "জয় মহারাজকি জয়! জয় রাজা সীতারামকি জয়!"।

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যোদ্ধৃগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম, জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের কি হুকুম? আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয় জন নেড়া মুণ্ডকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহীরা ততক্ষণ নিবিষ্টমনা হইয়া অবিচলিতচিত্ত এবং অস্খলিতপ্রারম্ভ হইয়া সেই সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব পলাইয়াছিল বলিয়াছি। কিন্তু দুই চারি জন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহাও বলিয়াছি। তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা সিপাহীদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া, অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া, স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর।"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল। বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, "জয় জগদীশ্বর! জয় লছমীনারায়ণজী!" বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া—

জয় শিব শঙ্কর! ত্রিপুরনিধনকর!
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয় রে!
চক্রগদাধর! কৃষ্ণ পীতাম্বর!
জয় জয় হরি হর! জয় জয় রে!

ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "সে কি? এখনই পিশিয়া মরিবে যে!"

শ্রী বলিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজাও, এই স্ত্রীলোকেরা কথার বাধ্য নহে বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না।

তার পর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্ঝনা বাজিল—সিংহদ্বারের উচ্চ গুম্বুজের ভিতরে, তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবনসেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কবাট আপনি উদ্ঘাটিত হইল—উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল, পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান সেনা দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া তেমনই বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনা-তরঙ্গ,—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্বমোহিনী দেবীমূর্ত্তি, তেমনই অদ্ভুত বেশ, তেমনই অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব সাহস, তেমনই সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি!—মুসলমান সেনা তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূল-ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া, যবন সেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা, জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার নির্দেশবর্ত্তী হইয়া মরিবেন।

তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবীমুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এখন তাঁর কাছে মুসলমান কোন্ ছার!

তাঁর প্রফুল্লকান্তি, এবং সামান্যা অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান সেনা 'মার! মার!' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুই জনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না—কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের আঘাতে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর এক জন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল। সিপাহীদিগের উপর যে আক্রমণ হইতে লাগিল, তাহা ভয়ানক; কিন্তু সীতারামের দৃষ্টান্তে, উৎসাহবাক্যে, অধ্যবসায় এবং শিক্ষার প্রভাবে তাহারা সকল বিঘ্ন জয় করিয়া চলিল। পার্শ্বে দৃষ্টি না করিয়া, যে সম্মুখে গতিরোধ করে, তাহাকেই আহত, নিহত, অশ্বচরণবিদলিত করিয়া সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, মুসলমান সেনাপতি সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামান সকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে, রাজা রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া, সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন। নিজে সে দিকে যাইতে পারিলেন না; কেন না, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেই দিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকেও সেই দিকে যাইতে হইল—সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচ জনে লুঠিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচীব্যূহের সম্মুখে পৌঁছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী জয়ন্তী দুই জনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিয়া, চারি দিক্ চাহিয়া ঈষৎ, মৃদু, প্রফুল্ল, জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে চাহিয়া, সেইরূপ হাসি হাসিল—দুই জনে যেন

বলাবলি করিল—"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া শুনিয়া, গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ রক্ষা কর!" "শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই, ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম, সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচীব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। সূচীব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্যধ্বংস হইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হাঁ। তুমি মহারাজকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয় একটু চোখের জল পড়িবে। তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চোখের জলই বা কেন পড়িবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তার মৃত্যুর কারণ। আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত। তাহা হইলে মহারাজা নিশ্চিত বিনষ্ট হইতেন, গোলন্দাজকে তখন আর কে মারিত?

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজা বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে —তবে আর কথায় কাজ কি ?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এ উৎকণ্ঠা কেন ?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাসবিভ্রংশের কথা কেন বল ?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। আমি সে স্থানে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি—রাত্রেও সে স্থানের ঠিক পাইব। কিন্তু আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বলিয়া দুই জনে খড়ের মসাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌছিল. সেখানে মসালের আলো ধরিয়া তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃত দেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকা চুল ধরিয়া টানিল--পরচুলা খসিয়া আসিল; শ্বেতশ্মশ্রু ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্, যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে ?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎ‍র্সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তাহা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাই হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। বোধ হয়, রমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা জানে না, ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল। কেন না, রমা তাহাকে চিনিতে পারিলে কখনই তাহার সঙ্গে যাইবে না মনে করিয়া থাকিবে। বোধ হয়, শিবিকাতে রমা ছিল মনে করিয়া, তোপ লইয়া পথ রোধ করিয়াছিল। যাই হোক, উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া, উহার দাহ করা যাক আইস।

তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

পরিশিষ্ট

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ—সে ত জানাই ছিল। গড় টড় সব মুসলমানে দখল করে লুঠপাঠ করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হ'লো, কিছু ঠিক্ খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্চে, তাঁদের না কি বেঁধে মুর্শিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে না কি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুন্‌তে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তার পর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকেই কত রকম বলে! আবার কেউ কেউ বলে, রাজা রাণী নাকি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।

পাঠভেদ

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ১২৯৩ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত 'প্রচারে' ধারাবাহিক ভাবে 'সীতারাম' প্রকাশিত হয়, মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল। ১২৯৩ সালে ইহা প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রচারে' প্রকাশিত 'সীতারামে'র সহিত ১ম সংস্করণ পুস্তকের পার্থক্য খুব বেশী নয়, কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। 'সীতারামে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৫ সালে) বাহির হয়, এই সংস্করণে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, ১ম সংস্করণের বহু পরিচ্ছেদ ও বহু অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়। ১৮৯৪ সালের মে মাসে সীতারামের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং এই সংস্করণের পাঠই মূল পাঠ হইয়াছে। ১ম সংস্করণের পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪১৯, ৩য় সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ৩২২। ১ম ও ৩য় সংস্করণের পাঠভেদ নিম্নে দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা ৫, পংক্তি ৬, "তখন সেই ভূষণায়···বাস করিতেন।" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

তখন সেই ভূষণা অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। একজন ফৌজদার সেখানে বাস করিতেন।

পৃ. ৯, পংক্তি ১৪-১৭, "ভিখারির পক্ষে···চলিয়া গেল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

শ্রী একটু মাথা তুলিয়া, একটু ঘোমটা কম করিয়া লজ্জায় বড় জড়সড় হইয়া কোন রকমে কিছু বলিল। কিন্তু কথাগুলি এত অস্ফুট যে, ভাণ্ডারী তাহার কিছু শুনিতে পাইল না। ভাণ্ডারী তখন, পাঁচকড়ির মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলে? কিছুই ত শুনিতে পাই না।" তখন পাঁচকড়ির মা কথা বুঝাইয়া দিল। সে বলিল, "উনি বলিতেছেন যে, আমি তোমার হাতে যা দিতেছি, তাহা তোমার মুনিবের হাতে দিও। তিনি যা বলেন আমাকে আসিয়া বলিও। আমি এইখানে আছি।"

এই বলিয়া শ্রী কাঁকালের কাপড় হইতে একটা মোহর বাহির করিল। সেই মোহর পাঁচকড়ির মা, ভাণ্ডারীর হাতে দিল। ভাণ্ডারী লইয়া প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে জীবন দরজার প্রদীপে সেই মোহরটি একবার দেখিল। দেখিল, একটা সোণার আকব্বরী মোহর। কিন্তু তাহাতে একটা ত্রিশূলের দাগ আছে। ভাণ্ডারী মহাশয় স্থির করিলেন, "এ বেটী ত ভিখারী নয়—এই ত আমার মুনিবকে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে। প্রভু আমার ধনবান্, তার মোহরে দরকার কি? এটা জীবন ভাণ্ডারীর পেটারার

মধ্যে প্রবেশ করিলেই শোভা পায়। তবে কি না, যে ত্রিশূলের দাগ দেখিতেছি, এ ধরা পড়া বড় বিচিত্র নহে। ও সব মতিগতি আমার মত দুঃখী প্রাণীর ভাল না—যার ধন তার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই ভাল।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া জীবন ভাণ্ডারী লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক যেখানে প্রভু গদির উপর বসিয়া আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু টানিতেছিলেন, সেইখানে মোহর পৌঁছাইয়া দিল। এবং সবিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদিত হইল।

জীবন ভাণ্ডারীর মুনিব অতি সুপুরুষ। ত্রিশ বৎসরের যুবা, অতি বলিষ্ঠ গঠন, রূপে কার্ত্তিকেয়। তিনি মোহরটি লইয়া দুই চারি বার আলোতে ধরিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দুর্গে! এ কি এ!"

ভাণ্ডারী বলিল, "কি বলিব?"

প্রভু বলিলেন, "যে তোকে মোহর দিয়েছে, তাকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়। সঙ্গে কেহ আছে?"

ভাণ্ডারী মহাশয় তরকারীর কথাটা একেবারে গোপন করিবার মানসে বলিলেন, "এক জন মেছুনি আছে।"

প্রভু। সে যেন আসে না, তুইও পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইবি।

শুনিয়া ভাণ্ডারী বেগে প্রস্থান করিল। এবং অচিরাৎ শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পৃ. ৯, পংক্তি ১৯-২২, "তুমি কে?...সীতারাম রায়।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

আমি সীতারাম রায়—তুমি কে? তোমার মুখে ঘোম্‌টা—কথা কহিতেছ না, আমি চিনিব কি প্রকারে?

পৃ. ৯, পংক্তি ২৪, "এত সুন্দরী!" কথা দুইটি ছিল না।

পংক্তি ২৫-২৬, "শ্রী বলিল...লাগিল।" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

শুনিয়া শ্রী কাঁদিয়া উঠিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ৩-৪, "একবার আবার...অন্য কথা।" এই কথাগুলি ছিল না।

পংক্তি ৬, এই "তৃতীয়" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "চতুর্থ" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণে আর একটি পরিচ্ছেদ ছিল। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ড চারি ছয় পরে, সীতারাম দ্বার খুলিয়া, জীবন ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মৃণ্ময়কে ডাকিয়া আন।"

মৃণ্ময় সীতারামের স্বজাতি ও কুটুম্ব, এবং অতিশয় অনুগত ও বশম্বদ। তবে তাহার আকার এবং অগাধ বল ও সাহস বড় বিখ্যাত ছিল। মৃণ্ময়, তলব মত সীতারামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য ডাকিয়াছেন?"

সীতারাম বলিলেন, "বড় জরুরি কাজ আছে। আমার পরিবারবর্গকে এখান হইতে লইয়া যাইতে হইবে।"

মৃণ্ময়। কবে?

সীতা। আজ রাত্রেই—এখনই।

মৃ। কোথায় নিয়ে যাব?

সীতারাম সে সকল বিষয়ে মৃণ্ময়কে উচিত উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তঃপুরে গেলেন।

অন্তঃপুরে প্রশস্ত চত্বর মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। চারি দিকে রোয়াক। কোথাও বঁটী পাতিয়া বিপুল স্থূল ঘোর.কৃষ্ণাঙ্গী পরিচারিকা মৎস্য জাতির প্রাণাবশিষ্ট সংহারে সমুদ্যত। কোথাও ঘটোঘ্নী গাভী কদলী-পত্রাদি বিমিশ্র উদ্ভিদ প্রভৃতি কবলে গ্রহণ পূর্ব্বক মীলিতলোচনে সুখে রোমন্থ করিতেছে;—পারিসনগরী কবলিত করিয়া চতুর্থ ফ্রেডেরিক্ উইলিয়মের সে সুখ হইয়াছিল কি না জানি না, কেন না তিনি ত রোমন্থ করিতে পারেন নাই। কোথাও কৃষ্ণশ্বেতবর্ণবিমিশ্র মাজ্জার মৎস্যাধারের কিঞ্চিদ্দূরে লাঙ্গুলাসনে অবস্থিত হইয়া মৎস্যকর্ত্তনকর্ত্রীর কিঞ্চিন্মাত্র অনবধানতার প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথাও নিঃশব্দ কুক্কুর অতি ধূর্ত্তভাবে কোন্ ঘরের দ্বার অবারিত তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত। কোথাও বহু বালকগণ একমাত্র অন্ন-পাত্রকে বেষ্টন করিয়া বর্ষীয়সী কুটুম্বিনীর বহুবিধ প্ররোচনে উপশমিত ক্ষুধাতেও আহারে নিযুক্ত। কোথাও অন্য বালকবালিকাসম্প্রদায় কৃতাহার এবং কৃতকার্য্য হইয়া সাতুরে-পাটী পাতিয়া ঈষচ্চঞ্চলশীতলমন্দানিলস্নিগ্ধ-চন্দ্রালোকে শয়ন করিয়া অতি প্রাচীনার নিকট সহস্রবার শ্রুত উপন্যাস পুনঃশ্রবণ করিতেছে। কোথাও নবোঢ়া যুবতী এবং বালিকাগণ বাটনাবাটা কুটনাকোটা দুধজাল ইত্যাদি গৃহকার্য্য উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের কাছে আপনাপন আশা ভরসা, সুখ সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্যের কথা বলিতেছে। এমন সময়ে অকালোদিত-জলদবৎ, উদ্যান-বিহারকালে বৃষ্টিবৎ, দুঃখের চিন্তার কালে অপ্রার্থিত বন্ধুবৎ, নিদ্রাকালে বৈদ্যবৎ, গুরু ভোজনের পর নিমন্ত্রণবৎ এবং অর্থ-শেষ-কালে ভিক্ষুকবৎ, সীতারাম আসিয়া সেখানে দর্শন দিলেন।

"এত কি গোল কচ্চিস্ গো তোরা?" সীতারাম এই কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণকায়াশালিনী মৎস্য-বিধ্বংসিনীর 'মৎস্য-কর্ত্তনশব্দ' সহসা নির্ব্বাপিত হইল। তাহাকে অনাবৃত শিরোদেশে কিঞ্চিন্মাত্র অবগুণ্ঠন সংস্থানের উদ্যোগিনী দেখিয়া, ছিদ্রান্বেষিণী মার্জ্জারী মৎস্যমুণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক যথেপ্সিত স্থানে প্রস্থান করিল। গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র অন্যা পরিচারিকা সেই সুখনিমীলিতনেত্রা কদলীপত্র-ভোজিনী গাভীর প্রতি ধাবমানা হইয়া তাহার প্রতি নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিল। এবং তস্যা স্বামিনীকে চক্ষুরাদি-ভোজিনী ইত্যাদি নবরসাত্মক বাক্যে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিল। উপন্যাস-দত্তমনা পাত্রাবশিষ্টভোজী শিশুগণ অকস্মাৎ উপন্যাসের রসভঙ্গ দেখিয়া আহার্য্যের প্রতি নানাবিধ দোষারোপ পূর্ব্বক অধৌত বদনে দশদিকে প্রস্থান আরম্ভ করিল। যাহারা আহার সমাপন পূর্ব্বক চন্দ্রকিরণ-শীতলশয্যায়

শয়ন করিয়া উপন্যাস শ্রবণ করিতেছিল, তাহারা তাহার অকালে সমাপন দেখিয়া ঘোরতর অসূয়া-সূচক সমালোচনার অবতারণা করিল। উদ্ভিদ্-কর্ত্তন-পরায়ণা সুন্দরীগণ অস্পষ্টালোকে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তথাপি অবগুণ্ঠন দীর্ঘীকৃত করিলেন। যে মেয়েরা বাটনা বাটিতেছিল, তাহারা বড় গোলে পড়িল। এত ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দই বা করি কি করে? আর কাজ বন্ধ করিলেই বা কি মনে করিবেন? আর যাহারা দুগ্ধকটাহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা আরও গোলে পড়িল। তাহারা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় সব দুধটুকু উছলিয়া পড়িয়া গেল।

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কেউ গঙ্গাস্নানে যাবে গা?" অমনি "বাবা আমি যাব," "দাদা আমি যাব," "জ্যাঠা আমি যাব," "মামা আমি যাব," ইত্যাদি শব্দ নানা দিক্ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা, অর্দ্ধবয়স্কা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, পোগণ্ড এবং অপোগণ্ড শিশু, সকলেই এক স্বরে বলিল, "আমি যাব।" অকর্ত্তিত মৎস্য অরক্ষিত হইয়া কুক্কুর এবং বিড়ালের মনোহরণ করিতে লাগিল। যত্ন-প্রস্তুত এবং কর্ত্তিত অলাবু এবং বার্ত্তাকুরাশি রোমন্থশালিনী গাভী জিহ্বা প্রসারণ পূর্ব্বক উদরসাৎ করিতে লাগিল, কেহ দেখিল না। কাহারও দুধ শুকাইয়া গেল, কেহ শিল নোড়া বাঁধিয়া পড়িয়া গেল। কাহারও ছেলে কাঁদিয়া বড় গণ্ডগোল বাধাইল, কিন্তু কিছুতেই কাহারও দৃক্পাত নাই।

সীতারাম বলিলেন, "তবে সকলেই চল। কিন্তু আর সময় নাই, আজ রাত্রে দিন ভাল, খাওয়া দাওয়ার পর সকলকেই যাত্রা করিতে হইবে। অতএব এই বেলা উদ্যোগ কর।"

তৎপরে সীতারাম যথাকালে গৃহিণীর নিকট দেখা দিলেন। গৃহিণী বলিলে একটু দোষ পড়ে; কেন না, গৃহিণী শব্দ এক বচন। এদিকে গৃহিণী, দুইটি। তবে বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই; আর একবারেও দুই গৃহিণীর সাক্ষাৎ হইতে পারে না। এই জন্য বৈয়াকরণদিগের নিকট করযোড়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া আমরা গৃহিণী শব্দই প্রয়োগ করিলাম।

গৃহিণী দুইটি বলিয়া লোকে নাম রাখিয়াছিল, সত্যভামা আর রুক্মিণী। সত্যভামা এবং রুক্মিণীর চরিত্রের সঙ্গে তাহাদের চরিত্রের যে কোন সাদৃশ্য ছিল, এমন আমরা অবগত নহি। তাহাদিগের প্রকৃত নাম নন্দা ও রমা। যাঁহার কাছে এখন সীতারাম আসিলেন, তিনি নন্দা। লোকে বলিত সত্যভামা।

নন্দা অন্তরাল হইতে সব শুনিয়াছিল। সীতারামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ গঙ্গাস্নানের এত ঘটা কেন?"

সীতারাম বলিলেন, "গঙ্গে গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ—"

নন্দা। তা জানি; তিনি মাথায় থাকুন। হঠাৎ তাঁর উপর এ ভক্তি কেন?

সীতা। দেখ, তোমাদের ঐহিক সুখের জন্য আমার যেমন জবাবদিহি, তোমাদের পরকালের সুখের জন্যও আমার তেমনি জবাবদিহি। সামনে একটি যোগ আছে, তোমাদের গঙ্গাস্নানে পাঠাব না?

নন্দা। তুমি যখন কাছে আছ, তখন আবার আমাদের গঙ্গাস্নান কি? তুমিই আমাদের সকল তীর্থ। তোমার পাদোদক খাইলেই আমার এক শ গঙ্গাস্নানের ফল হইবে। আমি যাব না।

সীতা। (সত্যভামার নিকট হার মানিয়া) তা তুমি না যাও না যাবে, যারা যেতে চায়, তারা যাক্।

নন্দা। তা যাক্। সবাই যাক্, আমি একা থাকিব. একটু ভূতের ভয় করিবে, তা কি করিব? কিন্তু আসল কথা কি, বল দেখি?

সীতা। আসল আর নকল কিছু আছে না কি?

নন্দা। তুমি ত ভাজ পটল, বল উচ্ছে।

সীতা। তবু ভাল, উচ্ছে ভেজে ত পটল বলি না?

নন্দা। তা বল না, কিন্তু আমাদের কাছে দুই সমান; লুকোচুরিতেই প্রাণ যায়। ভিতরের কথা কি বলিবে?

সীতা। বলিবার হইত ত বলিতাম।

অমনি নন্দার মুখখানা মেঘঢাকা মেঘঢাকা আকাশের মত, জলভরা জলভরা ফোটা পদ্মটার মত, হাই দিলে আরসি যেমন হয়, সেই মত এক রকম কি হইয়া গেল। একটু ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে নন্দা বলিল, "তা নাই বলিলে, তা সন্ধ্যার পর তোমার কাছে কে এসেছিল, সেইটা বল?"

সীতা। তা ঢের লোক ত আমার কাছে আসে। সন্ধ্যার পর অনেক লোক এয়েছিল।

নন্দা। মেয়েমানুষ কে এয়েছিল?

সীতা। তাও ত ঢের আসে। খাজনা মিটাতে, ভিক্ষা মাঙ্গ্‌তে, দায়ে অদায়ে পড়িয়া ঢের মাগী ত আমার কাছে আসে। স্ত্রীলোক প্রায় সন্ধ্যার পরই আসে।

নন্দা। আজ সন্ধ্যার পর কজন স্ত্রীলোক এয়েছিল?

সীতা। মোটে এক জন।

নন্দা। সে কে?

সীতা। তার ভাই বাঁচে না।

নন্দা। তা নয়—সে কে? নাম কি?

সীতা। আর এক দিন বলিব।

এইবার মেঘ বর্ষিল, দর্পণস্থ বাষ্পরাশি জলবিন্দুতে পরিণত হইল,—সত্যভামা কাঁদিল।

তখন সীতারাম নন্দার চিবুক গ্রহণ পূর্ব্বক বড় মধুর আদর করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যেখানে রমা ঠাকুরাণী দর্পণ লইয়া সরু সরু কালোকুচ্‌কুচে চুলের দড়িগুলি গুচাইতেছিলেন, সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। রমা কনিষ্ঠা,—নন্দার অপেক্ষা একে বয়সে ছোট, আবার আকারেও ছোট, সুতরাং নন্দার অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। নন্দার যৌবন এবং রূপ উভয়ই পরিপূর্ণ, শ্রাবণের গঙ্গা,—রমার দুইই অপরিপূর্ণ, বসন্তনিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী ক্ষুদ্রা কল্লোলিনী। নন্দা তপ্তকাঞ্চনবৎ শ্যামাঙ্গ—রমা হিমানী-প্রতিফলিত কৌমুদীবৎ গৌরাঙ্গী। সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। বলিলেন, "রুক্মিণি! গঙ্গাস্নানের কথা শুনেছ?"

রমা। ছি ছি, ও কি কথা!

সীতা। কোন্‌টা ছি ছি? গঙ্গাস্নান ছি ছি? না রুক্মিণী ছি ছি?

রমা। তাঁরা হোলেন দেবতা, লক্ষ্মী,—আর সেই একটা কি নাম মনে আসে না—

সীতা। শিশুপালের গল্পটা বটে? তা সে কথা রহিল। গঙ্গাস্নানের কথাটা কি? শুনেছ?

রমা। শুনেছি বৈ কি।

সীতা। যাবে?

রমা। তাই ত চুলের দড়ি গোছাচ্ছি।

সীতা। কেন যাবে? এই ত আমি তোমার সর্ব্বতীর্থ কাছে আছি।

রমা। যেতে না বল, যাব না।

সীতা। তবে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে কেন?

রমা। যাইতে বলিতেছিলে বলিয়া।

সীতা। আমি ত যাইতে বলি নাই—আমি কেবল সবাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে, কেহ যাবে? তা তুমি যাবে কি?

রমা। তুমি যাবে কি?

সীতা। যাব।

রমা। তবে আমিও যাব।

সীতা। কিন্তু আজ আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। কাল পথে মিলিব।

রমা। আজ আমাদের নিয়ে যাবে কে?

সীতা। মৃণ্ময় নিয়ে যাবে।

রমা। তা হোক্। একটা কথা বলিবে?

সীতা। কি?

রমা। তোমার কি কাজ?

সীতা। সব কথা কি বলা যায়?

রমা। (সীতারামকে উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া) বলিতে হইবে। তোমার বড় সাহস, আমার বড় ভয় করে, তুমি কোন দুঃসাহসের কাজ করিবে,—তাই আমাদের সরাইয়া দিতেছ।

সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া রমার খোঁপা ধরিয়া টানিল, মারিবার জন্য এক চড় উঠাইল, শেষে রমার নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। বলিল, "আমি বড় দুঃসাহসের কাজ করিব সত্য, কিন্তু কোন ভয় নাই।"

রমা। তোমার ভয় নাই—আমার আছে। তোমার ভয় আমার ভয় কি স্বতন্ত্র? শোন, আজ সবার গঙ্গাস্নান যাওয়া বন্ধ। তুমি আজ আমার এই ঘরের ভিতর কয়েদী।

বলিতে বলিতে রমা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল। বলিল, "যাইতে হয়, আমার গলায় পা দিয়া যাও। এখন বল দেখি, আজ তোমার কাছে কে আসিয়াছিল?"

সীতা। তোমাদের কি অষ্ট প্রহর চর ফেরে নাকি?

রমা। ভাণ্ডারী মহাশয় কিছু তরকারির প্রত্যাশায় বঞ্চিত হয়েছেন, তাই আমরা ও কথাটাও শুনিয়াছি। সে কে?

সীতা। শ্রী।

রমা। সে কি? শ্রী? কেন আসিয়াছিল?

সীতা। তার একটি ভিক্ষা ছিল।

রমা। ভিক্ষা পাইয়াছে কি?

সীতা। তুমি কি ভিক্ষুককে ফিরাইয়া থাক?

রমা। তবে ভিক্ষা সে পাইয়াছে। কি দিলে?

সীতা। কিছু দিই নাই, দিব স্বীকার করিয়াছি।

রমা। কি দিবে শুনিতে পাই না?

সীতা। এখন না, দ্বার ছাড়।

রমা। সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে, আমি দ্বার ছাড়িব না।

সীতা। তবে শুন, কাজি সাহেব শ্রীর ভাইকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছেন। শ্রীর ভিক্ষা, আমি তাহার ভাইকে রক্ষা করি। আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি।

রমা। তাই, আমরা আজ গঙ্গাস্নানে যাইব! তুমি আমাদের পাঠাইয়া দিয়া, নির্ব্বিঘ্নে ফৌজদারের ফৌজের সঙ্গে লাঠালাঠি দাঙ্গা করিবে।

সীতা। সে সকল কথায়, মেয়ে মানুষের কাজ কি?

রমা। কাজ কি? কিছুই কাজ নাই। তবে কি না, আমি গঙ্গাস্নানে যাইব না।

এই বলিয়া রমা, ভাল করিয়া দ্বার চাপিয়া বসিল। সীতারাম অনেক মিনতি করিতে লাগিল। রমা বলিল, "তবে আমারও কাছে একটা সত্য কর, দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি।"

সীতা। কি বল?

রমা। তুমি বিনা বিবাদ বিসম্বাদে—দাঙ্গা লড়াই না করিয়া শ্রীর ভ্রাতার জন্য যাহা পার, কেবল তাহাই করিবে, ইহা স্বীকার কর।

সীতা। তাতে আমি খুব সম্মত। দাঙ্গা লড়াই, আমার কাজও নয়, ইচ্ছাও নয়। কিন্তু যত্ন সফল হইবে কি না, সন্দেহ।

রমা। হোক্ না হোক্—বিনা অস্ত্রে যা হয়, কেবল তাই করিবে, স্বীকার কর।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সীতারাম বলিলেন, "স্বীকার করিলাম।"

রমা প্রসন্নমনে, দ্বার ছাড়িয়া দিল। বলিল, "তবে আমরা গঙ্গাস্নানে যাইব না।"

সীতারাম ভাবিলেন। বলিলেন, "যখন কথা মুখে আনা হইয়াছে, তখন যাওয়াই ভাল।"

রমা বিষণ্ণ হইল, কিন্তু আর কিছু বলিল না। সীতারাম আর কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না।

পৃ. ১১, পংক্তি ১২-১৫, "আমরা আজিকার...কিছু ক্ষণ পরে" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

সীতারাম একখানি ভাল বাড়ী তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন।

পৃ. ১১, পংক্তি ১৭-২০, "কথাবার্ত্তার ফল...পাঠাইয়া দিলেন।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

চন্দ্রচূড়ের কাছে লুকাইবার যোগ্য সীতারামের কোন কথাই ছিল না। শ্রীর কাছে আর রমার কাছে যে দুইটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সীতারাম তাহা সবিস্তারে নিবেদিত হইলেন। বলিলেন, "এই উভয় সঙ্কটে কি প্রকারে মঙ্গল হইবে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। নারায়ণ মাত্র ভরসা। মারামারি কাটাকাটিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। আমি সেই জন্যই মৃন্ময়কে সরাইয়াছি। কিন্তু স্তুতি মিনতিতেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এমন ভরসা করি না। যাই হৌক, প্রাণপাত করিয়াও আমি এ কাজ উদ্ধার করিতে রাজি আছি। সিদ্ধি আপনার আশীর্ব্বাদ। যদি সিদ্ধি না হয়, তবে পাপশান্তির জন্য কাল প্রাতে তীর্থযাত্রা করিব। তাই আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।"

চন্দ্রচূড়। আমি সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি, এখনও করিতেছি, মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি এই রাত্রেই কি তুমি কাজির নিকট যাইবে?

সীতা। না। কাল উপযুক্ত সময়ে কাজির নিকট উপস্থিত হইব।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, সহজ লোক নহেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "বাবাজি একটু গোলে পড়িয়াছেন, দেখিতেছি। যুদ্ধ বিগ্রহে যে ইচ্ছা নাই, সে কথাটা মনকে চোক্-ঠারাই বোধ হইতেছে। সেই রুক্মিণী বেটীই যত নষ্টের গোড়া। তা বেটী মনে করে কি, রুক্মিণী আছে, নারদ নাই! জাত নেড়ে, বাপু বাছার কি কাজ! নারায়ণ কি নেড়ের দমন করিবেন না? কত কাল আর হিন্দু এ অত্যাচার সহ্য করিবে? একবার দেখি না, সীতারামের বাহুতে বল কত? বৃথাই কি নারায়ণকে তুলসী দিই?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তর্কালঙ্কার বলিলেন, "তুমি তীর্থযাত্রা করিবে, এবং পরিবারবর্গকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইবে শুনিয়া, আমি বড় বিপন্ন হইলাম।"

সীতা। কি? আজ্ঞা করুন।

চন্দ্র। আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ কোন যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহাতে এক সহস্র রৌপ্যের প্রয়োজন। তাই বা আমায় দিবে কে? উদ্যোগই বা করিয়া দেয় কে?

সীতা। টাকা এখনই আনাইয়া দিতেছি। আর উদ্যোগের জন্য কাহাকে চাই?

চন্দ্র। যজ্ঞের যে সকল আয়োজন করিতে হইবে, জীবন ভাণ্ডারী তাহাতে বড় সুপটু। জীবন ভাণ্ডারীকেও আনাইয়া দাও। আমার এই তল্পিদার ভৃত্য রামসেবক বড় গুণবান্ আর বিশ্বাসী। তার হস্তে খাজাঞ্চিকে পত্র পাঠাইয়া দাও, টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীকে আনিবে।

সীতারাম তখন একটু কলাপাতে বাঁকারির কলমে খাজাঞ্চির উপর এক হাজার টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীর জন্য চিঠি পাঠাইলেন। রামসেবক তাহা লইয়া গেল। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন সীতারামকে বলিলেন, "এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, মঙ্গল হইবে।"

তখন সীতারাম গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে অনতিবিলম্বে জীবন ভাণ্ডারী সহস্র রৌপ্য লইয়া আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রদান করিল। তর্কালঙ্কার বলিলেন, "কেমন জীবন! এ সহরে তোমার মুনিবের যে যে প্রজা, যে যে খাতক আছে, সকলের বাড়ী চেন ত?"

জীবন। আজ্ঞা হাঁ, সব চিনি।

চন্দ্র। আজ রাত্রে সব আমায় দেখাইয়া দিতে পারিবে ত?

জীবন। আজ্ঞা হাঁ, চলুন না। কিন্তু আপনি এত রাত্রে সে সব চাঁড়াল বাগ্দীর বাড়ী গিয়া কি করিবেন?

চন্দ্র। বেটা, তোর সে কথায় কাজ কি? তোর মুনিব আমার কথায় কথা কয় না,—তুই বকিস্! আমি যা বলিব, তাই করিবি, কথা কহিবি না।

জীবন। যে আজ্ঞা, চলুন। এ টাকা কোথায় রাখিব?

চন্দ্র। টাকা সঙ্গে নিয়ে চল্। আমি যা করিব, তা যদি কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিস্, তবে তোর শূল-বেদনা ধরিবে—আর তুই শিয়ালের কামড়ে মরিবি।

এখন জীবন ভাণ্ডারী শূল-বেদনা এবং শৃগাল এ উভয়কেই বড় ভয় করিত—সুতরাং সে ব্রহ্মশাপ ভয়ে আর দ্বিরুক্তি করিল না। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন পূজার ঘর হইতে এক আঁজলা প্রসাদী ফুল নামাবলীতে লইয়া জীবন ভাণ্ডারী ও সহস্র রৌপ্য সহায় হইয়া বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া জীবন ভাণ্ডারী একটা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই এক জন।"

চন্দ্র। এর নাম কি?

জীবন। এর নাম যুধিষ্ঠির মণ্ডল।

চন্দ্র। ডাক তাকে।

তখন জীবন ভাণ্ডারী "মণ্ডলের পো! মণ্ডলের পো!" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে ডাকিল। যুধিষ্ঠির বলিল, "কে গা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন; "কাল গঙ্গারাম দাসের জীয়ন্তে কবর হইবে শুনিয়াছ?"

যুধিষ্ঠির। শুনিয়াছি।

চন্দ্র। দেখিতে যাইবে?

যুধিষ্ঠির। নেড়ের দৌরাত্ম্য, কি হবে ঠাকুর, দেখে?

চন্দ্র। দেখিতে যাইও। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর হুকুম। এই হুকুম নাও।

এই বলিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর একটি প্রসাদী ফুল নামাবলী হইতে লইয়া যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে। যাইব।"

চন্দ্র। তোমার হাতিয়ার আছে?

যুধি। আজ্ঞে, এক রকম আছে। মুনিবের কাজে মধ্যে মধ্যে ঢাল শড়কী ধরিতে হয়।

চন্দ্র। লইয়া যাইও। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর হুকুম। এই হুকুম লও।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার জীবন ভাণ্ডারীর থলিয়া হইতে একটি টাকা লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিলেন।

যুধিষ্ঠির টাকা লইয়া—মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে, অবশ্য লইয়া যাইব। কিন্তু একটা কথা বলিতেছিলাম কি—একা যাব?"

চন্দ্র। কাকে নিয়ে যেতে চাও?

যুধি। এই পেসাদ মণ্ডল জোয়ানটাও খুব, খেলোয়াড়ও ভাল—সে গেলে হইত।

তখন চন্দ্রচূড় আরও কতকগুলি প্রসাদী ফুল ও টাকা যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। বলিলেন, "যত লোক পার, লইয়া যাইও।"

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর সেখান হইতে জীবন ভাণ্ডারীর সঙ্গে গৃহান্তরে গমন করিলেন। সেখানেও ঐরূপ টাকা ও ফুল বিতরণ করিলেন। এইরূপে সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়া রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীতে রমাতে সে রাত্রে এমনই আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল।

পৃ. ১১, পংক্তি ২১, এই "চতুর্থ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "পঞ্চম" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ১৩, পংক্তি ৫, এই পংক্তির শেষে ছিল—

তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যে পথে শ্রীকে নগর হইতে প্রান্তরে আসিতে হইবে, সেই পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্রীকে দেখিয়া উপযাচক হইয়া তাহার সহায় হইয়াছিলেন। শ্রী তাঁহাকে চিনিত, তিনিও শ্রীকে চিনিতেন। সে পরিচয়ের কারণ পরে জানা যাইতে পারে।

পৃ. ২০, পংক্তি ১৭, এই "পঞ্চম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "ষষ্ঠ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ২১, পংক্তি ১৬-১৭, "করিলেন। গঙ্গারাম সীতারামের" এই কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

করিয়া বলিলেন, "আমি এখন ফৌজদারের কাছে যাইব—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

গঙ্গারাম সীতারামের কথা শুনিয়া না হউক,

পৃ. ২১, পংক্তি ১৯, "চন্দ্রচূড়···শ্রী এদিকে" এই পংক্তিটির পরিবর্ত্তে ছিল—

এদিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর মূর্চ্ছিতা শ্রীকে "ঝাড় ফুঁক" করিতেছিলেন। যদি সভ্য ভাষায় বলিতে হয়, বল, মেস্মেরাইস্ করিতেছিলেন। পরে শ্রী, যে কারণেই হউক,

পৃ. ২১, পংক্তি ২১, এই পংক্তির শেষে ছিল—

তার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

সে কিছু দূর গেলে সীতারাম চন্দ্রচূড়কে বলিলেন, "আপনি ওঁর পিছু পিছু যান। ওঁর যাহাতে রক্ষা হয়, সে ব্যবস্থা করিবেন। আপনাকে বেশী বলিতে হইবে না।"

চন্দ্র। আর তুমি এখন কি করিবে?

সীতা। তাহা স্থির করি নাই। আপনি শ্যামপুরে গমন করুন। যদি জীবিত থাকি, সেইখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

শুনিয়া চন্দ্রচূড়, বিষণ্ণমনে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। গুরু শিষ্য, পরস্পরকে ভাল চিনিতেন। সুতরাং চন্দ্রচূড় কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

সকলেই চলিয়া গেল। মাঠে আর কেহ নাই। কেবল একা সীতারাম—সেই বৃক্ষমূলে, যে ডালের উপর চণ্ডীমূর্ত্তি শ্রী দাঁড়াইয়া রণজয় করিয়াছিল, সেই ডাল ধরিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া সীতারাম একা। আমাদের সকলেরই কখনও কখনও এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন এক মুহূর্ত্তের দ্বারা সমস্ত জীবন শাসিত হয়। সীতারামের তাই হইল। ভাবিতেছিলেন, এ কাণ্ড কি? কেন হইল? কে করিল? ভাল হইয়াছে কি? ইহার কারণ কি? উপায় কি? কিসের লক্ষণ?

যে দিকে সীতারাম মনশ্চক্ষু ফিরান, সেই দিকে দেখিতে পান, **মুসলমানের অত্যাচার!**

সুরাসুর মনে পড়িল। বৃত্র, সম্বর, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ, বলি, প্রহ্লাদ, বিরোচন—কে মারিল? কেন মরিল? কেনই বা হইল? কেনই মরিল?

তাহার পর রাক্ষস—মানুষ, ইহাদের কথা মনে পড়িল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, অলম্বুষ, হিড়িম্ব, বক, ঘটোৎকচ, দন্তবক্র, শিশুপাল, একলব্য, দুর্য্যোধন, কংস, জরাসন্ধ, কে মারিল? কেন মরিল? নহুস কেন অজগর হইল?

শেষ মনে মনে স্থির হইল, সেই দুর্দ্দমনীয় মানসিক স্রোতের প্রক্ষিপ্ত সার এই পাইলেন—**দেব।** দেব—অর্থে ধর্ম্ম।

তখন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সীতারামের মনের ভিতর উপস্থিত হইল। যেমন আলোক দেখিতে দেখিতে চোখ বুজিলে, তবু অন্ধকারের ভিতর একটু রাঙ্গা রাঙ্গা ছায়া দেখা যায়, প্রথমে মনে হয়, ভ্রম মাত্র, তার পর বুঝা যায় যে, ভ্রম নয়, সত্য আলোকের ছায়া—সীতারাম সেই রকম একটু রাঙ্গা ছায়া দেখিলেন মাত্র। তার পর, যেমন, বনস্থ ভূপতিত পত্ররাশি মধ্যে প্রথম যেন একটু খদ্যোতোন্মেষবৎ অগ্নি দেখা যায়, বড় ক্ষীণ বটে, কিন্তু তবু আলো, তেমনি আলো বলিয়া, সীতারামের বোধ হইল। হায়! হৃদয়ের ভিতর আলো কি মধুর! কি স্বর্গ! অথবা স্বর্গ ইহার কাছে কোন্ ছার! যে একবার, আপনার হৃদয়ে আলো দেখিয়াছে, সে আর ভুলে না! জগতের সার সুখ প্রতিভা। প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।

জোনাকির মত তেমনি একটা আলোক, সীতারাম, আপনার হৃদয়মধ্যে দেখিলেন। যেমন বনতলস্থ শুষ্ক পত্ররাশি মধ্যে সেই খদ্যোতবৎ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, ক্রমে একটু একটু করিয়া বাড়ে, ক্রমে একটু একটু করিয়া জ্বলে, সীতারামও আপনার হৃদয়ে তাই দেখিলেন। দেখিলেন, ক্রমে অনেক শুষ্ক পত্র ধরিয়া গেল, ক্রমে সেই অন্ধকার বন আলো হইতে লাগিল। ক্রমে সে শ্যামল পল্লবরাশি শ্যামলতা হারাইয়া

উজ্জ্বল. হরিৎ প্রভা প্রতিহত করিতে লাগিল,—ফুলে, ফলে, পাতায়, লতায়, কাণ্ডে, দণ্ডে, উজ্জ্বল জ্বালা কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে সব আলো—শেষ ঘোর দাবানল, সব অগ্নিময়, শত সূর্য্য-প্রকাশ! তখন সীতারাম বুঝিলেন, হৃদয়ের সে আলোটা কি। বুঝিলেন, হৃদয়ে সহসা যে প্রভাকর উদিত হইয়াছে, তাহার নাম—

ধর্ম্ম-রাজ্য-স্থাপন!

বুঝিলেন, এই সূর্য্যে সকল অন্ধকার মোচন করিবে।

সীতারাম বুঝিবামাত্র ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। প্রতিভা কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ধৈর্য্য রক্ষা করে! প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করিয়া, বলিলেন, "এই বাহু! ইহাতে কি বল নাই? কে এমন তরবারি ধরিতে পারে? কাহার বন্দুকের এমন লক্ষ্য! কাহার মুষ্টিতে এত জোর! এ রসনায় কি বাগেদবীর প্রসাদ নাই? কে লোকের এমন মন হরণ করিতে পারে! আমি কি কৌশল জানি না—"

সহসা যেন সীতারামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। হৃদয়ের আলো একেবারে নিবিয়া গেল! "এ কি বলিতেছি! আমি কি পাগল হইয়াছি! আমি কি করিতেছি! আমি কে! আমি কি! আমি ত একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা—সমুদ্র-তীরের একটি বালি! আমার এত দর্প! এই বুদ্ধিতে সাম্রাজ্যের কথা আমার মনে আসে! দিক্ মনুষ্যের বুদ্ধিতে!"

তখন সীতারাম কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অনন্ত, অব্যয়, নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন, "তিনিই বল! তিনিই বাহুবল! তিনিই ধর্ম্ম! ধর্ম্মচ্যুত যে বাহু-বল, তাহা পরিণামে দুর্ব্বলতা। সীতারাম তখন বুঝিলেন,

ধর্ম্মই ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপায়।

সীতারামের হৃদয়, অতিশয় স্নিগ্ধ, সন্তুষ্ট ও শীতল হইল।

তখন প্রান্তর পানে চাহিয়া সীতারাম দেখিলেন, মাঠ অশ্বারোহী মুসলমান-সেনায় ভরিয়া গিয়াছে।

পৃ. ২১, পংক্তি ২২, এই "ষষ্ঠ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দশম" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণে আরও তিনটি পরিচ্ছেদ ছিল। নিম্নে সেগুলি মুদ্রিত হইল।—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুসলমান সেনা নির্গমের পূর্ব্বেই ফৌজদারের হুজুরে সম্বাদ পৌঁছিল যে, বিদ্রোহীরা পলাইয়াছে। অতএব এক্ষণে যুদ্ধার্থে সেনা নির্গত না হইয়া কেবল বিদ্রোহীর ধৃতার্থ অশ্বারোহী সেনাগণ নির্গত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সেনা প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও না দেখিয়া, কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ

নগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছিল। তাহারই এক জন সীতারামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "তোম্ কোন্?"

সীতা। মনুষ্য।

সিপাহী। সো তো দেখ্‌তে হেঁ। নাম কিয়া তোমার?

সীতা। কি কাজ বাপু তোমার নামে?

সিপাহী। তোম্ বদমাস্।

সীতা। হবে।

সিপাহী। খানাবদোষ।

সী। সম্ভব।

সি। ডাকু হো?

সী। বোধ হয় কি?

সি। চোট্টা হোগে।

সী। দিল্লীর বাদশাহের চেয়ে?

সি। কিয়া বোলো?

সী। বলি তুমি আমায় দিক্ করিতেছ কেন?

সি। তোম্‌কো গিরেফ্‌তার কোরেঙ্গে?

সী। আপত্তি কি?

সি। চল্।

সী। কোথায়?

সি। ফাটক্‌মে।

সী। চল। কিন্তু তুমি ত ঘোড়ায়। আমি হাঁটিয়া তোমার সঙ্গে যাইব কি প্রকারে?

সি। কদম কদম আও।

সিপাহী সাহেব কদম কদম চলিলেন। সীতারাম সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সিপাহী এক জন পাইকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে হুকুম দিলেন যে, "এই ব্যক্তি চোর, ইহাকে ফাটকের জমাদ্দারের কাছে পঁহুছাইয়া দিবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার শ্রীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাহাকে লইয়া এক নিভৃত ক্ষুদ্র বাটিকা মধ্যে গমন করিলেন, বলিলেন, "আইস বাছা! এখানে বড় জাগ্রত কালী আছেন, প্রণাম করিয়া যাই। তিনি মঙ্গল করিবেন।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রী দেখিলেন, গৃহ বড় নিভৃত, তাহার এক ঘরে এক কালী মূর্ত্তি, ফুল বিল্বপত্রে অর্দ্ধেক ঢাকা পড়িয়া আছেন। গৃহে কেহ নাই, কেবল এক অশীতিপর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। তিনিই দেবীর অধিকারিণী। চন্দ্রচূড়কে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "তর্ক বাবা যে গো?"

চন্দ্র। কেমন মা? মার পূজা চলিতেছে কেমন?

অশীতিপর বৃদ্ধার শ্রবণেন্দ্রিয় বড় তীক্ষ্ণ নহে। সে শুনিল, "তোমার বোন্‌পো আছে কেমন?" উত্তরে বলিল, "আজও জ্বর সারে নাই, তার উপর পেটের ব্যামো, মা কালী রক্ষা করিলে হয়।" চন্দ্রচূড় এইরূপ দুই চারিটা কথাবার্ত্তা বৃদ্ধার সঙ্গে কহিবাতে শ্রী বুঝিল—বুড়ী ঘোর কালা। চন্দ্রচূড় তখন শ্রীকে বলিলেন, "এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ঘরে তুমি আজ কাল থাক। তার পর গঙ্গারাম সুস্থির হইলে, আমি তোমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইব। তোমার নিজ বাড়ীতে এখন একা থাকিবে কি প্রকারে? বিশেষ মুসলমানের ভয়।"

শ্রী। ঠাকুর! মুসলমানের এ দৌরাত্ম্য কত কাল আর থাকিবে? শাস্ত্রে কি কিছু নাই?

চন্দ্র। কিছু না, মা। এ শাস্ত্রের কথা নয় মা। হিন্দুর গায়ে বল হইলেই হইল।

শ্রী। ঠাকুর! হিন্দুর গায়ে বলের কি অভাব? এই ত এখনই দেখিলেন?

বলিতে বলিতে শ্রী, দৃপ্তা সিংহীর মত ফুলিয়া উঠিল।

চন্দ্র। যা দেখিলাম মা, সে তোমারই বল—এমন কি আবার হইবে?

দৃপ্তা সিংহী লজ্জায় মুখ অবনত করিল। আবার মুখ তুলিয়া বলিল, "হিন্দুর গায়ে বলের এত অভাব কেন? কত লোকের বলের গল্প শুনি।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় শ্রীর অলক্ষ্যে, শ্রীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "বেশ বাছা, বেশ! আমার মনের মত মেয়ে তুমি। আমিও সেই কথাটা ভাবিতেছিলাম।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "হিন্দুর মধ্যে বলবান্ কি নাই? আছে বৈ কি। কিন্তু তাহারা মুসলমানের মুখ চায়। এই দেখ সীতারাম—সীতারাম না পারে কি? কিন্তু সীতারাম রাজভক্ত—বাদশাহের অনুগৃহীত—অকারণে রাজদ্রোহী হইবে না। কাজেই কে ধর্ম্ম রক্ষা করে?"

শ্রী। কারণ কি নাই?

জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রী আবার লজ্জায় মুখ নামাইল। বলিল, "আমি অবলা—আপনাকে কেন এত জিজ্ঞাসা করিতেছি, জানি না,—আমার মার শোকে ভাইয়ের দুঃখে মন কেমন হইয়া গিয়াছে—তাই আমার জ্ঞান বুদ্ধি নাই।"

চন্দ্রচূড় সে কৈফিয়ৎটা কানেও না তুলিয়া, বলিলেন, "কারণ ত ঘটে নাই। ঘটিলে কি হইবে বলিতে পারি না। সীতারাম যত দিন মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার প্রাপ্ত না হয়েন, বোধ হয় তত দিন তিনি রাজদ্রোহ-পাপে সম্মত হইবেন না।"

শ্রী অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। চাতক পক্ষী যেমন মেঘের প্রতি চাহিয়া থাকে, ততক্ষণ চন্দ্রচূড় তাহার মুখ প্রতি সেইরূপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। শ্রী বহুক্ষণ অন্যমনা হইয়া ভাবিতেছে,

সংজ্ঞালক্ষণ নাই দেখিয়া, শেষে চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তবে তুমি এক্ষণে এখানে বাস কর, আমি এখন যাই।"

শ্রী কোন উত্তর করিল না—কথা তাহার কানে গিয়াছে, এমনও বোধ হইল না। চন্দ্রচূড় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—প্রতিভা কখন ফুটে, কখন নিবে, কখন স্থির, কখন আন্দোলিত, চন্দ্রচূড় তাহাকে চিনিতেন, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষায় নীরবে শ্রীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। শেষ দেখিলেন, শ্রী সুস্থিরা, প্রফুল্লমুখী, ভাস্বর-কটাক্ষবিশিষ্টা হইল। তখন বুঝিলেন, এবার মেঘ বারিবর্ষণ করিবে—চাতকের তৃষা ভাঙ্গিবে।

শ্রী অল্প ঘোমটা টানিয়া,—অল্প সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর! এখন কি একবার সে মাঠে যাওয়া যায় না?"

চন্দ্র। কেন? সেখানে এখন বিশেষ ভয়—চারি দিকে ফৌজ বেড়াইতেছে।

শ্রী। আমি সেখানে একটা কোন বিশেষ সামগ্রী হারাইয়া আসিয়াছি—আমার না গেলেই নয়। আপনি না হয় এইখানে থাকুন, আমি একা যাইতেছি। কিন্তু আপনি আসিলে ভাল হইত।

চন্দ্র। যে সাহস তোমার আছে, সে সাহস কি আমার নাই? চল, তোমার সঙ্গে যাইব।

তখন, শ্রী আগে আগে, চন্দ্রচূড় পিছে পিছে সেই মাঠে চলিলেন। সেখানে অনেক অশ্বারোহী পদাতিক বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল—এক জন আসিয়া চন্দ্রচূড়কে ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ কোন্ হো?"

চন্দ্র। ~~ঐই ত~~ দেখিতেছ—ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। যজমানের বাড়ী পার্ব্বণের শ্রাদ্ধ—তাই গ্রামান্তরে যাইতেছি। কি করিতে হইবে বল—করি।

সিপাহী। আচ্ছা, তোম্ যাও—তোম্‌কো ছোড় দেতেহেঁ। য়েহি আবরৎ* তোমারা কোন্ লগ্‌তী?

চন্দ্র। না বাপু—ও আমার কেহ হয় না।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় শ্রীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, জানেন, এখন শ্রীর বুদ্ধিতে চলিতে হইবে।

তখন সিপাহী শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ কোন্ হো? বোল্‌কে ঘর যাও। হম্‌লোগোঁকো হুকুম নেহি হৈ কে আবরৎকে পকড়েঁ। স্রেফ্ এক বেওয়াকো হম্‌লোগ্ ঢুণ্ড্‌তে হেঁ।"

শ্রী। যে ঐ গাছের উপর দাঁড়াইয়া তোমাদের দুর্দ্দশা করিয়াছিল?

সিপাহী। হাঁ—হাঁ—চন্দী বস্‌কী নাম হৈ।

শ্রী। চণ্ডী নাম নয়। চণ্ডী নাম হউক—আর যাই নাম হউক—আমিই সেই হতভাগিনী।

সিপাহী। (শিহরিয়া) কিয়া!!!

শ্রী। আমিই সেই হতভাগিনী।

---

* হিন্দিতে স্থানবিশেষে য y মত ও ব w মত উচ্চারিত হইবে।

সি। তোবা!! বেস। মৎ বোলো মায়ি! তোম্ ঘর্ যাও।

শ্রী। তোমার কল্যাণ হউক—আমি ঘরে চলিলাম।

এমন সময়ে, আর এক জন সিপাহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আরে আবরংকো পকড়্তে হো কাহে?"

প্রথম সিপাহী দেখিল বিপদ্। যদি দ্বিতীয় সিপাহীর সঙ্গে স্ত্রীলোকটার কথাবার্ত্তা হয়, আর স্ত্রীলোকও যদি স্বীকার করে, তবে সিপাহী বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা—প্রধান বিদ্রোহিণীকে ছাড়িয়া দেওয়ার অভিযোগ তাহার নামে হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব সেই দয়ার্দ্র সিপাহী অগত্যা বলিল, "যেস্থি তোম্ চুণ্ডুকে সো যেহি হোতী হৈ।"

দ্বিতীয় সিপাহী। আল্লা আকবর! চলো, চলো, বস্কী হুজুরমে লে চলো—হম্ দোনোকে বখ্সিস্ মিল্ যায়েগা।

প্রথম সিপাহী। ভাই! তোম্ লে যাও! হমারা কুছ কাম হৈ।

দ্বিতীয় সিপাহী এ কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল—শ্রীর ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া লইয়া চলিল। প্রথম সিপাহী বড় বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই জনের নাম দুইটা বলা যাক—প্রথমের নাম, খয়ের আলি দ্বিতীয়, পীর বক্স।

সিপাহীর কাছে ঘাড়-ধাক্কা খাইয়া শ্রী মৃদু হাসিল। তখন সে ডাকিয়া, চন্দ্রচূড়কে বলিল, **"ঠাকুর! যদি আমার স্বামীকে চেনেন, তবে বলিবেন, আমার উদ্ধার তাঁহার কাজ।"**

শুনিয়া চন্দ্রচূড়ের চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, তুমিই ধন্যা!"

নবম পরিচ্ছেদ

সিপাহীরা পালে পালে বিদ্রোহী ধরিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা লাঠি চালাইয়াছিল, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তামাসা দেখিতে লাগিল। যাহারা ধৃত হইল, তাহারা প্রায় নির্দ্দোষী। লোক ধরিয়া আনিতে হইবে, কাজেই সিপাহীরা যাহাকে পাইল, তাহাকে ধরিয়া আনিল। দোষীরা সাবধান ছিল, তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। নির্দ্দোষীরা সতর্ক থাকা আবশ্যক বিবেচনা করে নাই—তাহারা ধৃত হইতে লাগিল। কেহ হাঁ করিয়া সিপাহী দেখিতেছিল, অতি সাহসী বলিয়া সে ধৃত হইল। কেহ সিপাহী দেখিয়া ভয়ে পলাইল, যে পলায় সে দোষী বলিয়া ধৃত হইল। কেহ সিপাহীর প্রশ্নে চোট্‌পাট উত্তর দিল, সে চতুর, কাজেই "বদমায়" বলিয়া ধৃত হইল। কেহ কোন উত্তর দিতে পারিল না,—অপরাধীই নিরুত্তর হয়, এই বলিয়া সেও ধৃত হইল। কেহ দুর্ব্বল, তাহাকে ধৃত করার কোন কষ্ট নাই, সিপাহীরা অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ধৃত করিলেন, কেহ বলবান, কাজেই দাঙ্গাবাজ, সেও ধৃত হইল। কেহ দরিদ্র, দরিদ্রেরাই বদমায হইয়া থাকে, এজন্য সে ধৃত হইল, কেহ ধনী, ধনীরা টাকা দিয়া লোক নিযুক্ত করিয়া এই দাঙ্গা উপস্থিত করিয়াছে সন্দেহ নাই, তাহারাও ধৃত হইল। এইরূপে অনেক লোকে

ধৃত হইল। এক জন মাত্র স্ত্রীলোককে ধরিবার আদেশ ছিল—যে গাছে চড়িয়া "মার! মার!" শব্দে হুকুম দিয়াছিল, তাহাকে। একের স্থানে শত জনে শত জন স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিল। কেহ শুনিয়াছিল সে বিধবা, অতএব সে বিধবা দেখিয়াই ধরিল, কেহ শুনিয়াছিল সে সুন্দরী, সে সুন্দরী দেখিয়াই ধৃত করিল। কেহ শুনিয়াছিল, সে যুবতী, এজন্য অনেক যুবতী এক কালে বন্ধন ও পূজা প্রাপ্ত হইল। কেহ কেহ শুনিয়াছিল যে, বৃক্ষবিহারিণী মুক্তকুন্তলা ছিল, অতএব স্ত্রীলোকের এলো চুল দেখিলেই তাহাদের হুজুরে আনিয়া সিপাহীরা হাজির করিতে লাগিল।

এইরূপে ফৌজদারী কারাগার স্ত্রীপুরুষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—আর ধরে না। এখন সে দিনের মত কারাগারে বন্ধ হইল। সে দিন কয়েদীরা বন্ধ রহিল—তাহাদের নিম্বরে পর দিন যাহা হয় হুকুম হইবে। সীতারামও এই সঙ্গে আবদ্ধ রহিলেন।

সীতারামকে অনেকেই চিনিত। ইচ্ছা করিলে তিনি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় করিতে পারিতেন, অথবা যাহাতে সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে গাদাগাদি করিয়া থাকিতে না হয়, সে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি সে চেষ্টা কিছুই করিলেন না। তাঁহাকে চিনে, এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, ইঙ্গিতে তাঁহাকে চিনিতে নিষেধ করিলেন। তিনি মনে মনে এই ভাবিতেছিলেন, "আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাই, তবে ইহাদিগের মুক্তির কোন উপায় হইবে না।"

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারের একটি মাত্র দ্বার, প্রহরীরা সেই দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত রহিল।

কেহ কিছু খাইতে পায় নাই। সন্ধ্যার পর যে যেখানে পাইল, কাপড় পাতিয়া শুইতে লাগিল। সীতারাম তখন সকলের কাছে কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ ঘুমাইও না, ঘুমাইলে রক্ষা নাই।"

সকলে সভয়ে শুনিল; কথাটা কেহ বুঝিতে পারিল না। কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কিন্তু কেহ ঘুমাইল না। পেটে ক্ষুধা—মনে ভয়, নিদ্রার সম্ভাবনা বড় অল্প। একবার প্রহর বাজিয়া গেল—ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজে নবতওয়ালা একটু মধুরালাপ করিয়া, আহারাদির অন্বেষণে নবতখানা হইতে নামিল। তখন সীতারাম এক স্থানে, কতকগুলি কয়েদীর খেদোক্তি শুনিতেছিলেন। তাহাদের কথা সমাপ্ত হইলে সীতারাম বলিলেন, "ভাই, অত কাঁদা কাটার দরকার কি? আমরা মনে করিলেই ত বাহির হইয়া যাইতে পারি।"

এক জন বলিল, "কেমন করিয়া যাইব?"

সীতারাম বলিলেন, "কেন? দ্বার ভাঙ্গিব।"

আর ব্যক্তি বলিল, "তুমি কি পাগল?"

সীতারাম বলিলেন, "কেন বাপু! এখানে আমরা কত লোক আছি মনে কর?"

এক জন বলিল, "তা জন শ পাঁচ ছয় হইবে। তাতে কি হলো?"

সীতরাম বলিলেন, পাঁচ শ লোকে একটা দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারি না?"

সকলে হাসিতে লাগিল। একজন বলিল, "দরওয়াজা যে লোহার ?"

সীতা। মানুষ কি মিছরির ? না কাদার ?

আর এক জন বলিল, "লোহার কপাট কি হাত দিয়া ভাঙ্গিব ? না দাঁত দিয়া কাটিব ? না নখ দিয়া ছিঁড়িব ?"

সকলে হাসিল।

সীতারাম বলিলেন, "কেন, পাঁচ শ লোকের লাথিতে এক জোড়া কপাট কি ভাঙ্গে না ? হোক না কেন লোহা—এক হয়ে কাজ করিলে, লোহার কথা দূরে থাক, পাহাড়ও ভাঙ্গা যায়, সমুদ্রও বাঁধা যায়। কাঠবিড়ালীতে সমুদ্র বাঁধার কথা শুন নাই ?"

তখন এক জন বলিল, "লোকটা বলিতেছে মন্দ নয়। তা ভাই, না হয় যেন লোহার কপাটও ভাঙ্গিলাম—বাহিরে যে সিপাহী তাহারা ?"

সীতারাম। কয় জন ?

সে ব্যক্তি বলিল, "দুই জন চারি জন থাকিতে পারে।"

সীতারাম। এই পাঁচ শ লোকে আর দুই চারি জন সিপাহী মারিতে পারিব না ?

অপর এক জন কহিলেন, "তাদের যে হাতিয়ার আছে ? আমরা আঁচড়ে কামড়ে কি করিব ?"

সীতারাম বলিলেন, "তখন আমি তোমাদিগকে হাতিয়ার দিব।"

"তুমি হাতিয়ার কোথা পাইবে ?"

"আমি সীতারাম রায়।"

শুনিয়া, যাহারা, সীতারামের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, তাহারা একটু কুণ্ঠিত হইযা সরিয়া বসিল। এক জন বলিল, "বুঝিলাম, আমাদের উদ্ধারের জন্যই আপনি ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

যে কয় জনের সঙ্গে সীতারাম কথোপকথন করিতেছিলেন, সকলেরই এই মত হইল। সীতারাম তখন আর এক স্থানে গিয়া বসিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন ; তাহারাও যথাসাধ্য সাহায্যে উদ্যত, এবং উত্তেজিত হইল। এইরূপে সীতারাম ক্রমে ক্রমে, অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ কৌশল, অসাধারণ বাগ্মিতার গুণে সেই বহুসংখ্যক বন্দিবৃন্দকে একমত, উৎসাহিত, এবং প্রাণপাতে পর্য্যন্ত সম্মত করিলেন।

তখন সীতারাম সেই সমস্ত বন্দিবর্গকে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহারা দাঁড়াইল। তখন সীতারাম তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। দ্বারের সম্মুখে প্রথম সারি, তার পর আর এক সারি—এইরূপ বরাবর। প্রতি শ্রেণীমধ্যস্থ ব্যক্তিদিগকে তিন তিন জন করিয়া আবার বিভাগ করিলেন। আবার সেই তিন জনকে এমত করিয়া দাঁড় করাইলেন যে, দুই জনের মধ্য দিয়া এক জন মনুষ্য যাইতে পারে। তাহাতে এইরূপ ফল দাঁড়াইল যে, অনায়াসে পলক মধ্যে কোন তিন ব্যক্তির পিছনের সারি হইতে তিন জন আগু হইয়া পলক মধ্যে তাহাদের স্থান লইতে পারে—ঠেলাঠেলি হয় না।

এই সকল বন্দোবস্ত করিতে করিতে আবার প্রহর বাজিল। "দগড়্ নগড়া গড়াগড়ি" বলিয়া দামামা কি বলিতে লাগিল। তার সঙ্গে মধুর বেহাগ রাগিণী যামিনীকে গভীরা, মূর্ত্তিমতী, ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিল। তখন সীতারাম বুঝিলেন, উত্তম সময়, পাহারার সিপাহী ভিন্ন অন্য সিপাহী সকল ঘুমাইয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষেরা নিদ্রিত। তখন সীতারাম দ্বারের সমীপস্থ তিন জনকে বলিলেন, "তোমরা তিন জন প্রথমে দ্বারে লাথি মার। গায়ে যত জোর আছে, তত জোরে তিন বার মাত্র লাথি মারিবে। তার পর পিছে সরিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু দেখিও, তিন খানা পা, যেন একেবারেই কপাটের উপর পড়ে; অগ্র পশ্চাৎ হইলে সকল বৃথা। একেবারে তিন জন লাথি মারিবার স্থান এ কপাটে আছে—তাই মাপ করিয়া তিন তিন জন করিয়া সাজাইয়াছি। মুখে বলিও—লছমী-নারায়েণকি জয়!"

বন্দীরা বুঝিল। "লছমী-নারায়েণকি জয়!" বলিয়া, তিন জনে ঠিক এক তালে, প্রাণপণ শক্তিতে, সেই লোহার কপাটে পদাঘাত করিল।

বাহিরে চারি জন সিপাহী পাহারায় ঢুলিতেছিল, বজ্রের মত শব্দ সহসা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করাতে, তাহারা চমকিয়া উঠিল। কোথায় কিসের শব্দ তাহা বুঝিতে না পারিয়া, এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল।

এ দিকে প্রথম তিন জন সরিয়া পিছনে গিয়াছে, আর তিন জন আসিয়া পলক মধ্যে তাহাদের স্থান লইয়া সেই এক তালে তিন বার কপাটে পদাঘাত করিল। লোহার কপাটের তাহাতে কি হইবে? কিন্তু বড় ঝঞ্ঝনা বাজিতে লাগিল। এক জন সিপাহী বলিল, "কিয়া রে?"

কিন্তু ভিতর হইতে "লছমী-নারায়েণকি জয়!" ভিন্ন অন্য কোন উত্তর হইল না। দ্বিতীয় সিপাহী বলিল, "শালা-লোগ কেওয়াড়ি তোড়নে মাঙ্গ্তা হৈ।"

তৃতীয় সিপাহী। আরে তোড়্নে দেও। বাঙ্গালী লোহেকি কেওয়াড়ি তোড়েগা।

চতুর্থ সিপাহী। কেওয়াড়ি খোল্কে দো চার থাপ্পড় লাগা দেঙ্গে?

প্রথম সিপাহী। আরে যানে দেও। আপহিসে বহু লোগ ঠণ্ডা হো যায়েগা।

এ সকল কথা বন্দীরাও বড় শুনিতে পাইল না। কেন না এখন, বড় ঝড়ের সময়ে যেমন বজ্রাঘাত থামে না, তাহার যেমন উপর্য্যুপরি শব্দ থামে না, সেইরূপ শব্দে এখন লোহার কপাটের উপর পদাঘাত বৃষ্টি হইতেছিল—আর কিছুই শোনা যায় না। কয়েদীরা মাতিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সীতারাম তাহাদিগকে ধৈর্য্যবিশিষ্ট করিয়া, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, তাহাকে সেইখানে স্থির রাখিতে লাগিলেন। ফাটকের ভিতর কিছুমাত্র গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ছিল না।

সিপাহীরা প্রথমে রঙ্গ দেখিতেছিল। মনে করিতেছিল যে, কয়েদীরা কৌতুক করিতেছে, এখনই নিরস্ত হইবে। ক্রমে দেখিল যে, সে গতিক নহে—ক্রমে কয়েদীদিগের বল বাড়িতে লাগিল। তখন তাহারা কয়েদীদিগকে শাসিত করা নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করিল। তিন জনে পরামর্শ এই করিল যে, তাহারা কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কয়েদীদিগকে ভাল রকম প্রহার করিয়া নিরস্ত করিবে।

তিন জনের মত হইল, কিন্তু এক জনের হইল না। আলিয়ার খাঁ সকলের প্রাচীন—দাড়ি একেবারে শণের মত। সে বলিল, "বাবা! যদি সত্য সত্যই কয়েদী ক্ষেপিয়া থাকে, তবে আমরা চারি জনে কি

তাহাদের থামাইতে পারিব? বরং দ্বার খোলা পাইলে, তাহারা আমাদের চারি জনকে পিষিয়া ফেলিয়া পিল পিল করিয়া পলাইয়া যাইবে। তখন আমরা কি করিব? বরং জমাদ্দারকে খবর দেওয়া যাক্।"

দ্বিতীয় সিপাহী। কেন জমাদ্দারকে খবর দিবারই তবে প্রয়োজন কি? সত্য সত্য উহারা কপাট ভাঙ্গিতে পারিবে, সে শঙ্কা ত আর করিতেছি না। তবে বড় দিক করিতেছে—তার জন্য জমাদ্দারকে দিক করিয়া কি হইবে? আজ থাক, কাল প্রাতে উহাদিগের উচিত সাজা হইবে।

কিছুক্ষণ সিপাহীরা এই মতাবলম্বী হইয়া নিরস্ত হইল। কয়েদীদিগের দ্বার ভঙ্গের উদ্যম দেখিয়া নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "বাঙ্গালী লোহার কপাট ভাঙ্গিবে, আর বানরে সঙ্গীত গাহিবে, সমান কথা।"

লোহা সহজে ভাঙ্গে না বটে, কিন্তু দেয়াল ফাটিতে পারে। লোহার চৌকাট দেয়ালের ভিতর গাঁথা ছিল। দুই চারি দণ্ড পরে আলিয়ার খাঁ জ্যোৎস্নার আলোকে সভয়ে দেখিল, অবিরত সবল পদাঘাতের তাড়নে দেয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে। তখন সে বলিল, "আর দেখ কি? জমাদ্দারজিকে সম্বাদ দাও। এইবার কপাট পড়িবে।"

এক জন সিপাহী জমাদ্দারকে খবর দিতে শীঘ্র গেল। আর তিন জন হাঁ করিয়া কপাট পানে চাহিয়া রহিল।

দেখিল, ক্রমে দেয়াল বেশী বেশী ফাটিতে লাগিল। তার পর, দেয়ালটা কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে চৌকাট ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়িতে লাগিল—ঝন্ ঝন্ শব্দ বড় বাড়িয়া উঠিল। লাথির জোর আরও বাড়িতে লাগিল—বজ্রাঘাতের উপর বজ্রাঘাতের মত শব্দ হইতে লাগিল—শেষ, চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই লোহার কপাট, চৌকাট সমেত, দেয়াল ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর জয় শব্দে গগন বিদীর্ণ হইল।

নির্ব্বোধ হিন্দুস্থানীরা, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সরিয়া দাঁড়াইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। যখন কপাট পড়িতেছে দেখিল, তখন দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। দুই জন বাঁচিল, কিন্তু এক জনের পায়ের উপর কপাট পড়ায় সে ভগ্নপদ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এ দিকে কপাট পড়িবামাত্র ভিতর হইতে, বাঁধ ভাঙ্গিলে জলপ্রবাহের মত বন্দি-স্রোত পতিত কপাটের উপর দিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত প্রহরীকে পদতলে পিষিয়া, গভীর গর্জ্জনে ছুটিল। সর্ব্বাগ্রে সীতারাম বাহির হইয়া আহত প্রহরীর ঢাল সড়কী তরবারি কাড়িয়া লইয়া আর দুই জনকে যমদূতের ন্যায় আক্রমণ করিলেন। তাঁহার তখনকার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার দারুণ প্রহারে আহত হইয়া প্রহরিদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। জমাদ্দার সাহেব তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।

বন্দিগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল—সীতারাম অসি হস্তে স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলেই বাহির হইয়া গেলে, সীতারাম আবার একবার কারাগারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে, এক কোণে এক জন বন্দীকে মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সে একবারও উঠে নাই, বা কোন সাড়া দেয় নাই। সীতারাম

মনে করিয়াছিলেন, সে পীড়িত। এখন তাঁহার মনে হইল, সে হয় ত বিনা সাহায্যে উঠিতে পারে নাই বা বাহির হইতে পারে নাই। সে বাহির হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য সীতারাম কারাগৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে তেমনি ভাবে সেই কোণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শুইয়া আছে।

সীতারাম ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! সবাই বাহির হইল, তুমি শুইয়া কেন?"

যে শুইয়াছিল, সে বলিল, "কি করিব?"

এ ত স্ত্রীলোকের গলা। চেনা গলা বলিয়াই সীতারামের বোধ হইল। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

সে বলিল, "আমি শ্রী।"

পৃ. ২১, পংক্তি ২৩, "সীতারাম···যাইবে?" এই পংক্তিটির পরিবর্ত্তে ছিল--

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী—তুমি এখানে কেন?"

শ্রী। সিপাইতে ধরিয়া আনিয়াছে।

সীতা। হাঙ্গামায় ছিলে বলিয়া? তা, ইহাদের বোধ সোধ নাই। অত্যাচার বেশী হইতেছে। যাই হউক, এখন ভগবানের কৃপায় আমরা মুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি এখানে পড়িয়া কেন? আপনার স্থানে যাও।

পৃ. ২২, পংক্তি ১, "সেখানে কে আছে?" এই কথা কয়টির পর ছিল—

আমার উপর এখন দৌরাত্ম্য

পৃ. ২২, পংক্তি ৪, "মাঠ" কথাটির স্থলে "কারাগার" ছিল।

পংক্তি ২৪, "আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী," এই কথা কয়টির পর ছিল---

তোমার স্নেহের অধিকারিণী, আমি

পৃ. ২৩, পংক্তি ১-২, "তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু" এই কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

নন্দা তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী,

পৃ. ২৩, পংক্তি ১৭, এই "সপ্তম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "একাদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ১৮-১৯, "পলায়নের···হইয়াছে। সীতারাম" এই অংশটি ছিল না।

পৃ. ২৫, পংক্তি ৮, "শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল," এই কথা কয়টির পর ছিল--

"এই আধখানা মোহর তুমি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে—বিপদে পড়িলে নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে ইহা দেখাইতে বলিয়া দিয়াছিলে। সে দিন ইহাই তোমাকে দেখাইয়া ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা পাইয়াছি।

পৃ. ২৫, পংক্তি ৯, "ইহা তোমার অশেষ গুণ।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
কিন্তু আর কখন ইহাতে আমার প্রয়োজন হইবে না।

পৃ. ২৫, পংক্তি ১৪, "ফিরিয়া না চাহিয়া," এই কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—
সেই স্বর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া

পৃ. ২৫, পংক্তি ১৬, এই "অষ্টম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদ।
পংক্তি ২০-২৪, "তার পর সীতারাম···ভাসিয়া গেল।" এই অংশটি ছিল না।
পংক্তি ২৪, এই পংক্তির শেষে ছিল—

একবার সে বড় দুঃখে পড়িয়াছে, লোকমুখে শুনিয়া সীতারাম তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন—আর চিহ্নিত করিয়া আধখানা মোহর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, "তোমার যখন কিছুর প্রয়োজন হইবে, এই আধখানা মোহর সঙ্গে দিয়া এক জন লোক আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। সে যা চাবে, আমি তাই দিব।" শ্রী সে আধখানা মোহর কখনও কাজে লাগায় নাই—কখনও লোক পাঠায় নাই। কেবল ভাইয়ের প্রাণ রক্ষার্থ সে রাত্রে মোহর লইয়া আসিয়াছিল।

পৃ. ২৬, পংক্তি ১৭, "পাপাচরণ করিতেছি।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
পরশুরামের কুঠার তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

পৃ. ২৭, পংক্তি ১১, "জাগরূক হইতে লাগিল।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
যিনি সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উচ্চ আশাকে মনে স্থান দিয়াছেন তাঁহার উপযুক্ত মহিষী কই? নন্দা কি রমা কি সিংহাসনের যোগ্যা? না

পৃ. ২৭, পংক্তি ১২, "রণজয় করিয়াছিল," এই কথা কয়টির পর ছিল—
সেই সে সিংহাসনের যোগ্যা?
এবং ইহার পরেই "যদি" কথাটির পর "সেই" কথাটি ছিল না।

পৃ. ২৭, পংক্তি ১৮, "আমি কি জানি!" এই কথা কয়টির পর ছিল—
আপনি ত তাহাকে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের জিম্মা করিয়া দিয়াছিলেন।

পৃ. ২৭, পংক্তি ১৯, "সে এখানে আসে নাই?" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
সে ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হইয়াছে। এখানে আসে নাই?

পৃ. ২৮, পংক্তি ১, এই "নবম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "চতুর্দ্দশ" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণে আর একটি পরিচ্ছেদ ছিল। এই স্থলে তাহা মুদ্রিত হইল।—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক হইয়া চলিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির নিকটস্থ এক জঙ্গলে ভূমিমধ্যে প্রোথিত ছিল। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে ভূমি খননপূর্ব্বক, তাহার পুনর্বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রাচীন দেবদেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অদ্য প্রথম সীতারাম তদ্দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে শিবিকারোহণে নন্দা ও রমা চলিলেন।

যে জঙ্গলের ভিতর মন্দির, তাহার সীমাদেশে উপস্থিত হইয়া তিন জনেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং এক জন মাত্র পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া তিন জনে জঙ্গলমধ্যে পদব্রজে প্রবেশ করিলেন। কাননের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতিশয় শ্যামলোজ্জ্বল পত্র-রাশিমধ্যে স্তবকে স্তবকে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। শ্বেত হরিৎ কপিল পিঙ্গল রক্তনীল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল স্তরে স্তরে ফুটিয়া গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করিতেছে। তন্মধ্যে নানা বর্ণের পাখী সকল বসিয়া নানাস্বরে কূজন করিতেছে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ। গাছের ডালপালা ঠেলিতে হয়, কখন কাঁটায় নন্দারমার আঁচল বাঁধিয়া যায়, কখন ফুলের গোছা তাহাদিগের মুখে ঠেকে, কখন ডাল নাড়া পেয়ে ভোমরা ডাল ছেড়ে তাদের মুখের কাছে উড়িয়া বেড়ায়, কখন তাহাদেব মলের শব্দে ত্রস্তা হইয়া চকিতা হরিণী শয়ন ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করে। পাতা খসিয়া পড়ে, ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী উড়িয়া যায়, খরা দৌড়িয়া যায়। যথাকালে তাঁহারা মন্দিরসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা পথপ্রদর্শককে বিদায় দিলেন।

দেখিলেন, মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে মন্দির-দ্বারে অবতরণ করিবার সোপান প্রস্তত হইয়াছিল; এবং অন্ধকার নিবারণের জন্য দীপ জ্বলিতেছিল। তাহাও সীতারামের আজ্ঞাক্রমে হইয়াছিল। কিন্তু সীতারামের আজ্ঞাক্রমে সেখানে ভৃত্যবর্গ কেহই ছিল না, কেন না, তিনি নির্জ্জনে ভার্য্যাদ্বয়সমভিব্যাহারে দেব দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তিসমীপে এক জন মুসলমান বসিযা আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা তুমি?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্ব্বনাশ!

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈ কি। তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা!

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন!

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন?

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, "এইরূপ আমাদের দেশাচার।"

ফকির বলিল, "বাবা! শুনিতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান, উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারখারে যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান রাজ্য যাইবে, তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময়ে আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি, আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে, সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী আরবী উত্তম জানে, তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে, এবং হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে, যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও লজ্জা ত্যাগ করিয়া, একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি ন্যায্য। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে, আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকট থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।"

ফকির। তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার মহম্মদপুর নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হই।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতির জমা থাকিব যে, তুমি হিন্দু মুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল, "আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি, তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

গমন কালে ফকির তিন জনকে আশীর্ব্বাদ করিল। সীতারামকে বলিল, "তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হউক।" নন্দাকে বলিল, "তুমি মহিষীর উপযুক্ত, মহিষীর ধর্ম্ম পালন করিও। তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করার হুকুম আছে, সেইরূপ করিও—তাহাতেই মঙ্গল হইবে।" রমাকে ফকির বলিল, "মা, তোমাকে কিছু ভীরু-স্বভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফকিরের কথা মনে রাখিও, কোন বিপদে পড়িলে ভয় করিও না। ভয়ে বড় অমঙ্গল ঘটে, রাজার মহিষীকে ভয় করিতে নাই।"

তার পর তিন জনে গৃহে গমন করিলেন।

পৃ. ২৮, পংক্তি ৩-১৩, "ভূষণায় যে হাঙ্গামা...স্থির করিলেন।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

যাহারা তাঁহার সঙ্গে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা সকলে ফৌজদারের কোপ দৃষ্টিতে পড়িবার আশঙ্কায়, ভূষণা এবং তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকল পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পৃ. ২৯, পংক্তি ১২-১৩, "প্রকাশ্যে অস্ত্রধারী···উপস্থিত হয় নাই।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন না, ইহা ফৌজদার জানিত। কারাগার ভগ্ন করার নেতা যে তিনি, ইহা মুসলমান জানিতে পারে নাই। তিনি যে বন্দীর মধ্যে ছিলেন, তাহাও ফৌজদার অবগত হয়েন নাই।

পৃ. ২৯, পংক্তি ১৮, এই পংক্তির শেষে ছিল—

আপাততঃ মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সকলই নষ্ট হইবে; অতএব যতদিন তিনি উপযুক্ত বলশালী না হয়েন, ততদিন কোন গোলযোগ না বাধে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

পৃ. ৩০, পংক্তি ১০-১৪, "এই সময়ে চাঁদ শাহ···"মহম্মদপুর"।" এই অংশ ছিল না।

পংক্তি ১৭, এই "দশম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "পঞ্চদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ২০-২২, "রমা বড় ছোট···ভয়ের বিষয়।" এই অংশ ছিল না।

পৃ. ৩২, পংক্তি ২৩, "পতিপদসেবায় নিযুক্তা।" এই কথা কয়টির পর ছিল—

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরে ফকির যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নন্দা তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছিলেন।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ১, এই "একাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "ষোড়শ" পরিচ্ছেদ।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে "সন্ন্যাসিনী" কথাটির স্থলে প্রথম সংস্করণে "ভৈরবী" ছিল। কেবল ৪২ পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তির "সন্ন্যাসিনী" কথাটি ঐরূপই ছিল।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ১৪, এই পংক্তির পাদটীকা-চিহ্নটি এবং নিম্নের পাদটীকাটি (পংক্তি ২৭) ছিল না।

পৃ. ৩৬, পংক্তি ২৪, এই পংক্তির শেষে ছিল—

শ্রী ভাবিল, "পুরুষ থাকিলে ভাবিত—এ ভৈরবীই বটে!"

পৃ. ৩৬, পংক্তি ২৭, "আমি তাহা হইতে বলিতেছি না।" এই কথা কয়টির পর ছিল—

আমিও যথার্থ ভৈরবী নই। আর

পৃ. ৩৭, পংক্তি ১৮, "চন্দনের" কথাটির স্থলে "রক্ত চন্দনের" ছিল।

পংক্তি ২১, এই "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "সপ্তদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৩৯, পংক্তি ৮, এই "ত্রয়োদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "অষ্টাদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৪১, পংক্তি ১৭, "ভবিষ্যৎ" কথাটির স্থলে "প্রারব্ধ" ছিল।

পংক্তি ২১, এই পংক্তিটি ছিল না।

পৃ. ৪৩, পংক্তি ১, এই "চতুর্দ্দশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "উনবিংশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ১৯-২০, ১৯ পংক্তির শেষ হইতে, পর পংক্তির "আমার নাম জয়ন্তী" কথা কয়টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

তুমি সে দিন বলিয়াছিলে, তুমি প্রকৃত ভৈরবী নও। তুমি তবে কি?

ভৈরবী। আমি বৈষ্ণবী। কিন্তু নেড়ার দলের বৈষ্ণবী নহি।

শ্রী। আবার বৈষ্ণবী কেমনতর? বৈষ্ণবীর এ বেশ ত নয়।

ভৈরবী। সে সকল রহস্য পরে জানিবে। এখন আমাকে বৈষ্ণবীই জানিও।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২, "অকৌশল" কথাটির স্থলে "অকুশল" ছিল।

এই পর্য্যন্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ড।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ২, "জয়ন্তী" কথাটির স্থলে "ভৈরবী" ছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না; কেন না, তাহাতে তাঁহার আর মন নাই। মনের সমস্ত ভাগ হিন্দু সাম্রাজ্য যদি অধিকৃত করিত, তবে সীতারাম তাহা পারিতেন। কিন্তু শ্রী, প্রথমে হৃদয়ের তিলপরিমিত অংশ অধিকার করিয়া, এখন হৃদয়ের প্রায় সমস্ত ভাগই ব্যাপ্ত করিয়াছে। শ্রী যদি নিকটে থাকিত, অন্তঃপুরে রাজমহিষী হইয়া বাস করিত, রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তবে প্রেয়সী মহিষীর যে স্থান প্রাপ্য, সীতারামের হৃদয়ে তাহার বেশী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শ্রীর অদর্শনে বিপরীত ফল হইল। বিশেষ শ্রী পরিত্যক্তা, উদাসীনী। বোধ হয় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছে, নয় ত কষ্টে মরিয়া গিয়াছে, এই সকল চিন্তায় সে হৃদয়ে শ্রীর প্রাপ্য স্থান বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া, শ্রী সীতারামের সমস্ত হৃদয় অধিকৃত করিল। হিন্দু সাম্রাজ্যের আর সেখানে স্থান নাই। সুতরাং হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বড় গোলযোগ। শ্রীর অভাবে, সীতারামের মনে আর সুখ নাই, রাজ্যে সুখ নাই, হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনেও আর সুখ নাই। কাজেই আর হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন হয় না।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ১১-১৫, "শেষে সীতারাম··· মন্দ উপস্থিত হইল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

তখন সীতারাম হিন্দু সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির করিলেন। একবার নিজে তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে শ্রীর সন্ধান করিবেন। যদি শ্রীকে পান, ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিবেন; না পান, সংসার পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন। সীতারাম বিবেচনা করিলেন, "যে রাজধর্ম্ম আমি রীতিমত পালন করিতে, চিত্তের অস্থৈর্য্যবশতঃ সক্ষম হইয়া উঠিতেছি না, তাহাতে আর লিপ্ত থাকা লোকের পীড়ন মাত্র। নন্দার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া আমি স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিব।"

এ সকল কথা সীতারাম আপন মনেই রাখিলেন, মনের ভাব কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীর যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় গোপনে এবং অপ্রকাশিত ভাবে। যাহারা শ্রীর সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই যে, শ্রীকে তাঁহার আজিও মনে আছে।

কেহ কিছু জানিতে না পারুক, তাঁহার মনের যে ভাবান্তর হইয়াছে, তাহা নন্দা ও রমা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিল। নন্দা ভাব বুঝিয়া, কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মতঃ মহিষীধর্ম্ম পালন করিয়া সীতারামের প্রফুল্লতা জন্মাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময়েই সফল হইত। কিন্তু রমা সকল সময়েই স্বামীর অনাস্থা ও অন্য মন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষ থাকিত, সীতারামের তাহা বিশেষ অপ্রীতিকর হইত। রমা ভাবিত, "আর আমাকে ভাল বাসেন না কেন?" নন্দা ভাবিত, "তিনি ভাল বাসুন, না বাসুন, ঠাকুর করুন, আমার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাহা হইলেই আমার সুখ।"

শেষে সীতারাম, ভার্য্যাদ্বয় এবং চন্দ্রচূড় প্রভৃতি অমাত্যবর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

সময়টা বড় অসময়। মহম্মদপুরে সীতারামের অধিকার নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে। তোরাব খাঁ, রুষ্ট হইয়াও কোন বিরোধ উপস্থিত করে নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখন বাঙ্গালার সুবেদার বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশজ পাপিষ্ঠ মুসলমান মুরশিদ কুলি খাঁ। তখনও বাঙ্গালা দিল্লীর অধীন। তোরাব খাঁ দিল্লীর প্রেরিত লোক, সেইখানে তাঁর মুরব্বীর জোর। সুবেদারের সঙ্গে তাঁহার বড় বনিবনাও ছিল না। এখন তিনি যদি বলে ছলে সীতারামকে ধ্বংস করেন, তবে সুবেদার কি বলিবেন? সুবেদার বলিতে পারেন, এ বেচারা নিরপরাধী, কিস্তি কিস্তি বিনা ওজর আপত্তি খাজানা দাখিল করে, বকেয়া বাকির ঝঞ্ঝাট রাখে না—ইহার উপর অত্যাচার কেন? তখন মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে লইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন। তাই, সুবেদারের অভিপ্রায় কি, জানিবার জন্য তোরাব খাঁ, তাঁহার নিকট সীতারামের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ অতি শঠ। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, এই উপলক্ষে তোরাব খাঁকে পদচ্যুত করিবেন। যদি তোরাব সীতারামকে দমন করেন, তাহা হইলে, মুরশিদ বলিবেন, নিরপরাধীকে নষ্ট করিলে কেন? যদি তোরাব তাহাকে দমন না করেন, তবে বলিবেন, বিদ্রোহী কাফেরকে দণ্ডিত করিলে না কেন? অতএব তোরাব যাহা হয় একটা করুক, তিনি কোন উত্তর দিবেন না। মুরশিদ কুলি কোন উত্তর দিলেন না, তোরাবও কিছু করিলেন না।

কিন্তু বড় বেশী দিন এমন সুখে গেল না।

পৃ. ৪৬, পংক্তি ২২, "অজ্ঞতা" কথাটির স্থলে "মূর্খতা" ছিল।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ২৬, এই পংক্তির শেষে ছিল—

সীতারামকেও জানাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েই সীতারাম দিল্লী যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ২৭-২৮, "ইহার সকল উদ্যোগ···যাত্রা করিলেন।" এই অংশের পরিবর্তে ছিল—

অসময় হইলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যুদ্ধে জ পরাজয় ঈশ্বরের হাত। প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিলে ফৌজদারকে পরাজয় করিতে পারিবেন, ইহা ম হয় ধরিয়া লইলাম। কিন্তু ফৌজদারকে পরাজয় করিলেই কি লেঠা মিটিল! ফৌজদার পরাভূত হইলে সুবাদার আছে, সুবাদার পরাভূত হইলে দিল্লীর বাদশাহ আছে। অতএব যুদ্ধটা বাধাই ভাল নহে এমন কোন ভরসা নাই যে, আমরা মুরশিদাবাদের নবাব বা দিল্লীর বাদশাহকে পরাভূত করিতে পারিব অতএব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ ইহার ব্যবস্থা। যদি দিল্লীর বাদশাহ আপনাকে এই পরগণার রাজ প্রদান করেন, ফৌজদার কি সুবেদার, কেহই আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে না। হিন্দুরাজ্য স্থাপন এক দিন বা এক পুরুষের কাজ নহে। মোগল রাজ্য এক দিনে বা এক পুরুষে স্থাপন হয় নাই। এ পত্তন মাত্র, বাঙ্গালার সুবেদার বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ হইলে, সব ধ্বংস হইয়া যাইবে অতএব এখন অতি সাবধানে চলিতে হইবে। দিল্লীর সনন্দ ব্যতীত ইহার আর উপায় দেখি না, তুমি আজি দিল্লী যাত্রা কর। সেখানে কিছু খরচ পত্র করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে; কেন না, এখন দিল্লী আমীর ওমরাহ, কি বাদশাহ স্বয়ং, কিনিবার বেচিবার সামগ্রী। তোমার মত চতুর লোক অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে। যদি ইতিমধ্যে মুসলমান মহম্মদপুর আক্রমণ করে, তবে মৃণ্ময় রক্ষা করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। মৃণ্ময় যুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, এবং সাহসী। আর কেবল তাহার বলবীর্যে উপর নির্ভর করিতে তোমাকে বলি না। আমার এমন ভরসা আছে যে, যত দিন না তুমি ফিরিয়া আ তত দিন আমি ফৌজদারকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারিব। তুমি দুই চারি মাসের জন্য আম উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি অনেক কৌশল জানি।"

এই সকল বাক্যে সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনই কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যা করিলেন। নামে দিল্লী যাত্রা, কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কেহই জানিত না।

পৃ. ৫৩, পংক্তি ৬, এই পংক্তির শেষে ছিল—

ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইবে? না আগুন খাইতে হইবে?

পৃ. ৫৩, পংক্তি ৭, "স্ত্রীলোক।" কথাটির পর ছিল—

তার অপেক্ষাও কঠিন কাজ।

পৃ. ৫৪, পংক্তি ১১, "রাখিয়েসে। এ কোন্ ?" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
রাখিয়াছি। এ কে ?

পৃ. ৫৪, পংক্তি ১৪, "মরদ্ যাতে পার্‌বে না। হুকুম নেহি।" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
পুরুষ মানুষের যাইবার হুকুম নাই।

পৃ. ৬০, পংক্তি ৩-৪, "এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।" এই কথাগুলি ছিল না।

পৃ. ৬১, পংক্তি ২৩-২৪, "যে অপবিত্র,...মুরলার কথা শুনিয়া" এই কথাগুলি ছিল না।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ৭, "অনেক দিন বাপ মা দেখি নাই।" এই কথাগুলির স্থলে ছিল—
আমি জেতে কৈবর্ত্ত, বিবাহ আড়াইটা হইয়াছে, তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমারও সাড়ে তিনটায় আপত্তি নাই।

পৃ. ৬৪, পংক্তি ২৩, "না যাইব কেন ?" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—
এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার কাজ—আমার অন্য কাজ নাই ;

পৃ. ৬৪, পংক্তি ২৫, "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" কথাটির স্থলে "পতিপ্রাণহন্ত্রী" ছিল।

পৃ. ৬৫, পংক্তি ১০, "জয়ন্তী মনে মনে বড় খুসী হইল।" এই কথাগুলির পর ছিল—
কথাগুলি শিষ্যার নিকট গুরুদক্ষিণার ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এখনও জয়ন্তীর কথা ফুরায় নাই।

পৃ. ৬৬, পংক্তি ২, "সন্ন্যাসিনী" কথাটির স্থলে "ভৈরবী বা বৈষ্ণবীর শিষ্যা" ছিল।

পংক্তি ৮-১১, "যতক্ষণ এই কথোপকথন...ত্রিশূল মন্ত্রপূত। *" এই অংশটি ছিল না। ফলে নিম্নের পাদটীকাটিও ছিল না।

পৃ. ৬৬, পংক্তি ১২, "দুই জনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং" এই কথা কয়টি ছিল না।

পংক্তি ২০, এই "নবম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দশম" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদটি ছিল—

নবম পরিচ্ছেদ

রমা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গারাম বাঁচিল না। তখন গঙ্গারাম শয্যা লইল। রাজকার্য্য সকল বন্ধ করিল। সেও রমার মত স্থির করিল, বিষ খাইয়া মরিবে। কিন্তু রমাও বিষ খায় নাই, গঙ্গারামও বিষ খাইল না।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর জানিতে পারিলেন, নগর রক্ষার কাজ এ দুঃসময়ে, ভাল হইতেছে না, নগররক্ষক আদৌ দেখেন না। শুনিলেন, নগররক্ষক পীড়িত—শয্যাগত। তিনি নগররক্ষককে দেখিতে গেলেন। গঙ্গারাম বলিল, "দশ পাঁচ দিন আমায় অবসর দিন। আমার শরীর ভাল নহে—আমি এখন পারিব না।"

চন্দ্রচূড়। শরীর ত উত্তম দেখিতেছি। বোধ হয় মন ভাল নহে। সেইরূপ দেখিতেছি।

গঙ্গারাম বিছানায় পড়িয়া রহিল। বিছানায় পড়িয়া অন্তর্দ্দাহ আরও বাড়িল—নিষ্কর্ম্মারই বড় অন্তর্দ্দাহ। কাজ কর্ম্মই, অন্তরের রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিছানায় পড়িয়া শেষ গঙ্গারাম যাহা ভাবিয়া স্থির করিল, তাহা এই।

"ধর্ম্মে হোক, অধর্ম্মে হোক, আমার রমাকে পাইতে হইবে। নহিলে মরিতে হইবে।

তা, মরি, তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু রমাকে না পাইয়া মরাও কষ্ট। কাজেই মরা হইবে না, রমাকে পাইতে হইবে।

ধর্ম্মপথে, পাইবার উপায় নাই। কাজেই অধর্ম্মপথে পাইতে হইবে। ধর্ম্ম যে পারে, সে করুক, যে পারিল না, সে কি প্রকারে করিবে?"

গঙ্গারামের যে ভুল হইল, অধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই সেইটি ঘটিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, ধর্ম্মাচরণ পারিয়া উঠিলাম না, তাই অধর্ম্ম করিতেছি। তাহা নহে; ধর্ম্ম যে চেষ্টা করে, সেই করিতে পারে। অধার্ম্মিকেরা চেষ্টা করে না, কাজেই পারে না।

গঙ্গারাম তার পর ভাবিয়া ঠিক করিতে লাগিল—

অধর্ম্মের পথে যাইতে হইবে—কিন্তু তাই বা পথ কই? রমাকে হস্তগত করা কঠিন নহে। আমি যদি আজ বলিয়া পাঠাই যে, কাল মুসলমান আসিবে, আজ বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে এখনই চলিয়া আসিতে পারে। তার পর যেখানে লইয়া যাইব, কাজেই সেইখানে যাইতে হইবে। কিন্তু নিয়া যাই কোথায়? সীতারামের এলাকায় ত একদিনও কাটিবে না। সীতারাম ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা সহিবে না। এখনই চন্দ্রচূড় আমার মাথা কাটিতে হুকুম দিবে, আর মৃণ্ময় আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কাজেই সীতারামের এলাকার বাহিরে, যেখানে সীতারাম নাগাল না পায়, সেইখানে যাইতে হইবে। সে সবই মুসলমানের এলাকা। মুসলমানের ত আমি ফেরারি আসামী—যেখানে যাইব, সম্বাদ পাইলে আমাকে সেইখান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলে দিবে। ইহার কেবল এক উপায় আছে—যদি তোরাব খাঁর সঙ্গে ভাব করিতে পারি। তোরাব খাঁ অনুগ্রহ করিলে, জীবনও পাইব, রমাও পাইব। ইহার উপায় আছে।"

পৃ. ৬৬, পংক্তি ২২, "খসম" কথাটির স্থলে "পতি" ছিল।

পংক্তি ২৩, "দোস্ত" কথাটির স্থলে "উপপতি" ছিল।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ১৩-১৪, "গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে···তোরাব্" এই অংশের পরে ছিল—

বন্দেআলি সেখকে এই সকল কথা বলিতে বলিয়া দিয়া, গঙ্গারাম বলিলেন, "লিখিত উত্তর লইয়া আইস।"

বন্দেআলি বলিল, "আমার কথায় ফৌজদার সাহেব বিশ্বাস করিয়া খত দিবেন কেন?"

গঙ্গারাম বলিল, "পত্র লিখিতে আমার সাহস হয় না। আমার এই মোহর লইয়া যাও। আমার মোহর তোমার হাতে দেখিলে তিনি অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।"

বন্দেআলি মোহর লইয়া ভূষণায় গেল। ফৌজদারিতে তার চেনা লোক ছিল। ফৌজদারী সরকারে, কারকুন দপ্তরের বখশী চেরাগ আলির সঙ্গে তাহার দোস্তী ছিল। বন্দেআলি চেরাগ আলিকে ধরিল যে, ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দাও, আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে। বখশী গিয়া কারকুনকে ধরিল, কারকুন পেস্কারকে ধরিল, পেস্কার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল।

গঙ্গারাম যেমন যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, বন্দেআলি অবিকল সেই রকম বলিল। লিখিত উত্তর চাহিল। তোরাব খাঁ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন যে, গঙ্গারাম ত হাতছাড়া হইয়াইছে—এখন তাহাকে মাফ করায় কোন ক্ষতি হইতে পারে না। অতএব

পৃ. ৬৭, পংক্তি ১৭, "সৈন্য পার হইতেছিল।" এই কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

যাহার সঙ্গে পাঠকের মন্দিরে পরিচয় হইয়াছিল,—

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২৪, এই "দশম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "একাদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৬৮, পংক্তি ২৫-২৭, "গঙ্গারাম অভীষ্ট···অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

গঙ্গা। নলদী পরগণা আমাকে দিবেন।

ফৌজদার। মহম্মদপুর আর হিন্দুর হাতে রাখিব না। কিন্তু তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে এখানে শিপাহশালার করিতে পারি। আর টাকা ও গ্রাম দিতে পারি।

গঙ্গারাম। তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর এক ভিক্ষা আছে। সীতারামের দুই মহিষী আছে।

ফৌজ। তাহারা নবাবের জন্য। তাহাদের পাইবে না।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠাকে মুরশিদাবাদে পাঠাইবেন। কনিষ্ঠাকে নফরকে বখশিষ করিবেন।

ফৌজদার তামাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি সীতারামের স্ত্রী নিয়া কি করিবে? সীতারাম যেন মরিল, কিন্তু তবু ত হিন্দুর মাঝে বিধবার বিবাহ নাই। যদি মুসলমান হইতে, তবে বুঝিতাম যে, তুমি রাণীকে নেকা করিতে পারিতে।"

গঙ্গারাম ভাবিল, এ পরামর্শ মন্দ নহে। যদি নিজে মুসলমান হইয়া, রমাকে ফৌজদারের সাহায্যে কবুল করিয়া নেকা করিতে পারে, তবে সীতারাম জীবিত থাকিলে, আর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না। গঙ্গারাম নির্ব্বিঘ্নে রমাকে ভোগ দখল করিতে পারিবে। অতএব ফৌজদারকে বলিল,

"মুসলমান ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, এইরূপ আমি ক্রমে বুঝিতেছি। মুসলমান হইব, আমি এখন স্থির করিয়াছি। কিন্তু রমাকে না পাইলে মুসলমান হইব না।"

ফৌজদার হাসিয়া বলিলেন, "রমা কে? সীতারামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা? সে নহিলে, যদি তোমার পরকালের গতি না হয়, তবে অবশ্য তুমি যাহাতে তাহাকে পাও, তাহা আমি করিব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু আর একটা কথা, সীতারামের অনেক ধনদৌলত পোতা আছে না?"

গঙ্গা। শুনিয়াছি, আছে।

তোরাব খাঁ। তাহা তুমি দেখাইয়া দিবে?

গঙ্গা। কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না।

তোরাব খাঁ। সন্ধান করিতে পারিবে?

গঙ্গা। এখন করিতে গেলে লোকে আমায় অবিশ্বাস করিবে।

তোরাব খাঁ আর কিছুই বলিলেন না।

তখন সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আ

গঙ্গারাম জানিত না যে, চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। চাঁদশাহ ফকির পরদিন নিভৃতে চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আহ্লাদের সম্বাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি। ইস্‌লামের জয় হইবে।"

চন্দ্রচূড় জানিতেন, চাঁদশাহের কাছে হিন্দু মুসলমান এক—সে কোন পক্ষে নহে—ধর্ম্মের পক্ষ এবং সীতারামের পক্ষ। অতএব এ কথার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

চাঁদশাহ। হিন্দুরাও ইস্‌লামের পক্ষ।

চন্দ্রচূড়। কোন কোন হিন্দু বটে।

চাঁদ। আপনারাও।

চন্দ্র। সে কি?

চাঁদ। মনে করুন, নগরপাল গঙ্গারাম দাস।

চন্দ্র। গঙ্গারাম খাটি হিন্দু—রাজার বড় বিশ্বাসী।

চাঁদ। তাই কাল রাত্রে ভূষণায় গিয়া তোরাব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

চন্দ্র। আঁ? না, মিছে কথা।

চাঁদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই বলিয়া চাঁদশাহ সেখান হইতে চলিয়া গেল। চন্দ্রচূড় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার তেজস্বিনী বুদ্ধি যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল।

পৃ. ৬৯, পংক্তি ১, এই "একাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদ

পংক্তি ২, "সন্ধ্যার পর গুপ্তচর" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

কালে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রচূড় ভাবিতে লাগিলেন, "ইহার বিহিত, কি কর্ত্তব্য? এখন গঙ্গারামকে পদচ্যুত করিয়া আবদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে পদচ্যুত বা কারাবদ্ধ করিব কি প্রকারে? সে যদি না মানে? নগর সিপাহী সবই ত তার হাতে। সে আমারে উল্টিয়া কারাবদ্ধ করিতে পারে। মৃণ্ময়ের সাহায্য ভিন্ন তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিব না—কিন্তু যদি গঙ্গারাম অবিশ্বাসী, তবে মৃণ্ময়কেই বা বিশ্বাস কি? তবে সাবধানের মার নাই—সতর্ক থাকাই ভাল। বিপদ্ ঘটে, তখন নারায়ণ সহায় হইবেন। এখন প্রথমতঃ গঙ্গারামের মন বুঝিয়া দেখিতে হইবে।" এইরূপ ভাবিয়া চন্দ্রচূড় তখন আর কাহারও সাক্ষাতে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। পরে

পৃ. ৬৯, পংক্তি ৬, এই পংক্তির পর নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, গঙ্গারামও দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া মৃণ্ময়ের সাহায্যার্থ যাওয়া ভাল।"

গঙ্গারাম চুপ করিয়া রহিল—দেখিতেছে, মৃণ্ময় কি বলে।

মৃণ্ময়ের একটু রাগ হইয়াছে—আমি কি একা লড়াই পারি না যে—আমার সঙ্গে আবার গঙ্গারাম! অতএব মৃণ্ময় রুষ্টভাবে বলিল, "তা চলুন না—বেশ ত!"

গঙ্গারাম তখন বলিল, "আমি যাব ত নগর রক্ষা করিবে কে?"

চন্দ্র। মৃণ্ময় না হয় সে জন্য এক জন ভাল লোক রাখিয়া যাইবেন।

গঙ্গা। নগর রক্ষার জন্য রাজার কাছে জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। অতএব আমি নগর ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

চন্দ্র। আমি নগর রক্ষা করিব।

গঙ্গা। করিবেন। কিন্তু আমার উপর যে কাজের ভার আছে, তাহা আমি করিব।

তখন চন্দ্রচূড় মনে মনে বড় সন্দিগ্ধ হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাহা তোমরা ভাল বুঝ—তাই করিও।"

পৃ. ৬৯, পংক্তি ২৫, "জগতের বন্ধু" কথা দুইটির স্থলে "জগৎপিতা" ছিল।

পৃ. ৭১, পংক্তি ১, এই "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "ত্রয়োদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ৪, "তখন তিনি" কথা দুইটির পরই ছিল—

কোন কৌশলে গঙ্গারামকে আবদ্ধ না করিয়া এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন, নিশ্চয় বুঝিয়া,

পৃ. ৭১, পংক্তি ৫-৭, "এমন সময়ে···শিহরিয়া উঠিলেন।" এই অংশটি ছিল না।

পংক্তি ১৭, "ও" কথাটির স্থলে "শ্রী।" ছিল।